বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা

ড. নমিতা মণ্ডল

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা

Language, like conciousness, only arises from the need, the necessity of intercourse with other men.

—*The German Ideology*,
Marx Engels, Moscow,
Progress Publishers,
3rd ed., 1976, p. 49.

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা

ড. নমিতা মণ্ডল

বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি
১৪৬/১ দোলতলা, বাঁকুড়া

Bankura-Kendrik Mallabhumer Upabhasha
Bankura-based Dialect of Mallabhum

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ১৯৮৯

প্রকাশক
শ্রীশৈলেন দাস
বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি
১৪৬/১ দোলতলা, বাঁকুড়া

প্রচ্ছদ
তপন কর

মুদ্রক
অরুণকুমার হেঁস
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

পঞ্চাশ টাকা

যাঁরা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি রচনায় নিমগ্ন,
সমাজচিন্তায় পূর্বগামী পথিকৃৎ,
(বাঙালী) জাতি-উপজাতির
উৎস-সন্ধানে
উন্মুখ
সেইসব জানা-অজানা মানুষদের
উদ্দেশে

লেখিকার অন্য বই ঃ
মল্লভূমের মন্ত্রযান
বাঁকুড়ার স্মরণীয় যাঁরা

মুখবন্ধ

সভ্যতার অরুণোদয়ে ভাষাহীন মানুষ জীবনধারণের তাগিদেই সৃষ্টি করেছিল কতকগুলি 'মৌখিক শব্দ'। পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা পরিণত হয় 'ভাষা'য়। ধীরে ধীরে সেইসব ভাষাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান। এক-একটি জনগোষ্ঠীই এক-একটি আঞ্চলিক উপভাষার স্রষ্টা। কাজেই মানবসভ্যতার ন্যায় এক-একটি শব্দও বহু প্রাচীন এবং বহু সহস্র বৎসরের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। আজ হয়ত সেসব শব্দের আদিমরূপ প্রায় বিলুপ্ত। যেটুকু আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। আমরা জানি, ভাষা গতিশীল। তার ধারক ও বাহক জনসমাজ। জনগণের মুখে ভাষা প্রাণবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কোন কারণে ভাষা যদি জনগণের মুখে নীরব হয়ে যায় তখনই ঘটে তার অপমৃত্যু। যেমন হয়েছে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে। প্রাচীনত্বের দোষে অনেক কিছু বিলুপ্ত হলেও এখনও বহু শব্দ বিদ্যমান যা আমাদের ভাববিকাশের একান্ত সহায়ক ও পরিপূরক। এসব শব্দ বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা প্রদেশে আবদ্ধ, তাই এরা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক, প্রাকৃত ভাষার অনুরূপ। এই অনুরূপ ভাষা বা উপভাষাসমূহ নিজ নিজ অঞ্চলে যে কি পরিমাণে সমৃদ্ধা ও গৌরবান্বিতা তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। এ ভাষা আমাদের একান্ত আপন ও নিজস্ব সম্পত্তি। একই জল-হাওয়া-মাটি ও মানুষের মধ্যে পরিবর্ধিত ও পরিচর্চিত হয়ে পল্লীসমাজের বিবর্তনক্ষেত্রে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মীকরণ ও আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ়করণে আজও এসব ভাষা টিকে আছে, অপেক্ষা করছে যথাযথ মূল্যায়নের। এ কাজ যে থেমে আছে তা নয়, কিন্তু গতি বড় ক্ষীণ ও দুর্বল।

গ্রাম্যভাষা বা গ্রাম্যশব্দাবলি যে ভাষাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, একথা অধিকাংশ পণ্ডিতেরই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমণীমোহন মল্লিক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখ বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনীষীরা তাই গ্রাম্যশব্দ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভেবেছেন। বাঁকুড়া অঞ্চলের উপভাষা বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। রাঢ়ী উপভাষার আদিম কথ্যরূপ বাঁকুড়ার পল্লী অঞ্চলে এখনও কিছুটা বেঁচে আছে। যা আছে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাকরণসম্মত আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের জানা উচিত তদ্ভব ও দেশী কিংবা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই

প্রকৃত ভাষার ও জাতির ইতিহাস সুপ্ত। আমাদের চলমান সভ্যতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিষয়সমূহ নিয়েই গড়ে উঠেছে। পুরাতন আসবাব-পত্র ও তার ব্যবহারবিধি উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসব শব্দগুলিও হারিয়ে যায়, কিন্তু অবশেষটুকু লেগে থাকে আঞ্চলিক কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, মন্ত্র-তন্ত্র ও গ্রাম্য কথাবার্তার শব্দসম্ভারের মধ্যে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শব্দকথা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'ভাষা বিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্যভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায়, সাধুভাষা হইতে তেমন হয় না। এইজন্য গ্রাম্য slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন। এই সংগ্রহকার্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কারণ নাই।' শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনা-মূলক ব্যাকরণ যদি লিখিতে হয় তবে বাংলাভাষা বাঙ্গালীর কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে।...কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই, নানাদিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।' আমার অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে শিক্ষাবিদ্‌দের এরূপ উক্তি আমাকে এ অঞ্চলের 'উপভাষা' সংগ্রহ ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণাকর্মে প্রলুব্ধ করেছে।

প্রায় দু'হাজারের বেশী শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ইত্যাদি যা এই অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথচ বিশেষ কোন বাংলা অভিধানে স্থান পায়নি, সেগুলিই আমার এই 'বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য বাক্যে ব্যবহার করে দেখিয়েছি। অধিকাংশ বাক্য ও শব্দাবলী স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। লোকসংস্কৃতিমূলক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমির সম্পাদক শ্রীশৈলেন দাস মহাশয়ের সহায়তায় আমি এ অঞ্চলের বহু গ্রাম ঘুরেছি—তার ফলে এ অঞ্চলের ভাষা সংগ্রহের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মেছে। এ কাজ করতে গিয়ে নিভৃত পল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বহু মানুষের কাছে গেছি,—মহিলা বলে বাড়ির অন্দরমহলে সহজেই প্রবেশ করতে পেরেছি। সকলেই যথেষ্ট আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধুর আপ্যায়নে আমি অবাক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছি তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের চালচিত্র। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করেছি তাঁদের ভাষা ও উচ্চারণবৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত উদারভাবে তাঁরা আমার কাছে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের মুখে মুখে রচিত ও কথিত এবং আঞ্চলিক উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ছড়া, প্রবাদ, মন্ত্র, শব্দ প্রভৃতি। এই গ্রন্থটি আমার এসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফসল।

এ অঞ্চলের বিশেষতঃ বাঁকুড়া জেলার গ্রাম্য বা কথ্যভাষার এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সব প্রতিবেশী জেলার কথ্যভাষায় পাওয়া যায়না।

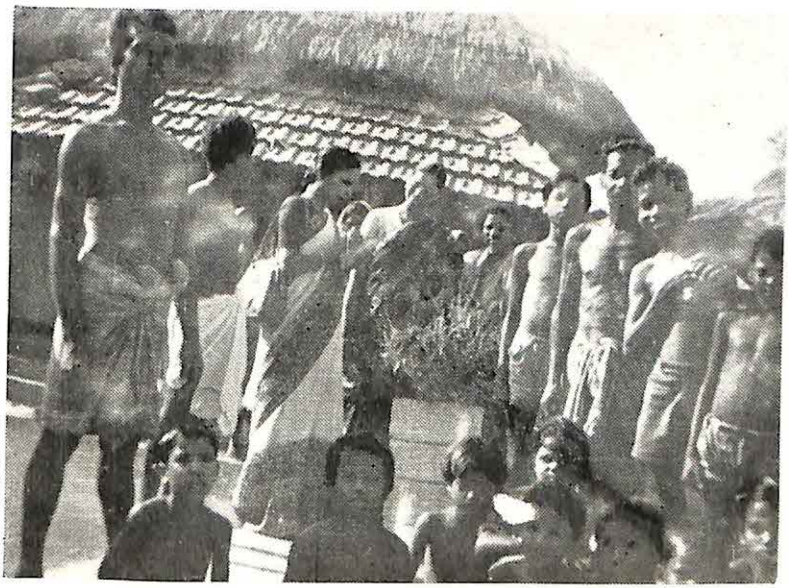
শব্দ বা শব্দার্থ কোন ভাষার প্রকৃতিগত মৌলধর্মের নির্দেশক নয়। ভাষার পরিচিতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল উচ্চারণরীতি, বিভক্তি-প্রত্যয়ের ব্যবহার ও বাক্যের গঠনরীতি। এ হিসাবে বাঁকুড়া-মানভূম অঞ্চলের ভাষার মূল প্রকৃতি ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ়ীয় উপভাষার অন্তর্গত। নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্য-ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়াঞ্চলের কথ্যভাষার যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভাগীরথীতীরের ভাষা প্রচণ্ডভাবে গতিশীল হয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক ও বহু লেখকের ঐ অঞ্চলের ভাষা অবলম্বন করার কারণে। এ ভাষা যেমন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুরাতন উচ্চারণ, বিভক্তি-প্রত্যয় ও বহু শব্দ বর্জন করেছে, তেমনি ইংরেজী সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট হয়ে নতুন রূপ ও নতুন স্টাইল অর্জন করেছে। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এইরূপ গতিশীলতার অধিকারী হতে পারেনি। ফলে সংরক্ষণশীলতার বশেই পশ্চিমরাঢ় মধ্যযুগে প্রচলিত বহু শব্দ আজও রক্ষা করে চলেছে। আঞ্চলিক উচ্চারণসহ এইসব শব্দগুলি পূর্বের সর্বত্র প্রচলিত বাংলারই সম্পদ।

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন ভাষা-রীতি কারো কাছে হেয় নয়। ভাষার পরিবর্তনের মূলে নৃতত্ত্ব-জীবনবিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্য ভাষার প্রভাব এসে পড়ে। পরিবর্তন যখন প্রকট হয় তখনই কেবল তা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভাগীরথীতীরের ভাষা তার দ্রুতবেগে চলার ফলে শব্দ বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতির দায়ে ধরা পড়েছে। অথচ বাঁকুড়া জেলা তথা মল্লভূম অঞ্চল তার অখণ্ডতা ও প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে ইংরেজ অধিকারের সূত্রকাল পর্যন্ত। প্রায় ৬০০ বছরের অধিককাল পূর্বের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা আজও এ অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আনু-নাসিক ও মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাধান্য, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগের শব্দগুলির কিছু কিছু আজও এ অঞ্চলের জনগণের মুখে মুখে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিহাস বলে রাঢ়ী উপভাষার আদিম কথ্যরূপের উদ্ভব এই অঞ্চলেই। সুতরাং বাঁকুড়া-মল্লভূম অঞ্চলের গ্রাম্যশব্দ সংকলন বাংলা ভাষাতত্ত্বের পূর্ণতা বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী।

ক্ষেত্রভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য, বিশেষতঃ ধ্বনিমাধুর্য, উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, উৎপত্তিতত্ত্ব, প্রয়োগকৌশল প্রভৃতির চমৎকারিত্ব আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। পাশাপাশি জ্ঞান অন্বেষার ক্ষেত্রে আমি বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বহু গ্রন্থ ও রচনাদি থেকেও প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছি। অন্যদিকে নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রাম্য অথচ সংস্কৃতিপ্রেমী, সমাজসচেতন মানুষজনের অকৃত্রিম সহযোগিতা আমাকে এ গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী করে তুলেছে। জ্ঞানী-গুণী, খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষের কাছ থেকে পাওয়া বহু মূল্যবান তথ্যাদি, উপদেশ, ও পরামর্শ আমার সাধনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে



লোকসাহিত্যবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে লেখিকা।



ভাষা সংগ্রহ কাজে গ্রাম সমীক্ষা। (সোনামুখী)

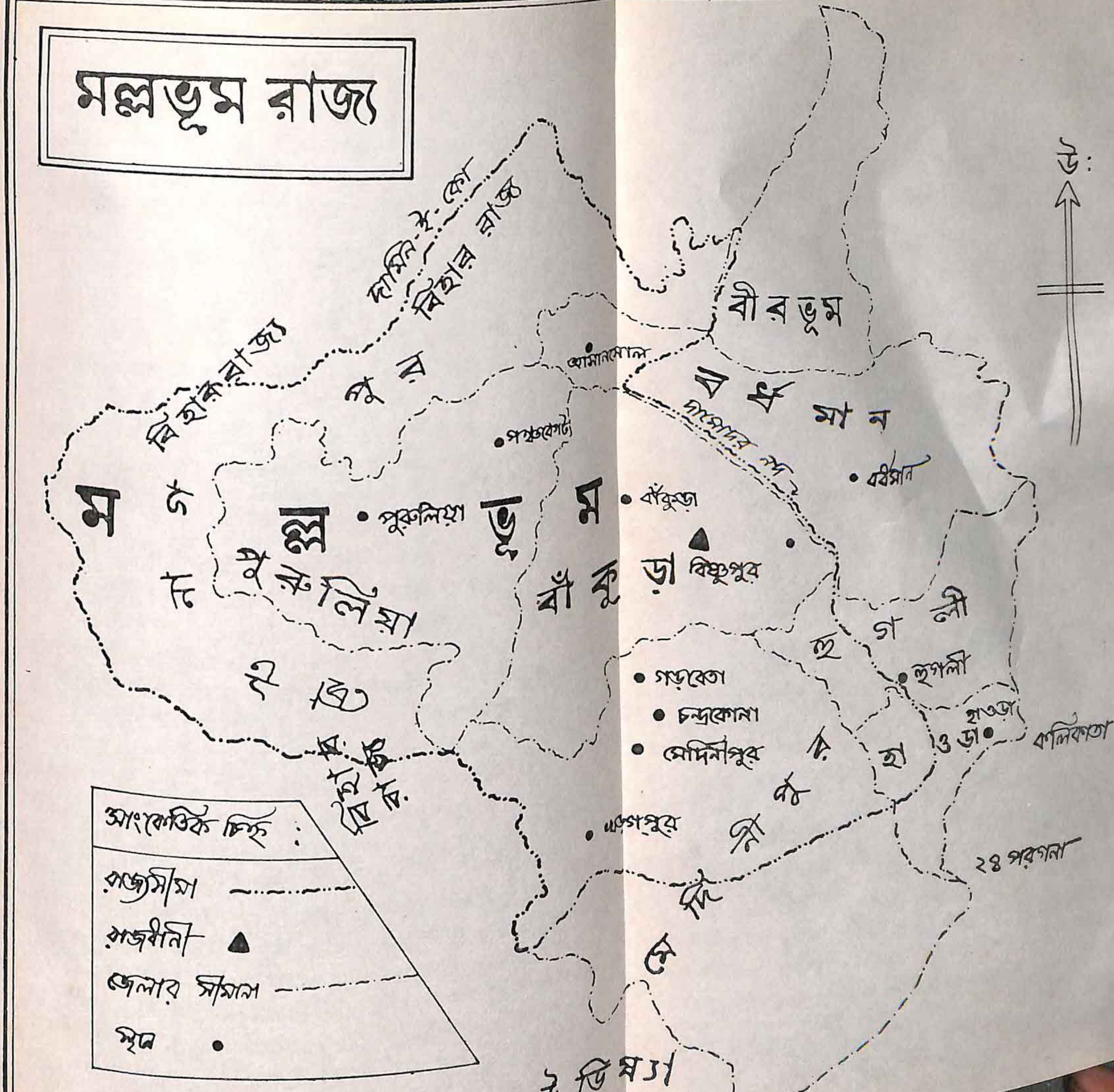


ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে প্রাচীন পুঁথি ও তথ্য-সংগ্রহ। (ময়নাপুর)



বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে—লেখিকা, শৈলেন দাস, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস,
অরিন্দম প্রধান, তুলসী চ্যাটার্জী ও অন্যান্যরা। (শুশুনিয়া)

মল্লভূম রাজ্য



উঃ
বিহার রাজ্য
বিহার রাজ্য
বীরভূম
আসানসোল
বর্ধমান
দামোদর নদ
বর্ধমান
ম
ল্ল
ভূ
ম
পুরুলিয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
হুগলী
হুগলী
গড়বেতা
চন্দ্রকোনা
মেদিনীপুর
হাওড়া
কলিকাতা
খড়গপুর
২৪ পরগনা
সাংকেতিক চিহ্ন :
রাজ্যসীমা
রাজধানী
জেলার সীমানা
স্থান

প্রথম অধ্যায়

সূচনা পর্ব

'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' নিয়েই আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ। আর্যদের ভারতে আগমনের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির আগমন ও সংমিশ্রণ ঘটেছে এই ভারতভূমিতে। বহু ভাষাভাষী ভারতজনের দেশে বিচিত্র আচার-ব্যবহার ও নানা ধর্মে বিশ্বাস নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। এই বৈশিষ্ট্য-পরিচয়ের বিভিন্নতায় এক-একটি অঞ্চলের ভাষা এক-একরকম রূপ লাভ করেছে।

ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা 'বাংলা ভাষা'। এ ভাষা মূলত চার শ্রেণীর : (১) ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠী, (৩) অস্ট্রিক অর্থাৎ এশীয় মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভাষাগোষ্ঠী এবং (৪) তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আর্যগোষ্ঠীর ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত। বাংলা ভাষা এই আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত। কারণ সমগ্র উত্তর ভারতে বৈদিক যুগ থেকে আর্য ভাষা সংস্কৃতরূপে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এ ভাষা প্রাকৃত ভাষার রূপ নেয়, এবং পরবর্তীকালে তা রূপ বদ্‌লিয়ে অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী প্রভৃতি নানা অপভ্রংশ ভাষা থেকে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার প্রকাশ ঘটেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ণিয়া, মানভূম, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসামের একাংশের প্রায় ১৪-১৫ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

আমরা বাঙালী। আমাদের মূল ভাষা বাংলা। কিন্তু বাংলা ভাষাকে কেন্দ্রে রেখে একই ভাষাগোষ্ঠীর লোক মুখের উচ্চারণে কিছু তারতম্য ঘটায়। এ তারতম্য দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। ফলে মূল ভাষার নানা আঞ্চলিক রূপান্তর ঘটে—যাকে বলা যেতে পারে উপভাষা।

বাংলা ভাষায় আমরা মোটামুটি ৫টি উপভাষা দেখতে পাই। সেগুলি হ'ল (১) কামরূপী, (২) বরেন্দ্রী, (৩) বঙ্গালী, (৪) ঝাড়খণ্ডী, (৫) রাঢ়ী।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে পড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল। আর রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে পড়ে কলিকাতা, ভাগীরথী নদীর উভয় তীর, উত্তর ও পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বিহারের সিংভূম ইত্যাদি অঞ্চল।

* * *

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য অঞ্চল হ'ল 'মল্লভূম অঞ্চল', যার প্রধান অংশ এখন মানভূম ও বাঁকুড়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ অঞ্চল বহুবার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। তবে রাজধানী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্রে রেখে এ অঞ্চলের সীমানা হ'ল—উত্তরে দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের খড়্গপুর, পূর্বে কোতুলপুর ও বর্ধমানের কিছু অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমির কিয়দংশ। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য]

'মল্লভূম' একটি গৌরবোজ্জল নাম। নামটি অবশ্য ইতিহাসের। সম্ভবতঃ মধ্যযুগেই এর খ্যাতি। এর প্রাচীনতম অভিধা 'সুহ্মভূমি' বা 'সুব্‌ভভূমি'। পরে রাঢ়দেশ। বিশাল এই ভূমিখণ্ডের প্রাচীন এবং মূলভাষা অস্ট্রিক (অস্ট্রো-এসিয়াটিক) এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মুণ্ডারী, সাঁওতালী, হো, খেড়িয়া, অসুরী, শবর, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষাও এর সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে প্রাচ্য বা মাগধীগুচ্ছের মগহী, ভোজপুরী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা। এইসব আর্যভাষাগুলি অনার্যভাষার সঙ্গে সহাবস্থান করতে করতে বহু রূপপরিবর্তন করেছে। কাজেই সুবিস্তীর্ণ মল্লভূম অঞ্চলের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মতো একটি বিশিষ্ট উপভাষামণ্ডলও রয়েছে। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা—**'ঝাড়খণ্ডী ঘেঁষা পশ্চিমারাঢ় ভাষা'**।

এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনবৃত্ত বহুমুখী ভাবধারার ভাঙা-গড়ার মিলনতীর্থে সমৃদ্ধ। যেমন—অঞ্চলটির পূর্বদিকের ভাষা ও সংস্কৃতিতে সমতলী বাংলার চাকচিক্য। পশ্চিম ও উত্তরাংশে ভোজপুরী, মগহীর প্রভাব। দক্ষিণাংশে উড়িষ্যার ভাবজীবনের সম্বন্ধ বর্তমান। তবে মূল কেন্দ্রে অস্ট্রিক ভাষা ও ভাবধারা গভীর প্রভাবচারী। সেকারণে শব্দে ও ধাতুতে, ধ্বনি ও বাগ্‌বৈচিত্র্যে এ ভাষা এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ও স্বতন্ত্রতার দাবী করতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে পণ্ডিতেরা ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষাগুলির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি

বললেই হয়। এ অঞ্চলের বাংলা উপভাষা নিয়ে আভাস-ইঙ্গিতের মতো দু' একটি প্রবন্ধ এবং কিছু আলোচনা কেউ কেউ করে থাকলেও সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি বললেই চলে। অবশ্য জি. এ. গ্রীয়ারসন তাঁর **'ভারতীয় ভাষা সমীক্ষা' (১৯০৩) গ্রন্থে 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা'র** উল্লেখ করেছেন। এটাই বোধহয় এ অঞ্চলের উপভাষার প্রথম উল্লেখ। পশ্চিমা-বাংলার মূল কথ্যাঞ্চল এবং তার বিস্তারভূমি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'The Western dialect of Bengali is spoken in its extreme from in the east of Chota-Nagpur Division in the District of Manbhum and in the tract called Dhalbhum in the east of Singbhum District... going east. We find it spoken in the Birbhum and Bankura District, and in the Western portion of the Burdwan District, especially about Raniganj but in these Districts it gradually merges into central or standerd Bengali'.[১]

গ্রীয়ারসনের আলোচনার মূল্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত। অবশ্য তিনি সর্বভারতীয় ভাষার পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলা উপভাষার উপর সামান্য আলোকপাত করেছেন মাত্র। সেকারণে তাঁর পক্ষে যে-কোন উপভাষা বিষয়ের উপর গভীর আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। একজায়গায় সাধু বাংলার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় এ অঞ্চলের ভাষার (পশ্চিমী উপভাষার) পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন এর ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য হ'ল—

(১) 'অ' > দীর্ঘ 'ও'। যেমন—বলল > বল্লো।

(২) 'ও' > উ। যেমন—ছোট > ছুটু; তোর > তুর ইত্যাদি।

(৩) 'এ' > তির্যক হ্রস্ব এ (e উচ্চারণে 'এ' > এ্যা। যথা—এক > এ্যাক; গেল > গ্যাল; দেখ > দ্যাখ ইত্যাদি।

(৪) 'ন'-র স্থানে 'ল'। যথা—নাচ > লাচ; নদী > লদী ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়াপদের শেষে স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতার ঝোঁক। যেমন—যাইয়া > যায়েঁ্য; খাইয়া > খায়েঁ্য ইত্যাদি।

The old singular forms of personal pronouns ('mui' meaning 'I', and 'tui' meaning 'thou') are frequently used instead of the standard 'ami' and 'tumi'.[২] এ ছাড়া অতীতকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া (i) অকর্মক হলে 'ও' এবং (ii) সকর্মক হলে 'এ' 'এক' বিভক্তি হয়। যেমন—

হলেক > হলে—অকর্মক। বল্লে > বল্লেক—সকর্মক। সাধু বাংলায় বলিলে, এবং ণিজন্ত অসমাপিকা পদে স্বরসংকোচনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—উড়াইয়া > উড়িয়ে; বোলাইয়া > বুলিয়ে ইত্যাদি।

গ্রীয়ারসনের উল্লিখিত দক্ষিণ-পশ্চিমী বাংলা উপভাষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মিলকে বিষয়বস্তু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বুলেটিনে ডঃ সুধীর করণের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি 'South Western Bengali in the language of Srikrishna Kirtan'। ভাষাগত দৃষ্টিতে এ পর্যন্ত প্রকাশিত এই উপভাষার উপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা অধ্যয়ন নেই বললেই হয়। কিছুদিন আগে অবশ্য ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা তাঁর 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা' গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি শ্রীমতী রেখা সিংহের 'মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ' গ্রন্থে মানভূমের উপভাষা ও লোকসাহিত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পশ্চিমী বাংলা উপভাষার আলোচনায় ধলভূম, মানভূম এবং মল্লভূম ইত্যাদি ভূমিরাজ্যের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে আমরা মনে করি। সেকারণে ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে মল্লভূমের কিছু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ভূ-প্রকৃতি ও ইতিহাস

ভূ-প্রকৃতির রূপরেখায় মল্লভূম অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ পাহাড় ও ডুংরি সমাকীর্ণ অসমতল ভূমিঅঞ্চল। এ অঞ্চলের ভাষায়, সাহিত্যে ও জনজীবনে এই আরণ্য-পার্বত্য প্রকৃতির প্রভাব ও দান অপরিসীম। ভাবজীবনের অভিব্যক্তিতে শুশুনিয়া, পঞ্চকূট, পরেশনাথ, মশক, অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডি প্রভৃতি পাহাড়ের উপস্থিতি বারংবার। আর শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন গ্রামনাম, দেবদেবী ও বনজ লতাপাতা, ফুলফল ইত্যাদির প্রাচুর্য অত্যধিক।

এখানকার ভূ-প্রকৃতির পরিচয়ে গভীর নদীধারা কম। যা আছে তা মুখ্যত গিরিনদী। প্রধান নদনদী দামোদর কাঁসাই, শিলাই, গঁধাই, ধলাই ও দ্বারকেশ্বর। গৌরবে দামোদর শ্রেষ্ঠ হলেও কাঁসাই এ অঞ্চলের অস্থিমজ্জায়। কাঁসাই সভ্যতা এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চেতনায় ও সাহিত্যিক ভাবনায়। রুক্ষ-কঠিন-লালমাটিকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কাঁসাই ঢুকেছে বাঁকুড়ায়। নেমেছে আরও দক্ষিণে মেদিনীপুর

জেলার ডেবরা, দহিমুড়ি ও পাঁশকুড়ার পাশ দিয়ে রূপনারায়ণে। পার্শ্ববর্তী বরাভূম থেকে এসেছে কুমারী। পুবদিকে একটু এগিয়ে মানবাজার পার হয়ে বাঁকুড়ার আমাইনগরের (অম্বিকানগর) কাছে কাঁসাই এক হয়ে গেছে। আর কাশীপুর থেকে আসছে দ্বারকেশ্বর। যার পূর্বনাম ধলাই > ধলকিশোর > ধল্লেশ্বর। আর একটি ধারা শিলাই > শিলাবতী পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা একাকী এগিয়ে বাঁকুড়ার সিমলাপাল পার হয়ে মেদিনীপুরের উত্তরে জয়পাণ্ডায় গিয়ে মিশেছে।

যে-কোন দেশের, যে-কোন সভ্যতার কেন্দ্রে নদী। এখানকার নদীগুলিও এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই নদীর বাঁকে বাঁকে; নদীঘাটের পাশে পাশে মুক্তমেলার আধিক্য।

মল্লভূমের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস। কিন্তু অধুনা প্রায় বিস্মৃতিতে অস্পষ্ট। মধ্য ও আধুনিকপূর্ব যুগের কোন বিস্তৃত ও প্রামাণিক তথ্য তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। জনশ্রুতিগুলিও অতিরঞ্জিত। কিছু কিছু বিস্মৃত। পুরাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণও বিক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফল হিসাবে যে-সব উপাদান এ পর্যন্ত আমরা হাতে পেয়েছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রস্তর যুগেও মল্লভূম অঞ্চলের শুশুনিয়াতে প্রাচীন মানুষের বিচরণভূমি ছিল। সেদিনকার মানুষের ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধই তার সাক্ষ্য দেয়।[৪]

বাঁকুড়ার অম্বিকানগরে এবং পরেশনাথ পাহাড়ের আশেপাশে মধ্যপ্রস্তর যুগের বহু আয়ুধজাতীয় উপকরণ পাওয়া গেছে। শুশুনিয়া পরিমণ্ডলে প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে ধনকোড়া, বাঁকাজোড়, গন্ধেশ্বরী ইত্যাদি নদীগুলির পার্শ্ববর্তী চার-পাঁচটি অঞ্চল থেকে। তাছাড়া দ্বারকেশ্বর উপত্যকার উপরশোল থেকে এবং কুমারী নদীর তীরবর্তী হাতি-খেদা, চি-আদা, বড়িড প্রভৃতি গ্রামগুলি থেকেও কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে মধ্য ও শেষ প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল কাঁসাই-কুমারী কেন্দ্রে। দ্বারকেশ্বর কেন্দ্রে এবং শুশুনিয়া পরিমণ্ডলের বাঁকাজোড়, চাঁদড়া, ধনকোড়া, বিসিন্দা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং কাঁসাই নদী উপত্যকার পরেশনাথ ও শুশুনিয়ার অনতিদূরে বনআশুড়িয়া গ্রাম থেকে নবাশ্মীয় আয়ুধের আবিষ্কার ঘটেছে।

মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমানায় এঁড়গদা, শিলদা, সেধনী, কুকড়াখুপী, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে বহু প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদিকে

পুরুলিয়া জেলার ধর্মপুর, লালপুর, কৃষ্ণপূর্বঘাট প্রভৃতি গ্রামে উত্তরপ্রস্তর যুগের বহু উপকরণ পাওয়া গেছে। ভিনসেন্ট বল কর্তৃক ১৮৭৮ সালে পরেশনাথ পাহাড়ের তলদেশে প্রস্তর যুগের ছেদনাস্ত্র আবিষ্কার তাঁর দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ছোটনাগপুর থেকে শুশুনিয়া পাহাড় পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয় এ অঞ্চলগুলিতে প্রস্তর যুগের মানুষের সুনিশ্চিত বসতি ছিল।[৫]

নব্যপ্রস্তর যুগের পর তাম্র যুগ। কিন্তু বিশেষ কোন তাম্রায়ুধ বাঁকুড়া বা মল্লভূমের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে ১৯৭৬ সালে নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলা সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগুইবনী গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কয়েকটি নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর দেবকুমার চক্রবর্তীর হাতে আসে। সেগুলি দেখে তিনি যে অভিমত পোষণ করেন তা তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জানা গেছে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া—এই তিনটি জেলায় এক অনার্য সভ্যতার বিস্ফুরণ ঘটেছিল সুদূর অতীতে, কারণ পরবর্তী কালে পুরাতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ দল মেদিনীপুরের আগুইবনীতে তাম্রপ্রস্তর যুগের কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। আবার কয়েক হাজার বছর মাটির তলায় চাপা পড়া ছ্যাতলা ধরা একখানা গোটা পরশু ও একটি প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আধভাঙা আর একটি পরশু ও এগারখানা বালা, খানকয়েক পুতুল, খেলার ছোট থালার মাপের চওড়া তামার পাত ইত্যাদিও ঐ গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেছেন।...১৯৬৮ সালে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার হুড়া থানার কুলগড়া গ্রামে কিছু কিছু এই ধরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। আগুইবনীতে প্রাপ্ত তাম্রপ্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলি আবিষ্কারের কিছু-কালের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার জামবেদা গ্রামের ভক্তবাঁধ খননের সময় একটি সস্কন্ধ তামার কুঠার এবং একটি সূচালো তামার ফলা আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার অন্তর্গত ভূতশহর গ্রামের নিকটবর্তী আড়রা গ্রাম থেকে প্রচুর তাম্রায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাঁটিবনী অঞ্চলে তামাজুড়ি গ্রামে তাম্রনির্মিত কুঠারফলক পাওয়া গেছে।...প্রায় দু'হাজার বছর আগে ধলভূমে জৈন 'সরাক' সম্প্রদায় তামা গলানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। এখনও ধলভূম ভারতের সর্ববৃহৎ তাম্রাঞ্চল।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর জেলাগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শিলাই নদী উপত্যকা থেকেই তাম্রায়ুধ সম্ভারের আবিষ্কার দেখা যায়। কাজেই মনে হয় যে শিলাই নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার অঞ্চলগুলিতে আকরিকভাবে তামা রয়েছে। তামা গলাবার প্রাচীন পদ্ধতিও শিলাই, কাঁসাই এবং কুমারী নদী উপত্যকায় দেখা যায়।[৬]

প্রাচীন যুগের ইতিহাস অন্বেষণে বলতে পারি, আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সময় আর্যাবর্তের পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ এই অঞ্চলের জঙ্গল-খণ্ডে এসে মিশে গিয়েছিল। আর এই অরণ্যভূমি অনার্য অধ্যুষিত। 'আয়ারঙ্গ স্থত্ত' থেকে জানা গেছে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে তীর্থংকর মহাবীর এই রাঢ়-সুহ্ম অঞ্চলে ভ্রমণে এসেছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহ যে, এই জৈনদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে আর্যসভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে খৃঃ পূঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতক সম্রাট অশোক ও কণিষ্কের কাল। এই সময় এদেশ বিজিত হয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায়নি। তাছাড়া এদেশের উপর কারো কোন রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছিল কিনা বলা যায় না। তবে পশ্চিম রাঢ় তথা মল্লভূম অঞ্চলের বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী ডিহর গ্রাম এবং দামোদর তীরবর্তী পখন্না (পুষ্কর্ণা) গ্রাম থেকে বহু মৌর্য-শুঙ্গ আমলের মুদ্রা পাওয়া গেছে। আবার কাঁসাই নদী উপত্যকার রাউতড়া এবং তিলাবনী গ্রাম থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে কুষাণ মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া গেছে। কাঁসাই-কুমারী নদী উপত্যকার পুরুলিয়া-মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনুরূপ মুদ্রা যথেষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলি গোলাকার। একাধিক মুদ্রায় চন্দ্রদেবের মূর্তি অঙ্কিত। (এ ধরণের মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, বিষ্ণুপুর শাখায় রক্ষিত রয়েছে।) এইসব আবিষ্কৃত মুদ্রা ও মূর্তির নজিরে বলা যেতে পারে যে এ অঞ্চলে একদা কুষাণ সম্রাটদের প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল। তাছাড়া কুষাণ রাজাদের তাম্রমুদ্রাগুলি যে ধলভূম, সিংভূম ও মল্লভূমে আহরিত তামা থেকে নির্মিত সেকথা অনেকে বলে থাকেন। কাজেই সেকালের নগরকেন্দ্রিক মানুষের কাছে এই মল্লভূম যে পরিচিত ছিল তা অনায়াসে বলা যায়।

গুপ্তযুগের কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে আর্যাবর্ত জয় করবার পর এই বনময় প্রদেশসমূহের কয়েকটিকে নিজ অধীনে আনতে চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সমুদ্রগুপ্ত

তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে যাত্রা করে মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী বনময় প্রদেশ মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজকে পরাজিত করেন। এরপর আসেন গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক। তাঁর রাজত্বকাল ৬০০-৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। ইউয়েন-সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলা হয়েছে। কর্ণসুবর্ণ বা ki-lo-na-su-fa-lana এখনকার সুবর্ণরেখার সঙ্গে হয়ত অভিন্ন। পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে দামোদর ও বৈতরণী নদীর উৎসসমূহের মধ্যভাগের ছোট ছোট পার্বত্যরাজ্য নিয়ে কর্ণসুবর্ণের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কানিংহামের মতে, কর্ণসুবর্ণের রাজধানী ছিল মানভূম জেলার বরাভূমের বরাবাজারে। এই প্রসঙ্গে কর্ণসুবর্ণজাত 'কানাসোনা' নামটিও কখনো কখনো দামোদরের প্রতিনাম বলে অনেকে মনে করেন। হয়ত শশাঙ্কের সময়ে এই অঞ্চলে কিছু কিছু শৈব ও হিন্দু ধর্মের বিস্তার ঘটে। তাঁর একাধিক তাম্রমুদ্রা মেদিনীপুর জেলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যার ও নিম্নবঙ্গের অনেকগুলি অঞ্চলের উপর অভিযান এবং আক্রমণ চালান। সেটা সম্ভবত ১০২১-২৩ খৃঃ। তাঁর এই আক্রমণের হাত থেকে সিংভূম, মানভূম ও মল্লভূম সম্ভবত বাদ না পড়লেও এসব অঞ্চলের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। অনেকের মতে দশম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ভূমিজ সর্দারদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর আসে মুসলমান যুগ। মুসলমান ইতিহাসকারদের এবং মধ্যযুগের সমতলভূমির মানুষদের কাছে পাহাড়-জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলগুলি 'মল্লভূমি' নামে পরিচিত ছিল। তাঁরা ছোটনাগপুর ও তার সংলগ্ন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিহারের কিছু অংশকে মল্লভূম বলে চিনতেন; এসময় মল্লভূম ছিল দুর্ভেদ্য অথচ স্বাধীন সামন্তরাজ্য। দিল্লীর প্রথমদিককার সুলতানরা মাঝে মাঝে এর সহজ অধিগম্য রাজ্যগুলিকে আক্রমণ ও করায়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন। এমনকি এ অঞ্চলের প্রবেশমুখে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সুবেদারও নিয়োগ করেছেন। যেমন—শামস্-ই-সিরাজ-এর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে (Tarikh-i-Firuz-Shahi) উল্লেখ আছে যে, সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাঁর দ্বিতীয় বাংলাদেশ অভিযানের সময় (১৩৫৯-৬০ খৃঃ) উড়িষ্যার জাজনগরের রাজাকে আক্রমণ করেন এবং সন্ধির পর তিনি মল্লভূম সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের[৭] বনপথ দিয়েই প্রত্যাবর্তন করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভবিষ্য পুরাণে এই ঝাড়খণ্ডকে শাল ও অন্যান্য বড় বড়

বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যাঞ্চল বলে উখেল্ল করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মল্লরাজ্য এবং ব্রাম্রমুখ রাজ্যের উল্লেখ দেখতে পাই। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মল্লভূমের রাজারা পূর্ণ-স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মল্লরাজবংশের ৪৯তম রাজা বীর-হাম্বির আকবরের কাছে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হন বলে কেউ কেউ মনে করেন। এ সময়ে মল্লভূম রাজ্য করের আওতায় এলেও মুসলমান বাদশাহদের কোন কঠিন নিয়ন্ত্রণ এ রাজ্যের উপর ছিল না। অনেকগুলি ছোট ছোট সামন্ত শাসিত ভূমিরাজ্যকে নিয়ে মল্লভূম ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র অরণ্যরাজ্য।

মল্লভূম ও বৃটিশ যুগ

১৭৬০ সালে বৃটিশের সঙ্গে মল্লভূম রাজ্যের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৭৬৬ সালে বিষ্ণুপুর রাজ্য ইংরেজদের খাস দখলে আসে।

১৭৮৭ সালে বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ বীরভূম ও মল্লভূমকে একটি জেলায় পরিণত করেন।

১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হয়।

১৮৩৩ সালে বিষ্ণুপুর বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

১৮৭২ সালে সোনামুখী, ইন্দাস্, কোতুলপুর, শেরগড় ও সেনপাহাড়ী বর্ধমান জেলার এলাকাভুক্ত হয়। তখন বাঁকুড়া জেলার নাম ছিল 'পশ্চিম বর্ধমান'।

১৮৭৯ সালে অক্টোবর মাসে রাইপুর ও সুপুর থানা (সুপুর = অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, ভোলাইডিহা পরগণা) মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৮১ সালে সোনামুখী, কোতুলপুর, ইন্দাস থানা বর্ধমানের অঙ্গচ্যুত হয়ে বাঁকুড়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার আয়তন অপরিবর্তিত রয়েছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৭৬০ সালে বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরকাশিমের কাছ থেকে এই অঞ্চলের সনদ লাভ করে। প্রথম পাঁচ বছর এই অঞ্চলের উপর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ কোন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়নি। কিংবা তাঁরা এ ধরণের কোন পরিকল্পনা করেননি। পরে ১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদসাহ শাহ আলমের কাছ থেকে

কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পরই মীরকাশিমের দেওয়া সনদ অনুযায়ী এ অঞ্চলের[৮] উপর তাঁদের পূর্ণ অধিকার বর্তায়। মল্লভূম তখন কতকগুলি ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের সমষ্টিমাত্র।

১৭৭৬ সালে মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট মিঃ গ্রাহাম কলকাতা কার্যালয় থেকে অনুমতি নিয়ে ফার্গুসনের অধীনে পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গল জমিদারদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ফার্গুসনের প্রথম অভিযান ঝাড়গ্রামের উপর। তারপর একে একে মেদিনীপুরের রামগড়, শাঁকাকুল্‌হি (লালগড়), জামবনী (শিলিদা), ঝাঁটিবনীর পতন ঘটে। ফার্গুসন এগিয়ে যান (বাঁকুড়া) বলরামপুরের দিকে, এবার পতন ঘনিয়ে আসে বাঁকুড়া জেলার আমাইনগর (অম্বিকানগর), সুপুর, ছত্রিনা (ছাতনা) এবং রাইপুর ও ফুলকুসমার। আরও পশ্চিমে একের পর এক পরাভূত হতে থাকে পুরুলিয়া জেলার মানভূম ও বরাভূম। ফার্গুসনের অভিযান সবচেয়ে প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ধলভূমের রাজার কাছ থেকে। এরপর ১৭৭৬ সালের মার্চের মাঝামাঝি ফার্গুসন জামবনী থেকে ঘাটশিলার দিকে অগ্রসর হলে প্রথমে বাধা পান ধেজ গ্রামে। এরপর এপ্রিল মাসে তিনি আবার ঘাটশিলা আক্রমণ করেন। আগস্টে তাঁর তৃতীয় আক্রমণের সময় রাজা জগন্নাথ ধল সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন। এইভাবে ১৭৬৮ থেকে ১৭৭৭ পর্যন্ত প্রায় এক দশক ধরে বিরোধের পর ১৭৭৭ সালে একটি নির্দিষ্ট রাজস্বের শর্তে জগন্নাথ ধল বৃটিশ শাসকের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। ১৮০০—১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ধলভূমের প্রশাসনিক সংযোগ ছিল মেদিনীপুরের সঙ্গে।

ছোট ছোট বিভিন্ন রাজ্য ফার্গুসনের কাছে অধীনতা স্বীকার করলেও, আদিবাসীপ্রধান মল্লভূমরাজ্য কোনদিনই তা মেনে নেয়নি। এই অরণ্যরাজ্যের মানুষেরা আপন স্বাধীনতাকে কোনদিনই খর্ব করতে চায়নি। তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গৃহবিবাদ এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করবার জন্য বারবার এ রাজ্যকে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। ফলে কখনও এ রাজ্য হয়েছে চাক্‌লা মেদিনীপুরের অন্তর্গত, কখনও আবার বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে ১৮০৫ সালে অরণ্যপ্রধান রাজ্যগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'জঙ্গলমহল' নামে একটি বিরাট জেলা।

'জঙ্গলমহল' গঠন স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান করতে পারেনি। বরং এইসব অরণ্যরাজ্যগুলির অনার্য সামন্তরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নিজেদের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার

জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠছিল এবং ক্রমশ নিজেদের প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ঠিক এই সময়েই জঙ্গলমহলের উত্তরদিকে বিহারের এবং দক্ষিণদিকে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। বাংলা থেকে কায়স্থ ও বণিক সম্প্রদায় এবং কিছু মুসলমানও কখনও কখনও উত্তমর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করে কিছু কিছু জমিজমা ও ব্যবসাপত্তর লেনদেন নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর অত্যাচার ও শোষণ চালাতে থাকে। ফলে, চারিদিকে ব্যাপক অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে। দেখা দেয় 'ভূমিজ-বিদ্রোহ' (১৮৩২) বা 'চুয়াড়-বিদ্রোহ'। ইংরেজরা অনেক কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করলেও, ১৮৩৪ সালে জঙ্গলমহল ভেঙে 'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি' গঠন করতে বাধ্য হয়।

মানচিত্রে মানভূম জেলার প্রকাশ এই সময় থেকেই। তখনকার মানভূমে সুপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর, ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা এবং ধলভূমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ সালে খাতড়া, সিমলাপাল ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে মল্লভূম রাজধানী বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়াকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

এইভাবে রাজনৈতিক সীমানা বেশ কিছুকাল অপরিবর্তিত থাকলেও, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবহমানতা কোনদিনই স্থির থাকতে পারে না। বিশেষত সীমান্ত অঞ্চলে। তাই নদীর মতই তা নানা বাঁক নেয়। সেকারণেই ইতিহাসের দীর্ঘ শতাব্দী থেকেই এই আরণ্যজীবনের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা শহুরে জীবনচর্চার থেকে স্বতন্ত্র ও স্বনিষ্ঠ ॥

১. L. S. I., Vol V, Part 1, G. A. Grierson.
২. L. S. I., Vol I, Indo-Aryan Family Eastern groups, Calcutta, 1899, p. 59—62—Grierson.
৩. মানভূম এখনকার পুরুলিয়া ও ধানবাদ বোঝালেও বৃহত্তর অর্থে এর সীমানা বাঁকুড়া পর্যন্ত।
৪. একাধিক ইউরোপীয় গবেষক মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিশ্রমে কতকগুলি প্রস্তরায়ুধ সংগ্রহ করেছেন।
৫. পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মাণিকলাল সিংহ।
৬. তদেব।
৭. তখনকার ঝাড়খণ্ড বলতে বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তর উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পূর্বাংশকে বোঝাত। —ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা।
৮. সমস্ত জঙ্গলমহল এবং মেদিনীপুরের অন্তর্গত ধলভূম, ছোটনাগপুর এবং তৎসন্নিহিত সমস্ত জঙ্গলভূমির রামগড়, পালামৌ ও পাঞ্চেৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও মল্লভূমের ভাষা : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাংলা ভাষা ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের বাঙালী জাতি ও তার সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এসব তথ্যের বহু অনুসন্ধান চলছে। নৃতাত্ত্বিকের মতে, বাঙালী জাতির উৎপত্তিতে কয়েকটি মূল জাতির উপাদান নাকি বর্তমান। যেমন, (১) লম্বা আর উঁচুমাথাওয়ালা একটি জাতি North Indian Aryan Long heads। এই জাতিটিই হচ্ছে আর্যভাষী জাতি। পঞ্জাবে, রাজপুতানায়, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটি খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা মাথাওয়ালা লোক বেশী দেখা যায় না। (২) লম্বা আর নীচুমাথাওয়ালা একটি জাতি South Indian or Dravido-Munda Long heads। আধুনিক দক্ষিণ ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড়ভাষীরা আর কোলজাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাংলাদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। (৩) গোলমাথাওয়ালা একটি জাতি Alpine Short heads। এদের সরল নাক, মুখে দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য। সিন্ধুপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যভারত, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রভৃতিতে এদের বাস ছিল। এইরূপ মস্তকাকৃতির লোক ওইসব দেশে এখনও বেশী দেখা যায়। বাংলাদেশেও এইরূপ লোকের প্রাচুর্য যথেষ্ট, বিশেষ করে ভদ্রজাতির মধ্যে। এই গোলমাথাওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায় বৈদিক যুগের পূর্বে ভাষায় আর সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা যায়নি। (৪) গোলমাথাওয়ালা আর একটি জাতি Mongolian Short heads। এরা মোঙ্গলজাতীয় লোক। নাক চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফদাড়ি কম। উত্তর আর পূর্ববঙ্গের বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী পাওয়া যায়। এই চার প্রকার জাতির মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী। এটাই হচ্ছে সাধারণভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত।

এই চার প্রকার জাতিকে আমরা যদি ভাষার বিচারে বিশ্লেষণ করি, তাহলে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ লম্বা আর উঁচুমাথাওয়ালা জাতির লোকেরাই যে বৈদিক আর্যভাষী, উত্তর ভারতের পঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্তপ্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্বপুরুষ—একথা বর্তমানে প্রায় পূর্ণসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে, এমনকি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও এই শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ লম্বা আর নীচুমাথাওয়ালা শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল এবং কোলভাষী জাতিদের অনেকের পূর্বপুরুষ এ-বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইরূপ আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ গোলমাথাওয়ালা আর একটি জাতি যে ভোট-চীনা ভাষায় কথা বলত সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অসুবিধা দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ গোলমাথাওয়ালা জাতিদের ভাষা নিয়ে।

আমরা জানি ভারতে অধুনা বিদ্যমান ভাষাগোষ্ঠী মোট ৪টি। দ্রাবিড়, কোল, আর্য, ভোট-চীনা। এই ৪টি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কোল ভাষা সর্বপ্রাচীন ভাষা। এ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতদের। রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'Indo Aryan Races' নামক অতি মৌলিক তথ্যপূর্ণ নৃতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে, আমাদের এই Alpine Short heads শ্রেণীর লোকেরা North Indian Aryan Long heads-দের মতো আর্যভাষী ছিল। কিন্তু এ মত সকলের মনঃপূত নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ষষ্ঠ সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন 'আমার মনে হয় এই Alpine Short heads শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আর্য্য অথবা মোঙ্গলদের ভাষা বলত না। সম্ভবত তারা দ্রাবিড় বা কোল ভাষা বলত। কিংবা অধুনালুপ্ত কোন অনার্য্য ভাষা বলত।...বাঙলা দেশে আর্য্যভাষার আগমনের পূর্বে কোল, আর দ্রাবিড় এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভোটচীনা—এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই গোলমাথাওয়ালা Alpine Short heads দের মধ্যে। এদের অন্য কোন ভাষা ছিল কিনা জানবার উপায় নেই। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা লম্বা আর উঁচু মাথাওয়ালা শ্রেণীর আর্য্যদের আসবার আগে লম্বা আর নীচু মাথাওয়ালা একটি জাতির ভাষা কোল আর দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছিল। আর বাঙ্‌লা দেশের প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ কোল, দ্রাবিড়, ভোটচীনা ছাড়া অন্য ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আর্য্যদের আগমনের কালে

যে ভাষাতে দ্রাবিড় আর কোলই ছিল—এই অনুমান মেনে প্রবৃত্তি হয়।'[২]

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে দু'টি অনার্যজাতি বাস করত। দ্রাবিড় ও কোল। আর্যরা পূর্বে পারস্য হয়ে ভারতবর্ষে এসেছে। অনার্যদের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে। ধীরে ধীরে তারা গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনার্যদের দেশ দখল করেছে। কিন্তু অনার্যরা সমূলে উৎখাত হয়নি, তবে তাদের জাতীয় সংহতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সব বিষয়ে তারা তখন আর্যদের প্রভুত্ব প্রায় মেনে নিয়ে ভাষা, ধর্ম সবই গ্রহণ করল। আর্যরাও অনার্যদের প্রতিবেশ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারল না। অনার্যদের ধর্ম ও ভাষার অনেক শব্দ আর্যরাও গ্রহণ করে নিল। আর্যের ভাষা অনার্যের মুখে পড়ে স্বভাবতই কিছু রূপপরিবর্তন করল। আবার অনার্যের ভাষা আর্যের মুখে পড়েও কিছু রূপপরিবর্তন করতে বাধ্য হ'ল।

বাংলাদেশে যে অনার্যদের বসতি ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি এদেশের প্রত্যন্তভাগে এখনও পর্যন্ত অনার্যজাতির বসবাস দেখে। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্যত্বের অন্যতম প্রমাণ বাংলার গ্রামনামের বৈচিত্র্য। পশ্চিমবাংলায় ভূমিজ--সাঁওতাল-ওঁরাও-মালপাহাড়ীরা এখনও রয়েছে। ক্রমশ এরা বাঙালী হচ্ছে, হিন্দু হচ্ছে, খৃষ্টান হচ্ছে, এমনকি মুসলমানও হচ্ছে। অনুমান করা যেতে পারে দেশে অনার্য অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। কারণ এদেশে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অনার্যভাষী গোষ্ঠী বা জাতি (এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হোক না কেন) তাদের নিজ নিজ ভাষা নিয়ে, রীতি-নীতি নিয়ে বাস করত। এরা হ'ল কোল, দ্রাবিড় এবং মোঙ্গল। দ্রাবিড়ভাষী, কোলভাষী ও মোঙ্গলভাষী এই তিনটি জাতির মধ্যে দু'টিতে বা তিনটিতে মিলেমিশে আর্যদের আসার আগেই মিশ্রজাতির সৃষ্টি করেছিল, আর এই মিশ্রজাতির মধ্যে এই তিনটি ভাষার একটিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেটি কোন্‌টি? এ-বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আজও পৌছানো যায়নি।

ঝাঁ-পশিলুসকি (Jean Przyluski) নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত কোল-ভাষীরা যে বিরাট অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আর্যভাষার উপর যে তার প্রভাব পড়েছিল তা নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, বঙ্গ, কামরূপ এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই নামগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই জাতির নাম। 'রাঢ়' যে দুর্ধর্ষ অনার্যজাতি তার ইঙ্গিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গলে'

পাওয়া যায়। বাংলার আদি অনার্য (কোল বা দ্রাবিড়ভাষী Dravidian Long heads, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর) মানুষের থেকে উৎপন্ন এইসব জাতির বংশধরদের শুধু উত্তর ভারত থেকে আগত North Indian Long heads বা লম্বামাথা আর্যভাষীদের পূর্বপুরুষরূপে কল্পনা করলেই চলে না। লম্বামাথা আর গোলমাথা শ্রেণীর কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গলভাষী মিলেমিশে আর্যাবর্তের বিশুদ্ধ বা মিশ্র-ব্রাহ্মণদের সামাজিক নেতৃত্বে এক হিন্দুধর্ম আর বর্ণ-সমাজের সূত্রে এদের গেঁথে নিয়ে আধুনিক হিন্দু সমাজের পত্তন করে। এই সমাজকে দৃঢ় করতে এমনি করেই আর্যভাষা গ্রহণ করে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলাভাষাকে ১২০০ থেকে ১৮০০ সালের অন্তর্গত মনে করেন।[২]

১। প্রাচীন থেকে পরিবর্তনশীল স্তরের মধ্যে বাংলা ভাষা ১২০০-১৩০০ সাল।

২। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ১৩০০-১৫০০ সাল।

৩। পর-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ১৫০০-১৮০০ সাল।

আঠারশ সালের পূর্বে বাংলা সাহিত্য হাতে লেখা পুঁথিতেই আবদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ষোল থেকে আঠার শতাব্দী পর্যন্ত বহু বাংলা পুঁথি পাওয়া গেছে। তবে বিভিন্ন কারণে (যেমন, উইপোকার উৎপাত, বন্যা, ঘরপোড়া, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞ লোকের যত্নের অভাব) বহু পুরাতন পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ষোলশ সালের আগের বাংলা পুঁথি এ অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া গেছে। আবার পনেরশ সালের আগেকার বাংলা পুঁথি তো পাওয়াই যায়নি। তাই তখনকার বাংলার স্বরূপ জানবার জন্য পরবর্তীকালের অর্থাৎ ১৬-১৭ কিংবা ১৮ শতকে নকল করা ১৫ শতকের আগেকার কবিদের লেখা পুঁথিকেই একমাত্র অবলম্বন করতে হয়। অনুমান করা যায় যে চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪ শতকের শেষপাদে জীবিত ছিলেন। তিনিই হচ্ছেন পুরাতন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু' এক শত বছর আগেও বাংলায় কবি ছিলেন, কিন্তু কাব্য তেমন পাওয়া যায়নি। সুতরাং বাংলা ভাষার গতি আলোচনা করতে গেলে আমাদের স্বভাবতই স্বীকার করতে হয় যে ১৬০০ সালের আগেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শন একেবারেই নেই। কাজেই চণ্ডীদাসের পূর্বে (অর্থাৎ ১৪ শতকের চতুর্থপাদের পূর্বে) সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার আগেও অবশ্য বাঙালী গান গাইত, ছড়া বা ধাঁধা বলত,

কাব্য লিখত, কিন্তু তার তেমন কোন লিখিত প্রমাণ নেই। যা পাওয়া গেছে তা অনুমানসাপেক্ষ।

বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা অর্থাৎ ১৬শ শতকের প্রথমার্ধের বা ১৫৫০ সালের পূর্বের পুঁথির অভাব—বহুদিন ধরে বাঙালিকে এই অবস্থাতেই থাকতে হয়েছিল; কিন্তু বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে দু'খানি পুঁথি আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হয়ে ১৫শ সালের আগেকার বাংলা ভাষার নিদর্শন দিতে পেরেছে। এই পুঁথি দু'খানি হ'ল: চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও প্রাচীন বাংলার চর্যাপদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানি বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন মল্লভূমভুক্ত বাঁকুড়া জেলাস্থিত কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে। আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই মূল্যবান পুঁথিটিও গোয়ালঘরের মাচায় একটি ধামার মধ্যে রাখা ছিল। বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় এই পুঁথিখানি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন লিপিবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছিলেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু পুঁথিটি অত প্রাচীন না হলেও, চর্যাপদের পুঁথির পরে বাংলা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই বললেই চলে। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছিলেন যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ সালের পরের কিছুতেই হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে বহু মতানৈক্য রয়েছে। তবে আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে মূল পুঁথি পাচ্ছি তাতে ঐ যুগের সাহিত্যের ভাষা বা গানের ভাষা যা পাওয়া যাচ্ছে (তা যারই লেখা হোক না কেন) তা যে ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০/২০০ বছর আগেকার বাংলা ভাষার প্রামাণ্য দলিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল ১৩৫০-১৪৫০ সাল বলেই নির্ধারিত হ'ল। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন এ কাব্যে বিধৃত।

কবির জন্মস্থান নিঃসংশয়িতভাবে জানা না গেলেও এই কাব্যের ভাষার সঙ্গে পশ্চিম প্রত্যন্ত বাংলা উপভাষার (বাঁকুড়া-পুরুলিয়া) বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল এবং এই অঞ্চলের ভাবচেতনা ও প্রেমধারণার সমাজ-পরিবেশ থেকেই যে তা রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি এখনও এ অঞ্চলের অসংখ্য

লোকগীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ ও পংক্তিগুলির হুবহু অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এইসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পদ ও পংক্তিগুলিই সংহত ও অবয়বোচিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যায়িকাশরীর গড়ে তুলেছিল। শ্রীসুধীর করণ ঝাড়খণ্ডী 'পূর্বী' শাখার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার তুলনা করেছেন। মানভূম-বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলের শব্দ ও ধাতুতে বহু মিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়। তার কয়েকটি উদাহরণ—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন যা আজও মল্লভূম অঞ্চলে প্রচলিত :

ক. নিমিত্তার্থে বা তাদর্থে 'ক-এ' বা 'কে' প্রত্যয়ের ব্যবহার। যথা—
ভাবকে (ভালবাসার জন্য) আসা।
ঘাটকে (মাঠে পায়খানা করবার জন্য) যাব ইত্যাদি।
কিংবা, তুমি এ্যাত **ঘরকে** ভাব ক্যানে ?
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—'এহা তত্ত্বজ্ঞানী কর **ঘরকে** গমন।

খ. সপ্তমীতে 'ত' 'তে' বিভক্তি আধুনিক (ভাগীরথীকেন্দ্রিক) চলিত ভাষায় যেখানে লুপ্ত বা 'তাহার' 'তার' স্থানে 'এ' 'য়ে' প্রযুক্ত সেইসব জায়গায় 'ত' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—
তুমার কুথা**বার্ত্তাত** রাখাঢাকা নাই।—মল্লভূম।
'ঘর**ত** রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ।'—কৃ. কী.
কিংবা, 'রহেঁত বলয়া শোভে পাত্রত নূপুর।'—কৃ. কী.

গ. হিন্দী ভাষার প্রয়োগ—
'**কিসক** যৌবন রাধা করহ নিষ্ফল।' কৃ. কী.
এ অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষা—আমি **কিসকে** তুর উখানে যাব ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দাদি আজও মল্লভূম অঞ্চলে বিশেষতঃ বাঁকুড়া এলাকায় প্রচলিত। যেমন—

(১) আথান্তর = অবস্থা + অন্তর ; অর্থ—বিপদ।
ব্যবহার—'আজী কোন আথান্তর করিবেক রাধা।' কৃ. কী.
" —আমি এখন বড় আথান্তরে পড়লাম রে। মল্লভূম।

(২) আড়-করা = অন্তরায় সৃষ্টি করা। ঈষৎ বাঁকা।
'হেনরূপ দেখি চুথ আড় করে।' কৃ. কী.
তুমি দেখছি সব ব্যাপারেই আড় করছ। মল্লভূম।
চেয়ো না অমন আড় নয়নে। ঐ

(৩) আগু বাঢ়ায়িআঁ = আগে বাড়িয়ে / অগ্রসর হইয়া।

(৪) উয়াড় ; 'উ-র' = আচ্ছাদন, চাদর, **Cover.**
'নেত্র অঞ্চল যে দিআও উয়াড়ী।' কৃ. কী.
বালিশগুলার উয়াড় / উ-র পরাই দাও। বাঁকুড়া।

(৫) 'উ' = ঐ / অপর / অপরাহ্ণ / গত।
'উ বেলি ন জাইহ মথুরার হাটে।' কৃ. কী.
ই-কুলি বান, উ-কুলি বান। মল্লভূম।
উ-দিন তুমার আসার কথা ছিল। ঐ।

(৬) ওলা, অলা = পরিষ্কার করা / নামানো।
'ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী।' কৃ. কী.
জায়গাটা ভালো কর্যে ওলাও / উলিয়ে দাও। মল্লভূম।

(৭) কেহ্নে = কেন, ক্যানে।
'এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।' কৃ. কী.
হাথে হাথে পান কেহ্নে / ক্যানে দিলি ভাসুরকে। বাঁকুড়া।

(৮) করিলান্ত = ওড়িয়া শব্দের অন্তর্গত। শূন্যপুরাণে এরকম বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। যেমন—গেলান্ত, ছিলান্ত ইত্যাদি।

(৯) কাণ্ড = কাঁড়। ধলভূম ও মল্লভূম অঞ্চলে 'কাঁড়' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন—কাঁড়বাঁশ, কাঁড়বাণ ইত্যাদি।
'বিমাইল কাণ্ডের মাএ যে হেন হরিণী।' কৃ. কী.
কাঁড়বাণ লিয়ে চ গটো শিকার করি।

(১০) খেড় = খড় / বিচালী।
'খেড় আগুনী এক করিআ বড়ায়ি গেলি এক ভিতে।' কৃ. কী.
'খেড় কাটলী মাইয়া ঘর ছাইলি গে।' বাঁকুড়া (সাঁওতালী ভাষা)।

(১১) গাতর = গতর / শরীর বা দেহ।
'গাতর ভরা রাধা পেলা আভরণে।' কৃ. কী.
গাতর খাকীর বিটি নাকি কাজ করতে লারবি। বাঁকুড়া।

(১২) ঘুসঘুসিঞা = মৃদু / অল্প।
'এঁবে ঘুসঘুসিআঁ পোড়ে তোর মন।' কৃ. কী.
পত্যেক দিন ঘুসঘুস্যা জর আসছে। আজ ভাত খাব নাই। বাঁকুড়া।
উনানটয় এখন ঘুসঘুস্যা আগুন রয়ঁছ্যে। বাঁকুড়া।

(১৩) চুক=মাটির ছোট পাত্র।
'দধি দুধে সাজাইয়া চুকে।' কৃ. কী.
এ অঞ্চলে 'চুক' বলে না, বলে 'চুকা'।
'আন লো চুকা পিঠা করি তুষু খাবেক পোষ পরবে।' বিষ্ণুপুর।

(১৪) চামড় গাছ=একপ্রকার গাছ।
'মাঝ বৃন্দাবনে গিআঁ কাহ্নঞি গোআল
চামড় গাছের বাছি কাটিলেন ডাল।' কৃ. কী.
মল্লভূম অঞ্চলে বিশেষতঃ বাঁকুড়া, সোনামুখী ইত্যাদি জায়গায় এই গাছ দিয়ে বাঁক তৈরী করে। গাছটি লতাজাতীয়। পাতা মরা মরা। গা ভর্তি কাঁটা।

(১৫) ঝঁট্=শীঘ্র / তাড়াতাড়ি (সাঁওতালী শব্দ)।
'সব নঠ হএ কাহ্নাঞি ঝঁট কর পার।' কৃ. কী.
ঝঁট্ কর্‍্যে এই জিনিস কটা লিয়ে আয়। মল্লভূম।

(১৬) ঠেঁটা=নিকৃষ্ট।
'ঠেঁটা দানে কেহ্নে বিচিবেঁ দহী।' কৃ. কী.
নন্দের বেটা কেনে এত ঠেঁটা বুঝিতে পারি না মনে। বাঁকুড়া।

(১৭) তেলানী=তাওয়ার মতো আকৃতিবিশিষ্ট মাটির পাত্র।
উয়ার মু'টি বেশ তেলানী পারা। মল্লভূম।

(১৮) থান=ঠাঁই।
'এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।' কৃ. কী.
ঠাকুর থানে মাথা ঠেকাস। মল্লভূম।

(১৯) দু'অজ=দ্বিতীয়।
'দু অজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।' কৃ. কী.
দু'অজ (দো'জ) বরে কন্যা আমি দুব না কখন। মল্লভূম।

(২০) নাছ দুয়ার=বাইরের দরজা।
'নাছে গিঁয়ে চাহে রাহী নন্দের নন্দন।' কৃ. কী.
নাছ দুয়ারে বাঁদর নাচ দেখবি যদি আয়। মল্লভূম

(২১) নিহুড়=নীচু হওয়া।
'নিহুড়িআঁ চাহোঁ।' কৃ. কী.
ঘরের বহুড়ি, চলিবে নিহুড়ি। মল্লভূম।

(২২) নারো > লারো = পারো না। (প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ)

(২৩) না বাসসি = বাসিস্ না।

'গানমতী না বাসসি লাজে।' কৃ. কী.

ভালো না বাসিস্ না বাসসি তবু মুক্ করবি নাই। মল্লভূম।

(২৪) পরাক লাগিআঁ = পরের লেগে / পরের জন্য।

(২৫) পালি = পাইলি।

(২৬) বুলা = বেড়ানো।

'একলী বুলালি কেহ্নে বৃন্দাবন থাকে।' কৃ. কী.

বুলে বুলে ছেলাটকে ঘুম পাড়াও। বাঁকুড়া।

(২৭) বাখান = বাদানুবাদ / কটুকথা (সাঁওতালী)।

'আস্তাসনে রাধা তোঁএ না কর বাখান।' কৃ. কী.

যাকে তাকে অমন বাখান দিও না। মল্লভূম।

(২৮) বাগড় = বাধা, প্রতিবন্ধক।

'এড়হ বাগড় কাহ্নঞি জাইতেঁ দেহ ঘর।' কৃ. কী.

সব কাজটাতেই দেখছি বাগড়। বাঁকুড়া।

(২৯) বিহান = বেলা।

'বিহান আইলাহোঁ হৈ সাঁঝ উপসন।' কৃ. কী.

সাঁঝ বিহানে যাচ্ছু কুথা? বিষ্ণুপুর।

(৩০) বাসা = করা।

'গানমতী না বাসসি লাজে।' কৃ. কী.

'এসব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী।' কৃ. কী.

লাজ বাসছে, আনাড়া বাসছে ইত্যাদি এ অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষা।

(৩১) বিন্ধ > বিঁদ = ছিদ্র / ফুটো।

(৩২) বাহুড়া = ব্যাঘুট > বাহুড় = ফিরানো বা ঘুরিয়ে আনা।

'সর্বাঙ্গ সুন্দরী রাধা কেনা বাহুড়া।' কৃ. কী.

এ অঞ্চলের লোকভাষায় উল্টোরথকে 'বাউড়া' > বাহুড়া রথ বলে। নববিবাহিত কন্যাকে 'বাহুড়া'য় অর্থাৎ স্বামিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৩৩) ভোঁক = ক্ষুধা। হিন্দী শব্দ 'ভুখ' থেকে আগত।

'ভোঁকে ভাত দিবোঁ তোর পিআসত পানী।' কৃ. কী.

ভোক পাইলে খাত্যে হব তিষ্টা পাইলে জল হব। বাঁকুড়া।

(৩৪) মহুল=মহুয়া

'বহুল মহুল সআলী'। কৃ. কী.

মহুল পড়ে টপা টপা কি কর‍্যে কুড়াব ইকা। খাতড়া।

(৩৫) মাউসী=মাসী।

'মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহী।' কৃ. কী.

মা মাউসী আপন বেসী। মল্লভূম।

(৩৬) মাকড়=হনুমান।

'বামন শরীর মাকড় বেশ।' কৃ. কী.

মাকড়কে মারলে ধাকড়টি খেতে হবে। সোনামুখী।

(৩৭) রুখ্ > রুক্ষ=শুষ্ক।

'না বোল না বোল রুখ বাণী।' কৃ. কী.

হাত পা শুখা, মাথা রুখা। মল্লভূম।

(৩৮) সংহতী=সংগতি, সামর্থ।

'সংহতী এড়িআ জাএ গোআলিনী সখী।' কৃ. কী.

সংগতির গতি ছাড়া সে হয় সংহতী হারা। বাঁকুড়া।

(৩৯) সান=তীব্র / ধারাল / তীক্ষ্ণ।

'খাঅত উপরে খাতা বাঁশীর সান।' কৃ. কী.

বাড়ীর নাময় কাঁড়া রাখ্যে বাঁশীতে দেয় সান। বাঁকুড়া।

(৪০) সাদ < সাধ=ইচ্ছা।

'সাদ লাগে কাহ্নাঞি দেখিবারে।' কৃ. কী.

উয়াকে দেখতে বড় সাদ জাগে গ। মল্লভূম।

(৪১) হাকল-বিকল=আকুল-ব্যাকুল।

'বিরহে পড়িয়া কাহ্ন হাকল-বিকল।' কৃ. কী.

অত হাকল-বিকল ক্যানে? মল্লভূম।

(৪২) হৈবেক=হবে।

বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় এই রীতির ব্যবহার ব্যাপক। যেমন—হবেক, করবেক, বলবেক ইত্যাদি।

ধাতুগত দিক ঃ

পেল্—'বান্ধা খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ'—কৃ. কী.

লুলুক পেলাঁই দেল ভুলুকে। মল্লভূম।

সাম্বা—'তাহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে।' কৃ. কী.

এত করো্য বল্লম তবু তুর কানে সাম্বাল্য (সেঁধাল অর্থাৎ প্রবেশ করল) না। মল্লভূম।

হাল—'বাএ হালে।' কৃ. কী.

শীতে হিল্ হিল্ করছে। মল্লভূম।

তুর এ-কি হাঁড়ির হাল হৈছ্যে। ঐ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মতো মল্লভূম অঞ্চলের উপভাষাতেও কোন কোন শব্দের আদি স্বরে শ্বাসাঘাত হেতু অ, আ স্বরের আগমন ঘটেছে। যেমন—মহাজন > মাহাজন; মহাবীর > মাহাবীর; মহাদান > মাহাদানা > মাদানা; ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ফুটিলছে, রহিলছে, আলিছিল ইত্যাদি। বাঁকুড়ার উপভাষাতেও খেলছে বা খেলাচ্ছে; বা খেলাইছিলি, ঢিলাইছিলি ইত্যাদি। এসব ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরো বহু শব্দ রয়েছে যা আজও মল্লভূম অঞ্চলের নিজস্ব ভাষারূপে প্রচলিত। যেমন—খলা, স্বরগুঠী, চাঁচা, বাওএঁ, নালিচা, পাট ইত্যাদি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'চণ্ডীদাসের বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এবং কোন কোন কিংবদন্তীতে বীরভূমের নান্নুরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় থেকে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া অঞ্চলের এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূম অঞ্চলের লোক।...' কাব্যের ভাষা, রীতি ও পারিপার্শ্বিক সমাজকথা এ মতের সপক্ষে রায় দেয়। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতকে সমর্থন করে বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়ারই মানুষ এবং তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মল্লভূম অঞ্চলেরই সার্থক ও শাশ্বত সাহিত্য নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া অন্যান্য কাব্য ও গ্রন্থেও এ অঞ্চলের শব্দ বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। শব্দগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীর মতই। যেমন—

অলা—মূল শব্দ ওলা, গোলা শব্দ থেকে জাত। মিছরির সাদা নাড়ু।

মধ্যযুগের সাহিত্যে—'ওলা লাড়ু চিনি।'

বিদ্রূপাত্মক—তোকে অলার সরবৎ দিবেক। মল্লভূম।

আঞ্জি, আঁজি—চালুনি।

'বড় বড় কৈ মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি
জিরা মরিচ মাখি তৈলে তোলে ভাজি।' বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল।
মিহি মিহি চালের গুঁড়ো
ও বৌ, আঁজি করে আঞ্জিয়ে তুলো। মল্লভূম।

আগুড়—আগড় ; খিল।

'সত্যের দ্বারে আগুড় নাই,।' দীনবন্ধু মিত্র।
বৌ আসছে দ্বার আগুড়। মল্লভূম।

আগ্‌ড়া—ভূয়া ; শস্যহীন ধান।

'বৃথা পরিশ্রম কর অর্থ না মিলয়।
শস্যের আশায় যেন আগ্‌ড়া কুটয়॥" ভক্তমাল।
পাঁচ সোলি ধানের এক সোলি আগড়া। মল্লভূম।

আটা—গোধূমচূর্ণ। স্বর্ণবর্ণ।

'অঙ্গ ছটা আটা তার।' বৈষ্ণব পদাবলী।
আটা রঙের ট্যামক কত! মল্লভূম।

আড়—অবরোধ। প্রস্থ। ঈষৎ বাঁকা।

প্রস্থ অর্থে—'আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ।' কাশীদাসী মহাভারত।
ঈষৎ বাঁকা অর্থে—'আড় বাঁশী বাএ মধুরে।' কৃ. কী.
আটক অর্থে—পথ আড়ে (এড়ে) দাঁড়িয়ে আছে। মল্লভূম।

আড়া—শস্য মাপবার পাত্র।

'পাঁচ আড়া মাপি দিল ধান।' কবিকঙ্কণ।
পাঁচ আড়া ধানের এক আড়া আগ্‌ড়া। মল্লভূম।

আড়ি—ধানজমির সীমানা।

'আড়ি তুলি ধরাইল ধান।' শিবায়ন।
জমির আড়ি বাবলা গাছ। মল্লভূম।

আড়ি—বিদ্বেষ, মনোমালিন্য।

'ইছাই উপরে বড় ভূপতির আড়ি।' ধর্মমঙ্গল।
ছোট্ট ছেলাদের আজ আড়ি কাল ভাব। মল্লভূম।

ইচলা—চিংড়ি, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে ইচা।

'ইচা মৎস্য ডিম পাড়ে তার দাড়ি মুছে।' দ্বিজ বংশীদাস, মনসামঙ্গল।

ইচলা মাছের টক! নলায় জল আসছে। মল্লভূম।

উছুড়—বমি করা।

'কুকুরে উছুড়ে রেখেছে।' দীনবন্ধু মিত্র, জামাই বারিক।

কচি ছানাটা কদিন থেকে খালি উছুড়ছে। মল্লভূম।

কাছাড়—পড়ে যাওয়া। ভূপতিত হওয়া। কাছাড় > আছাড়।

'আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়।' চৈতন্য চরিতামৃত।

কাছাড় খায়েঁ মু'টা থেঁতলে গেছে। মল্লভূম।

কোয়ালি—যারা গো-সম্বন্ধীয় গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করে।

'গোহাল্যা গাইয়া গীত, কোয়ালি ফিরয়ে নিত।' কবিকঙ্কণ।

উ গাঁয়ে কোয়ালি গান হয় বটে। মল্লভূম।

কাঁকাল—কোমর।

'কাঁকাইলে হৈল বাত।' কবিকঙ্কণ।

কাঁকালে গোরা (কলসী) লিয়ে জলকে চল। মল্লভূম।

কড়ুই রাঁড়ী > কড়ে রাঁড়ী=বিয়ের অল্পদিন পরে বিধবা।

'কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।' ভারতচন্দ্র

কড়ে রাঁড়ী আবার শুভ কাজে আসবে কি? মল্লভূম।

কাতান—ছোট খড়্গ।

'কোন বা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতান
ভীম বেগে হানে নিত্য আপন গলায়। হেমচন্দ্র।

ছোরা না থাক কাতানটাই লিয়ে আয়। মল্লভূম।

কোদো, কদু—কদু ঘাঁটা। এক শ্রেণীর ধান্য।

'অশ্রদ্ধেয়ানি ধান্যানি কোদ্রবাঃ।' মহাভারত।

এই খরার বাজারে ছেলাপিলাদের কি খাঁওয়াব টুকদু কদুঘাঁটা ছাড়া কুছুই ত করবার নাই। মল্লভূম।

কাঁড়ান, কাড়ান—ধান রোয়া বা ধান রোপণ করা।

'আষাঢ়ের কাড়ান নামকে।' খনা।

আষাঢ়ে কাড়ান ই বছর ধান দেখতে হবেক নাই। মল্লভূম

কুলি—গ্রামমধ্যস্থ সরু রাস্তা।

'কুলি কুলি লইয়া বেড়াও।' কৃত্তিবাস।

'কুলি বেগে বান গড়াল ভিজল তুষুর বিছানা।' মল্লভূম।

খামার—শস্য সংরক্ষণের গৃহ।

'রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
ধান চাল সরিষাতে পূরিবে আগার॥' কবিকঙ্কণ।

খামারটা নিকিয়ে দাও বৌ, ধান ঝাড়বে। মল্লভূম।

খাপরা, খাপুরি—নরকপাল বা খর্পর আকৃতিবিশিষ্ট মাটির পাত্র।

'ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।' কবিকঙ্কণ।

খাপুরিতে চালকটা লেড়ে লাও। মল্লভূম।

গড়—পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম।

'শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।' কাশীদাসী মহাভারত।

গড় কর সবাই তোমার গুরুজন। মল্লভূম।

গড়্যা—অলস, কুঁড়ে।

'গড়িয়া বলদ হেন শুইয়া নিদ্রা যায়।' বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

ছাঁদা—বাঁধা, বেষ্টন করা। নিমন্ত্রণে ভোজনের পর ব্রাহ্মণকে দেয় খাদ্যবস্তু।

'মাসী পিসী সবে কাঁদে, গৌরীর গলায় ছাঁদে।' শিবায়ন।

'ছেঁদে ধরি গলা।' ভারতচন্দ্র।

বাঁধা-ছাঁদা করে বেরিয়ে পড়। মল্লভূম।

বামুন বটি, গলাতক খাব আবার ছাঁদাও লুব। মল্লভূম।

জাড়—শীতের জড়তা, আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা।

'সেনা মরে জাড়ে।' কৃত্তিবাস।

জাড়ে হাত-পাগুলান প্যাটে সেঁধাই গেল। মল্লভূম।

জুমড়া—পোড়া বা আধপোড়া কাঠ। তুলনীয় মৈথিলী 'ঝামরু' বা ব্রজবুলি 'ঝামর' শব্দ। অর্ধ-দগ্ধ।

'বিরহক আগুনি, জরি জরি গুণমণি।
ঝামর শ্যামর অঙ্গ।' বলরাম দাস।

জুমড়া কাঠ দিয়ে এ্যামন ধাঁসব না মুয়ে রা কাড়তে হবেক নাই। মল্লভূম।

টেনা, ট্যানা—ছেঁড়া কাপড়, ছিন্ন বস্ত্র।

'সাত গেঁটে টেনা।' কাশীরাম।

'শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা।' ভারতচন্দ্র।

এ্যামন কপাল পূজায় একটা টেনাও জুটল না। মল্লভূম।

ডাগর—বড়, শ্রেষ্ঠ।

'ডাঙ্গর পক্ষী যেন পর্বতের চূড়া।' মনসামঙ্গল।

'আম্মা হৈতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর।' ময়নামতীর গান।

বিটি ছেলা, ডাগর হৈছ একা ইদিক উদিক বুলো না। মল্লভূম।

গ্যাদার < দেদার—প্রচুর।

'প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।' রবীন্দ্রনাথ।

দেদার টাকা যত পার ফুটিয়ে যাও। মল্লভূম।

পুলি—নারিকেল প্রভৃতির পুর দেওয়া পিঠে। গ্রাম্য শব্দ—গুহ্যদেশ।

'জামাই পুলী, দুগ্ধপুলী, চন্দ্রপুলী আর।' বিজয় গুপ্ত।

পোষ-পরবের ছড়াছড়ি, পিঠে পুলির ছড়াছড়ি। মল্লভূম।

ভালা—দেখা।

'দশদিগ ভালিতে সহস্র আঁখি ধরে।' বৈষ্ণব পদ।

পথবাগে ভেলে চ। মল্লভূম।

মেয়্যা, মেয়া—ছোট মেয়ে, কন্যা, মহিলা, বিবাহিতা স্ত্রী।

'কাটোয়ার কাষ্ঠ ভাষা কণ্টকের ধার।
মেয়ে বলে বনিতারে ও-কারে আ-কার॥' দীনবন্ধু মিত্র,
সুরধুনী কাব্য।

তর‍্যা মেয়্যা-মরদে পুবে যাচ্ছুস্? বিষ্ণুপুর।

যমজুটক্যা, যমজাতক—যমজ।

'কুশল বৌ…যমজাতকৌ।' রামায়ণ।

ল-বৌয়ের জমজুটক্যা ছানা দুটার বাঁচা দায়। মল্লভূম।

হাঁকার—চিৎকার করে ডাকা।

'রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে।' কৃত্তিবাস।

'বাঘ হাঁকার দিল।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কি এ্যামন হৈছে এ্যাত হাঁকারচ্ছ ক্যানে? মল্লভূম।

হুড়কা—দরজার খিল।

'হুড়কা লাগিল যেন যমের দুয়ার।' মহাভারত।

রেতের বেলা হুড়কা দিয়ে শুবে। মল্লভূম।

মধ্যযুগ থেকে পুঁথির ভাষায় এবং বৃটিশ পর্বে পৌছে দেখা গেল লেখার ভাষার সংকট ক্রমশ মুখের ভাষা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমন একটি গোষ্ঠীর হাতে ছিল, যাঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা উর্দু, কিংবা বংশগতভাবে যাঁরা উর্দুকে বাংলার চেয়ে অভিজাত ও বনেদী ভাষা বলে মনে করতেন। কারণ বাংলা হচ্ছে পরাধীন জাতির ভাষা, চাষা-ভুষো, জোলা-নিকিরির ভাষা; আর তাঁরা নিজেরা হলেন মুঘল-পাঠান ইত্যাদিদের বংশধর। দূরের বা পরের দেশ শাসনের অভিলাষে তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের এদেশে আগমন। কাজেই উর্দু হল রাজার ভাষা, বাংলা প্রজার ভাষা। এই প্রসঙ্গেই দাবি উঠল কতকগুলি পৃথক ভাষা বা উপভাষা গঠনের। তার মূল কারণ ধর্মনির্ভর পৃথক ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক সীমানার সন্ধান।

---

১. বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। ষষ্ঠ সংস্করণ; পৃঃ—৩২-৩৩। —সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ও. ডি. বি. এল এ্যালেন এণ্ড আনউইন। সং ১৯৭০। পৃঃ—১৩০-৩৩।

তৃতীয় অধ্যায়

মল্লভূমের উপভাষা ঃ আঞ্চলিক ভাষা বৈশিষ্ট্য

কালভেদে ভাষা যেরূপ ভিন্নতা প্রাপ্ত হয় অঞ্চলভেদেও ভাষা সেরূপ স্বতন্ত্রতা পায়। সেই নিজত্ব বা বৈশিষ্ট্যগত স্বতন্ত্রতা দিয়েই বিভিন্ন উপভাষার অস্তিত্ব পরবর্তীকালে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং একই ভাষা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দল ও উপদল বিভাগ, বিভিন্ন প্রান্তের ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব প্রভৃতি কারণে একই ভাষা থেকে একাধিক উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলার উপভাষাগুলির সৃষ্টির পিছনেও এরূপ কারণ বর্তমান। তাছাড়া যে-সব ভাষা মোটামুটি বেশ কিছু সংখ্যক জনগণের ভাষা, যা একটি ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় সমৃদ্ধ অর্থাৎ যার স্ট্যাণ্ডার্ড সাহিত্যিক পরিচয় ও শব্দভাণ্ডারের আধিক্য আছে এবং ইদানিংকালে যে ভাষার যোগ্যতা সম্বন্ধে অন্তত কিছু চিন্তাশীল লোকের মনে আশা সৃষ্টি করছে ও চর্চার স্পৃহা বাড়িয়ে তুলছে, সেসব উপভাষাকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না। মল্লভূমী উপভাষা হল সেরকমই এক প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যপূর্ণ উপভাষা।

বাংলা উপভাষাগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে গ্রীয়ারসন উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি লম্ববৎ বিভাজক রেখা কল্পনা করেছিলেন।[১] তাঁর মতে বাংলা কথ্য ভাষার অনেকগুলি রূপ থাকলেও এদের পারস্পরিক পরিবর্তনের গতি এত সূক্ষ্ম যে কোন একটির আরম্ভ ও শেষকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। তাঁর বিভাজক রেখার এক পাশে 'পশ্চিমী' আর অন্য পাশে 'পূর্বী'। 'পশ্চিমী' শাখায় কলকাতা, হুগলীর সংলগ্ন পার্শ্বভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুরের মধ্যভাগ, উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী পূর্ণিয়া, রংপুরের মধ্যবর্তী ক্ষেত্র এবং সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের কিছু অংশের ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আলোচ্য অঞ্চল 'মল্লভূম। এ অঞ্চল গ্রীয়ারসনের বিভাজক রেখার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, এ অঞ্চলের ভাষা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ভাষার উপভাষা। সংক্ষেপে 'দক্ষিণ-পশ্চিমা-বাংলা'।

ভাষাচার্য স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশের প্রাচীন বিভাজন অনুসারে বাংলা উপভাষাগুলির চারটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন।[২] এগুলি যথাক্রমে 'রাঢ়' 'বরেন্দ্র' 'কামরূপী' ও 'বঙ্গ' উপভাষা। 'রাঢ়' উপভাষার পশ্চিম শাখায় পশ্চিম প্রত্যন্ত বাংলা, সাঁওতাল-পরগণা, পশ্চিম-বীরভূম, পশ্চিম-বর্ধমান ও বাঁকুড়া-মানভূম-সিংভূম ইত্যাদি। স্কুমার সেন অঞ্চলভেদে আধুনিক বাংলার পাঁচটি উপভাষার নামকরণ করেছেন: (১) রাঢ়ী (পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা), (২) বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা), (৩) বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা), (৪) কামরূপী (উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা), (৫) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা)।

এই অঞ্চলের উপভাষা প্রথম থেকেই অস্ট্রিক ভাষাঞ্চল ও অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল লালিত হয়েছে। এই উপভাষা জন্মকাল থেকেই আদিবাসী মানুষের ভাব ও ভাষাজীবন থেকে আপন প্রয়োজনীয় জলবাতাস আহরণ করেই পল্লবিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনার্য মানুষের বিশেষ উচ্চারণ ও বাক্‌ভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে আদি-মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার একটি বিশেষ রূপ ও আকৃতি গড়ে উঠেছে। এই বিশেষ রূপটিই হল এ অঞ্চলের প্রকৃত ও নিজস্ব পরিচয়। এ উপভাষা ঝাড়খণ্ডী[৩] ঘেঁষা বাংলা উপভাষা। এ ভাষায় এদেশের আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত, খেড়িয়া, শবর, সরাক ইত্যাদিদের মিশ্রিত ভাষারূপ পাওয়া যায়।

আমাদের হয়ত মনে হতে পারে অস্ট্রিক ভাষাঞ্চল কতটা? পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে বলা চলে যে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ থেকে মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার উত্তরভাগ পর্যন্ত অস্ট্রিক ভাষাঞ্চল। আর্য অভিযানের পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলভূমিতে অনার্য মানুষের এক সংহত উপনিবেশ স্থাপিত হয়ে আছে। এই ভাষাঞ্চল ও ভাষাভূমির প্রত্যক্ষ নৈকট্যে বাংলার 'ঝাড়খণ্ডী' উপভাষার ক্রমবিকাশ চলেছে। মল্লভূম অঞ্চলের বিশেষতঃ বাঁকুড়া অঞ্চলের ভাষাও উপরি-উক্ত ভাষাঞ্চলের সন্নিকটস্থ, কাজেই এই উপভাষার ধ্বনিতে, শব্দকোষে ও বাচনভঙ্গিতে অনার্য উপকরণ যথেষ্ট রয়েছে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে সাধুভাষার পূর্ণ অধিকার চলে এসেছে। তারপরই শিষ্টরাঢ়ীর (Standard Bengali) প্রভাব ও ভাষাজগতে তারই প্রাধান্য। এখন পর্যন্ত উপভাষাগুলির সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করা

ছাড়া বাংলার শব্দকোষ সংকলন ও বাক্‌রীতিগত পরিচয় প্রদান কিংবা কোন সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার চেষ্টা কিছু কিছু শুরু হলেও খুব বেশী উন্নত বা অগ্রসর হতে পারেনি। তাছাড়া এ অঞ্চলের উপভাষার আলোচনার পরিসরটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলখণ্ডে পরিব্যাপ্ত বলে সুধীজনের দ্বারা চর্চিত হবার বিশেষ সুযোগ লাভেও বঞ্চিত হয়েছে।

এরকম বহুবিধ অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধুনা শিক্ষিত সমাজের প্রচণ্ড উদাসীনতা ও উন্নাসিকতা। হয়ত সেকারণে এসব উপভাষাসমূহের বিপুল শব্দভাণ্ডার কোন বিশিষ্ট বাংলা শব্দকোষে বিশেষ স্থান লাভ করতে পারেনি। অথচ ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে এসব উপভাষারও বিচার-বিশ্লেষণের দিন এসেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের ইতিহাস জানবার জন্যেও এসব ভাষা বা শব্দ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, 'যদি বাংলা সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা হইলে গ্রাম্য শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সাধু বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার প্রভেদ কমাইতে হইবে এবং কথিত ভাষার অনেকাংশ লিখিত ভাষা করিয়া লইতে হইবে।' কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি অনুযায়ী 'তন্ন তন্ন করিয়া বাংলা উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ এখনও প্রস্তুত হয় নাই।' কাজেই এখানকার মানুষ ও ভাষা উভয়েই বাঙালি ও বাংলা পরিচয়ের বাইরে ব্রাত্যের মত বাস করছে। অথচ ভাবপ্রকাশ ক্ষমতায় এই উপভাষাগুলির শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ়। ভাব-জীবনের সর্বভূমির অনুভাবনাকে সার্থক অভিব্যঞ্জনায় তুলে ধরবার অসাধারণ ক্ষমতা এইসব উপভাষাগুলির রয়েছে। তাই এসব ভাষার সযত্ন চর্চা ও সশ্রদ্ধ অনুশীলন আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

বিস্তীর্ণ মল্লভূম এলাকার (বিশেষতঃ বাঁকুড়ার) উপভাষার দুটি বিশিষ্টরূপ। একটি উত্তর অঞ্চলের উপভাষা, অন্যটি দক্ষিণ অঞ্চলের উপভাষা। কাঁসাই ও কুমারী নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে এবং দামোদরের দক্ষিণ তীর পর্যন্ত এই উত্তর অঞ্চলের উপভাষা বা কথ্যভাষার স্বচ্ছন্দ অঞ্চলভূমি। মানভুঁইয়া ঝাড়খণ্ডীর উপভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আর দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীর থেকে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম, গিধনী, শিলদা, বেলপাহাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের কথ্যভাষা বা উপভাষার ক্ষেত্র। সাঁওতাল-মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর বিচরণভূমিও এই ক্ষেত্রটি। কাজেই অস্ট্রিক ভাষা-

সমূহের প্রভাব এ অঞ্চলে যথেষ্ট, তাছাড়া এই উপভাষার ক্রমবিকাশে প্রতিবেশী ওড়িয়া ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট। সম্প্রতি একদিকে কথ্য-শিষ্ট-রাঢ়ী ও অন্যদিকে হিন্দীর ক্রম-অগ্রসরমান চাপে ওড়িয়ার প্রভাবের কিছু হ্রাস ঘটছে।

প্রত্যেক জাতির একটি করে নিজস্ব ভাষা আছে। সেগুলি স্বাধীনভাবেই গঠিত। সাঁওতালী, মুণ্ডারি, ভূমিজ, কোড়া, হো, আসুরি এবং করওয়া একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; সাঁওতালী কিংবদন্তি অনুযায়ী এইসব উপজাতির একই উৎস এবং একসময় এদের সকলকেই খেরওয়ার বা খারওয়ার বলা হত।[৪] খেরওয়ার অর্থাৎ সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীগুলি যে অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করছে এবং পরবর্তীকালে যে-সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে সেসব অঞ্চল area of relative isolation-এর মধ্যে পড়ে। বাইরের জাতিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এদের ভাষা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়গুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আবার গঠন ও বিকাশের মূলে এইসব ভাষা বাইরের বিভিন্নজাতির সংমিশ্রণের প্রভাবপুষ্টও হয়ে পড়েছে।

এবার দেখি ব্যাকরণগত দিক দিয়ে এ অঞ্চলের ভাষা [যার চলতি নাম 'বাঁক্‌ড়ি ভাষা'] কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। 'ব্যাকরণ' শব্দটি সংস্কৃত। অর্থ—বিশ্লেষণ। ইংরেজিতে Grammar। Grammar কি? 'Grammar is the art of speaking and writing a language correctly'। এতে figure of speech থাকে তাই Grammar শব্দমাত্র। এ অঞ্চলের ভাষাও ধ্বনিবৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র। আগেই বলেছি অঞ্চলভেদে ভাষার রূপ ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। যেমন—(১) শৌরসেনী প্রাকৃত (২) পৈশাচী প্রাকৃত, (৩) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত (৪) **মাগধী প্রাকৃত > মাগধীঅপভ্রংশ > মাগধী অবহট্‌ঠ >** বাংলা।

বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বাঁকুড়া। আর বাঁকুড়াকে কেন্দ্রে রেখে মল্লভূম। তাই এ অঞ্চলের ভাষা ঝাড়খণ্ডী ঘেঁষা পশ্চিমাবাংলা উপভাষা। এ ভূখণ্ডের একপ্রান্তে প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা, অন্যপ্রান্তে আধুনিক বাংলা, মাঝখানে বহু শতাব্দীর ইতিহাস।

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চলের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত ভাষা ও শব্দসমূহের কারণ ও ব্যবহার কৌশল অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে-সব ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে তাতে নিম্নরূপ সূত্রে পৌঁছানো যায়। যেমন—

১. **ধ্বনিগত**

(ক) স্বরধ্বনির আগমন—সাধারণতঃ সর্বনাম পদের আদিতে 'ই' এবং 'উ'-

এর আগমন ঘটে। যথা—এরা > ইয়েরা ; ওরা > উয়ারা ; একে > ইয়েকে/ইয়াকে ; ওদের > উয়াদের।

(খ) সমাপিকা ক্রিয়াপদে প্রথম ধ্বনির পর একটি 'ই' এবং 'আ'-এর আগমন। যথা—গেছে > গ্যাছে > গেইছে > গেইচে ; খেলবি > খেলাবি ; খেলছে > খেলাচ্ছে।

(গ) স্বরধ্বনির পরিবর্তন—'অ'-কারের, 'আ' এবং 'ও' ধ্বনির প্রবণতা। যথা—অমাবস্যা > আমাবস্যা > আমাবোস্যে ; অসুখ > ওসুক।

(ঘ) 'আ', 'অ' সংখ্যাশব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে 'টা' নির্দেশক প্রত্যয়ের 'আ' স্থানে 'অ' হয়। যথা—লোকটা > লোকটঅ ; বাটিটা > বাটিটঅ > বাট্টঅ।

(ঙ) 'ঋ' স্থানে 'ই'—যথা—কৃষাণ > কিষাণ > কিষেণ ; তৃষ্ণা > তিষা > তিষে ; ঘৃণা > ঘিণা ; তৃণ > তিণ ; পৃথিবী > পিথিবী।

(চ) 'এ' স্থানে 'ই'—এদিক > ইদিক ; এখানে > ইখানে ; এগার > ইগার ; এভাবে > ইভাবে ; সেখানে > সিখানে।

(ছ) 'এ' স্থানে 'এ্যা' 'আ' (বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষাবৈশিষ্ট্য)—পেট > প্যাট ; তেল > ত্যাল ; ভেক > ভ্যাক ; কে > ক্যা ; দেখ > দ্যাখ ; ঝিঙে > ঝিঙা ; ফিঙে > ফিঙা ; ছেলে > ছেল্যা।

(জ) 'ঐ' স্থানে 'ও'—বৈঠকখানা > বোঠকখানা > বোটকখানা।

(ঝ) 'ও' স্থানে 'অ'—আলো > আল ; কালো > কাল ; কোল > কল ; গোটা > গটা ; ঘোড়া > ঘড়া ; ছোট > ছট ; জোড়া > জড়া ; মোড়ে > মড়ে ; টোকা > টকা ; ডোম > ডম ; ঢোলক > ঢলক ; তোলা>তলা ; খোঁপা>খঁপা ; থোপা>থপা ; দোলা>দলা ; ধোপা > ধপা ; নোড়া>নড়া ; ফোঁড়া>ফঁড়া ; পোড়া>পড়া ; বোতল>বতল ; গোঁদল>গঁদল ; ভোলা>ভলা ; রোলা>রলা ; লোক>লক ; বোবা>ববা ; সোম>সম ; হোলি>হলি।

(ঞ) 'ও' স্থানে 'উ'—বোন>বুন ; কোথা>কুথা ; তোমার > তুমার ; কোনো > কুনু ; বোতাম > বুতাম ; কোথায় > কুথায় ; জোয়ার > জুয়ার ; তোলা>তুলা।

(ট) 'ঔ' স্থানে 'উ'—অশৌচ>অশুচ>ওষুদ।

(ঠ) 'ঔ' স্থানে 'এ'—কৌটা > কেটো।

(ড) 'ঔ' স্থানে 'ও'—মৌমাছি> মোমাছি ; চৌরাস্তা > চোরাস্তা ; সৌষ্ঠব>সোষ্ঠব।

(ঢ) ধ্বনি সংকোচন—'আর' স্থানে 'এ'—মারলে > মেলে ; মারলি > মেলি ; মারলাম>মেলাম।

২. অপিনিহিতিগত

বৃদ্ধি=বাড়>বাইড় ; সন্ধ্যা=সাঁঝ>সঁইঝ ;

রাত্রি=রাত>রাইত ; পক্ষী=পাখী>পাইখ।

৩. অভিশ্রুতি ঘটলেও আঞ্চলিক উচ্চারণে সন্নিকটস্থ স্বরের সন্ধি হয় না।

যেমন—আঁইড়া>এঁড়ে=এঁড়্যা ; আঁইঠা>এঁঠে=এঁঠ্যা ;

মাইয়া>মেয়ে=মেয়্যা ; ছাইলা>ছেলে=ছেল্যা।

৪. অনুনাসিক ধ্বনির প্রাধান্য

কচি=কঁচি ; কূটজ (কুর্চি ফুল)=কুঁড়চি ; খোকা=খোঁকা বা খঁকা, বাসা=বাঁসা ; হাসি=হাঁসি ; ছায়া=ছাঁয়া ; চা=চাঁ ; ঘাস=ঘাঁস ; খেয়ে>খায়ে=খায়েঁ্য ; চেয়ে>চায়্যে=চায়েঁ্য ; দেখিয়ে=দেখাই=দ্যাখাঁই ; মেরে=মরাই=মরাঁই ; প্রয়োগ—আমাকে তু চিন্হস্ নাই মেরে একবারে মরাঁই দুব।

দেশী ও অজ্ঞাতমূলক শব্দে অনুনাসিকতা

যথা—বোবা>ককা>কঁকা ; ঘন>ঘেচ>ঘেঁচ/ঘেঁচু।

৫. মহাপ্রাণিত উচ্চারণের ঝোঁক

কুক্কুট>কুক্‌ড়া>খুক্‌ড়া ;	প্রয়োগ—	খুক্‌ড়াটা কঁককাইল নিশি হল্য ভোর।
কাঠি>খাটি>খাড়ি ;	„	অ ভাই, তুমার কাছে দ্যাশলাই খাড়ি আছে ?
কর্কশ>খস্‌খসে>খস্‌খস্যা ;	„	মেঝের সানটা বড্ড খস্‌খস্যা।
কন্দর>খন্দর>খঁদড় ;	„	খানা-খঁদড় ভাল্যে চল্।
কন্দ>খন্দ>খঁদ ;	„	রঁদ ভাঙ্গে খঁদ খাল্যে।
লইতাম>নিতাম>লিখম ;	„	হায়রে গাঁঠে নাইরে পয়সা তুষু লিখম দর কর‍্যে।
পুতুল>পথুল ;	„	রথের মেলায় পথুল কিনে দুব।

পেঁপে>পিঁফে>পিঁফা ; প্রয়োগ—পিঁফার দর চিরকালই (মার্গ) মার্‌গ।

৬. **'ল' এবং 'ন'-এর পারস্পরিক প্রতিস্থাপন।**

নাচ→লাচ ; লম্ফ→নম্ফ ; নাতি→লাতি ; নবান্ন→লবান্ন ; লঙ্কা→নঙ্কা ; লবাত→নবাত ; লম্বা→নম্বা ; ইত্যাদি।

৭. **'স' এবং 'শ' স্থানে 'ছ'-এর ব্যবহার**

সকড়ি>ছক্‌ড়ি ; সম্মুখ>ছামু ; সেচ>ছিঁচ্‌ ; শ্রাদ্ধ > শাদ্ধ > ছাদ্ধ ; শ্রী>শীরি>ছিরি ; শরবৎ>ছরবৎ।

৮. **'ড়'-এর স্থলে 'র'-এর প্রতিস্থাপন**

মড়া>মরা ; কড়াই>করাই ; চিংড়ি>চিংরি ; বঁড়শি>বঁরশি ; সাঁড়াশি> সাঁরাশি।

৯. **সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বরের হ্রস্বধ্বনি ও পরস্বরের অবলুপ্তি**

বিলম্ব>বিলম্‌ব>বিলম্‌ ; সতর্ক>সতর্‌ক>সতর ; নিলজ্জ>নির্‌লজ্জ> নিলজ / লিলজ ; প্রণাম>পণাম ; পেন্নাম>পেনাম্‌ ; স্বাদ>সাদ ; পশ্চিম> পচিম্‌ ; আশ্বিন>আশিন।

১০. **তাড়িত ধ্বনির মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিণতি**

চড়াই>চড়ুই>চটুই ; ভুঁড়ি>ভুঁটি ; বড়>বড্ড।

১১. **ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ**

তোৎলা>তোতা ; বামন>বাঅন ; সরিষা>সইষা ; সরষে>সইযে ; মুখ>মু ; লবঙ্গ>লং ; মাংস>মাস্‌ ; পয়সা>প-সা ; অবসর>অ-সর ; অগ্রহায়ণ>অঘ্রাণ>অঘান।

১২. **ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন**

আ-গুণ>অ-গুণ>অব্‌গুণ ; আছাড়>কাছাড়।

১৩. **শ্রুতিধ্বনি**

ই+একে=ইয়েকে ; ভাই+এর=ভায়ের>ভেয়ের ; ই+এর=ইয়ের।

১৪. **স্বরধ্বনির আগমন**

এরা>ইয়েরা / ইয়ারা ; ওদের>উয়াদের ; গেছে>গেইচে ; খেলবি> খেলাবি।

১৫. **স্বরধ্বনি লোপ**

হরিতকী>হর্তকী / হর্ত্তুকী ; তুই>তু।

১৬. **স্বরসঙ্গতি**

চালের>চেলের ; কাঁচের>কেচের ; শিয়াল>শিয়েল।

১৭. **স্বরভক্তি**

ভ্রূ>ভুরু ; গ্রাস>গেলাস / গ্যালাস ; ভাদ্র>ভাদর ; শ্রী>ছিরি ; শ্লিপ> শিলিপ ; ক্লিপ্>কিলিপ ; স্লিম>সিলিম।

১৮. **স্বরধ্বনির সংকোচন**

নাতিনী>নাত্নী>লাতিন্ ; দদ্রু>দাদ ; গামোছা>গাম্ছা ; আশা> আশ্।

১৯. **স্বরধ্বনি পরিবর্তন**

অমাবস্যা>আমাবস্যা>আমাবোসে ; অসুখ>ওসুক, ঘৃণা>ঘিণা ; পৃথিবী> পিথিবী ; তৃষ্ণা>তিষা>তিষে ; মেয়ে>মেয়্যা ; তেল>ত্যাল ; বোতাম> বুতাম ; কোথায়>কুথায় ; কৌটা>কেটো ; অশৌচ>অশুচ>ওষুদ।

২০. **'এ' ধ্বনির 'ই' ধ্বনিতে পরিবর্তন**

বেলা>বিলা ; সে>সি ; বেটা>বিটা ; এখান>ইখান।

২১. **'ও' ধ্বনির 'উ' ধ্বনিতে পরিবর্তন**

জোর>জুর ; লোভ>লুভ ; ষোল>ষূল ; বোল্‌বি>বুলবি ; তোর>তুর ; ওর>উর।

২২. **মহাপ্রাণহীনতা**

ধাই>দাই ; দুধ>দুদ্ ; মধু>মদু ; বুঝিল>বুজিল ; মধুবাবুর মোড়ে ব্যাটাট বেশ বুজিল (বিবেচনা / জ্ঞানসম্পন্ন) বটে।

২৩. **জোড়-কলম**

মেঘ্লা+আব্ছা=মেঘছা।

২৪. **অনুকার ও অনুগামী শব্দ**

ওমুক-ঢ্যাঁক ; ঘা-ফুট ; রাত-বিরেত।

২৫. **সমীভবন**

আশ্চর্য>আশচজ্জি ; নিশ্চিন্ত>লিশ্চিন্দ বা লিশ্চিন্দি ; চারটি>চাট্টি ; স্বর্গ> সগ্‌গ ; পাঁচসের>পাঁশ্‌সের।

২৬. **বিষমীভবন**

ছানা>ছেনা ; শিশি>শিশে ; লাল>নাল ; শরীর>শরীল ; ললাট> নলাট।

২৭. **মূর্ধণ্যীভবন**

দাঁড়ান>দাঁরান ; দণ্ড>ডণ্ড ; দাঁড়ি>ডাঁরি।

২৮. **তালব্যীকরণ**

মাদুর>মাজুর ; সেদ্ধ>সিদ্ধ ; সিদ্দ>সিজে।

২৯. **ঘোষীভবন**

আতপ>আতব ; শকুনি>শুগুনি ; শাক>শাগ ; কাক>কাগ>কেগো।

৩০. **অঘোষীভবন**

চর্বি→চর্পি ; ধোপা→ধোবা ; সুবিধা→সুবিদা।

৩১. **বর্ণবিচার**

কাক>কাগ , বক>বগ্ ; বীজ>বীচ ; অসুখ>ওসুক ; সুখ>সুক্ ; শঙ্খ>শাঁখ>শাঁক।

৩২. **বর্ণবিপর্যয়**

জ্যোৎস্না>জোত্‌সা>জোস্‌তা ; বাতাস>বাসাত।

শব্দরূপগত

১. **কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি**

রতনে রতন চিনে ভালুকে চিনে শাঁকআলু।

ঝিঙাফুলে লিলেক জাতি কুল হে।

২. **নিমিত্তার্থে বা উদ্দেশ্যার্থে 'কে' বিভক্তি৫**

জলকে যাব বলছ্য তুষু জলে তুমার ক্যা আছে?

শ্যামের বাঁশী যেই সিঁধাল-মন চলে যায় **বনকে**।

প্যাটকে (পেটের জন্য) লিয়ে এ্যাত লল্লাট।

৩. **কোন কোন স্থানে অনুসর্গস্থানীয় 'লে' বিভক্তি যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।**

মায়েরলে মাসীর দরদ।

বাঁশেরলে কঞ্চি দড়।

৪. **বিভক্তিহীন ষষ্ঠী ও সপ্তমীপদ**

'**উপর** কুলি, **নাময়** কুলি, মাঝখানেতে সরু গলি।'

'ভাল কর‍্যে চাঁয়্যে দ্যাখ **জলভিতর** কার ঘর আছে।'

৫. **আ-কারান্ত, ই / ঈ-কারান্ত, উ / ঊ-কারান্ত শব্দে অধিকরণে 'এ' বিভক্তির বিশ্লিষ্ট অবস্থান**

শিশুকালে **সিতা-এ** সিঁদুর। হাথ পাত্যে লাও গো পেসাদ, **ভুঁই-এ** পড়লে দোষ হবেক। **সাধু-এ** বুলছ্যে বটে ইবার তুমার ভাল হবেক।

৬. **কালাধিকরণে 'কে' বিভক্তি**

কবকে যাব উ গাঁয়ে। আজ **রাতকে** জল হবেক।

উ **মাসকে** গায়েন আসবে। **ইদিনকে** বুলবে বটে।

৭. **বহুবচনে গিলান, গুলা বিভক্তি**

লোকগুলা মোটেই সুবিদার লয়। **এ্যাতগিলান** টাকা শুদু শুদুই খরচ করলি ব।

৮. **অভিমুখ্যার্থক ও প্রতিমুখ্যার্থক অনুসর্গ 'বাগে'**

ও বিয়াই, **বাড়ীবাগে** গেইছিলে নাকি ?

ইবাগে ব্যাদম ভীড়।

৯. **নির্দেশক অর্থে 'ট' (গোট>গুট্ট)**

কথাট মন্দ বল নাই। **মাথাট** হঠাৎ ঘুরাঁই দিলেক। **গুট্টকতক** ট্যাকা দাও দিকিন।

১০. **শব্দভাণ্ডার**

এ অঞ্চলের উপভাষায় অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা পশ্চিমারাঢ়ী বা পশ্চিমাবাংলা উপভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব কম। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ এই উপভাষার প্রধান সম্পদ। উপবুক্ত দেশী শব্দেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী এই ভাষা। তাছাড়া কিছু বিদেশী, কিছু হিন্দী ও ওড়িয়া শব্দও এই উপভাষায় গৃহীত হয়েছে। তৎসম শব্দের ব্যবহার এতে কম, তার কারণ এ ভাষা মূলত নিরক্ষর ও আদিবাসী মানুষজনের নিত্যদিনের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা। দীর্ঘকাল যাবৎ শুধুমাত্র লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের (ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি) মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনজীবনের সাহিত্যচেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য যা পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই লৌকিক সাহিত্য—পুরাণাশ্রিত হলেও লোকজীবনের আদিম সারল্যে রঞ্জিত। উচ্চস্তরের কবিকুলের সৃষ্টিতে কিছু কিছু তৎসম শব্দের ব্যবহার থাকলেও, তা খুবই সীমিত। মোটকথা, এখানকার সংস্কৃতি যেমন স্মার্তব্রাহ্মণ্যবর্জিত, ভাষাও তেমনি তৎসমবর্জিত।

(ক) তদ্ভব শব্দ ঃ

শাবক→ছাবক→ছা, মহোৎসব→মচ্ছব, দেবআসিনী→দেওয়াসিনী→

দেয়াসী, ছায়ামণ্ডপ→ছামড়া→ছাতনা।

(খ) তৎসম শব্দ

সর্বত্রই এবং সহজ উচ্চারিত শব্দ। জল, ফল, আকাশ, সত্য, মিথ্যা, চন্দ্র (চাঁদ), সূর্য, পর্বত, ইত্যাদি।

(গ) অর্ধতৎসম শব্দ (বা ভগ্নতৎসম শব্দ)

কৃষ্ণ>কিষ্ট ;—উ পাড়াতে কিষ্টযাত্রা হচ্ছে।

গৃহিণী>গিন্নী ;—গিন্নীমা পেন্নাম হই গ।

বিষ্ণু>বিষ্টু ;—'বিষ্টুপুরে দেখে এলম দালানে ফুল ফুটেছ্যে।'

সূর্য>সূজ্জ / সূজ্জি ;—'উপরে সূজ্জির তাপ, তলে তাতা বালি,
ক্যামনে যাবেক বল আমার তুষুমণি।'

জ্যোৎস্না>জোস্‌তা ;—আঁধার রেতে ভাত রাঁধলম, জোস্‌তায় সাজি পান।

বৈষ্ণব>বোষ্টম ;—ও-মা, এ যে বোষ্টম ঠাকুর!

সন্ধ্যা>সাঁঝ/সাঁজ ;—সাঁজ বিলাতে জলকে গেলে আলা ধরে কালা।

মিথ্যা>মিছা ;—মিছা কথায় কাজ নাই বাছা, পরে পড়ব গুরুর শাঁপে।

দণ্ড>ডাং ;—ডাং মেরে মাথাট ফুলাই দিলেক।

স্তম্ভ>থাম্বা/থাম ;—থাম ধরে ক্যা দাঁড়াই আছে খ্যাখত ভেলে ভাল কর্য্যে।

স্থান>থান ;—ই-ট ঠাকুর থান বটে, মাথা নুয়াও।

গর্ত>গাড়া ;—রেতের বেলায় জামাই এসে গোবর গাড়ায় পড়েছ্যে।

তির্যক>টেরা ;—টেরা চখের চাউনি খ্যাখ।

কঞ্চিকা>কুঁচি ;—কুঁচিখাড়িগুলান তুলে রাখ।

ছিদ্র>ছিঁদ/বিঁদ ;—নাক বিঁদাইচ নাকখাড়ি কই?

সম্মুখ>ছামু ;—ছামুবাগে ভালবি, সোজা পথ চলবি।

পশ্চাৎ>পেছু ;—কুনুকাজে পেছু হটিস্‌ না।

মধ্য>মাঝ/মাজ ;—মাজখানে পড়্যে আমার হইছ্যে যত জ্বালা।

বায়ু>বাউ বাসাত ;—এখন তুমার ভরামাস বাউ-বাসাত লাগিও না।

(ঘ) দেশী শব্দ

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চলের ভাষা জন্মগতভাবে অনার্য ভাষাভিত্তিক বলে এখানকার দেশী শব্দগুলি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও একান্ত হয়ে এদেশের শব্দভাণ্ডারকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি, পরিপুষ্টও করেছে। কাজেই ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় এসব

শব্দ বাদ দিয়ে মার্জিত শব্দের প্রয়োগ করলে এ অঞ্চলের উপভাষার মৌল প্রকৃতিটি ক্ষুণ্ণ হয়। যদিও সম্প্রতি এ ভাষার একদিকে রাঢ়ী, বিহারী (হিন্দী), ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার শব্দের প্রভাবে দেশী শব্দগুলি দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে; তবুও প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষজনের কথ্যভাষায় প্রকৃত দেশী শব্দগুলি এখনও সমৃদ্ধ প্রয়োগে জীবন্ত রয়েছে। কতদিন থাকবে জানি না, কারণ দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সবকিছুরই বদল ঘটছে, মানুষও সভ্য হয়ে উঠছে; তাই ভাষারও রূপান্তর ঘটছে। ফলে, প্রকৃত দেশী শব্দগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। মল্লভূম এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমাকালে আমি যতগুলি শব্দ সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেগুলির সংগ্রহমানসে ও ব্যাকরণগত দিকনির্ণয়ে এসব শব্দাবলীর যথার্থ সংস্থাপনকল্পে এ গ্রন্থের অবতারণা।

আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনায় সাঁওতালী (খেরওয়ার) ভাষা বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এ অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত (বিশেষতঃ সাঁওতাল) অঞ্চল। সম্প্রতি ১৯৮১ সালের জনগণনার প্রাথমিক যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা গেছে বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যা ২৩,৭৪,২০৫ জন। জেলার মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল আদিবাসী সম্প্রদায়, যার মোট সংখ্যা হ'ল ২,৫০,২৩৫ জন (পুরুষ ১,২৫৪০৭ এবং স্ত্রীলোক ১,২৪,৮২৮ জন; এছাড়াও আছে বহু শিশু)। সেকারণে আদিবাসী বিশেষতঃ সাঁওতালী ভাষার অন্বেষণ খুব প্রয়োজন। সাঁওতালী ভাষার প্রধান যে-সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হ'ল—

(১) সাঁওতালী ভাষা স্বরবর্ণসমৃদ্ধ।
(২) স্বরবর্ণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।
(৩) স্বরবর্ণকে প্রয়োজনবোধে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করা যায়। শব্দার্থের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন হলে হ্রস্বস্বরটিকে দীর্ঘ করা যায়।
(৪) একাক্ষর শব্দের শেষে অন্ত্যবর্ণ না থাকলে স্বরবর্ণ হ্রস্ব হয়।
(৫) একাক্ষর শব্দের দীর্ঘস্বরের পরে যদি কোন বর্ণে শ্বাসাঘাত হয় তবে পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বর হয়ে যায়।
(৬) স্বরবর্ণের প্রতিটিতে একটি করে নাসিক্যরূপ রয়েছে।
(৭) সাঁওতালী ভাষায় সন্ধ্যাক্ষরের বাহুল্য দেখতে পাওয়া যায়। যথা—অই, অও, অউ, ইও, ইউ, ওঅ, ওই, উঅ, উই, অআই প্রভৃতি।
(৮) বাংলা, হিন্দী, ইত্যাদি ভাষাগুলির মত সাঁওতালী ভাষাতেও ৪টি কণ্ঠ্যবর্ণ,

৪টি তালব্যবর্ণ, ৪টি দন্ত্যবর্ণ, ৪টি ওষ্ঠ্যবর্ণ রয়েছে। প্রত্যেক বর্গে একটি করে নাসিক্যবর্ণ থাকলেও 'ঞ' নাসিক্যবর্ণটির প্রাধান্য বেশী।

(৯) এ ভাষায় কোন শব্দে পাশাপাশি দু'টি মহাপ্রাণবর্ণ থাকে না, পূর্ববর্ণটি মহাপ্রাণ হলে পরেরটি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। যেমন—ঝিক্ ঝিজিক···ইক্।

(১০) এ ভাষায় একটি 'য' এবং একটি 'র' আছে। তাছাড়া একটি মূর্ধাজাত 'র', একটি মূর্ধাজাত 'খ', একটি 'ড', একটি উঅ (w), একটি 'স' এবং একটি 'হ' রয়েছে।

(১১) এই ভাষায় ক, চ, ট, প এই চারটি অন্তঃস্থবর্ণ বিদ্যমান। এগুলি শ্বাসবায়ু টেনে নেওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারিত হয়। হঠাৎ উচ্চারিত হওয়ার রীতি এদের উচ্চারণে দেখা যায়। ইন্দো-চীন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এ রীতির কিছু প্রভাব আছে।

(১২) অন্তঃস্থবর্ণগুলির উচ্চারণে কিছুটা বাতাস নাক দিয়ে বের হয় বলে উচ্চারণে অনুনাসিক ধ্বনির প্রাধান্য থাকে, ফলে 'ক' 'ঙ'-এর মতো, 'চ' 'ঞ'-এর মতো, 'ট' 'ণ'এর মতো এবং 'প' 'ম'-এর মতো উচ্চারিত হয়।

(১৩) সাঁওতালী ভাষায় শব্দগঠনে প্রত্যয় উপসর্গ প্রভৃতির বহুল ব্যবহার রয়েছে, তাছাড়া শব্দের মধ্যে বর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়ার রীতিও দেখা যায়। যেমন—আল>আক'ল; অন্ত>অক'ন্ত, বেনাও>বেক'নাও। এখানে 'ক' বর্ণটি infix রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৪) সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝাতে 'প' বর্ণটিও infix রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মাঝি=গ্রামপ্রধান, মাপানঝি=বহু গ্রামের প্রধান।

(১৫) 'ন' বর্ণটিও infix রূপে প্রয়োগ করে। এই রীতিতে সংখ্যাসমষ্টি ও বিশেষ্য-পদের সৃষ্টি হয়। যথা—বার (দুই); বানার (উভয়)। পা (তিন); পানা (তিনটি একত্রে)। পোন (চার); পোনন (চারটি একত্রে)।

(১৬) বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ গঠনের মধ্যে 'ট' বর্ণটি infix; যেমন—নূম= নামরাখা; নূটুম=নাম। আহপ=আরম্ভ; আটহপ=আরম্ভ করা।

(১৭) সাঁওতালী ভাষাতে লিঙ্গ দুই প্রকার। একটি প্রাণীবাচক, অন্যটি অপ্রাণীবাচক। স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ বোঝাবার জন্য শব্দের পূর্বে স্ত্রীবাচক বা পুংবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যথা—আঁড়িয়া কুল=বাঘ; এঙ্গাকুল=বাঘিনী।

(১৮) কতকগুলি শব্দের শেষে 'আ' যোগ করে পুরুষ এবং 'ই' যোগ করে স্ত্রী বোঝানো হয়। যেমন—কোড়া=বালক ; কুড়ি=বালিকা। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদের মতে এই রীতি আর্যগোষ্ঠীর দান।

(১৯) সাঁওতালী ভাষায় বচন তিন প্রকার ; একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। শব্দের শেষে 'কিন' এবং 'কো' প্রত্যয় যুক্ত করে বচন পরিবর্তন করা হয়। যেমন—

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
হড়্	হড়কিন	হড়কো
(মানুষ)	(দু'জন মানুষ)	(মানুষগুলি)
হপন্	হপনকিন	হপনকো
(পুত্র)	(দুটি পুত্র)	(পুত্ররা)।

(২০) অন্যান্য ভাষার মতো সাঁওতালী ভাষায় বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে পদগুলির সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ এই ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কারক (case) বলে কিছু নেই বললেই চলে।

(২১) অনুসর্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরসর্গের ব্যবহার দ্বারা local এবং casual relations-কে বোঝানো হয়। যেমন—ট=তে, মধ্যে, ভিতরে। রা= মধ্যে, ভিতরে। লগিট / লগট=জন্য। খান / খাচ=হইতে। থান / থাচ=নিকটে।

(২২) 'রান' শব্দ যোগ করে সম্বন্ধ বোঝানো হয়। এক ধরণের definite article হিসাবে শব্দের শেষে 'টট' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ভাববাচক বিশেষ্য বোঝাতে ঐ প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন—দারে টট=গাছটি ; পিনড়া টট=বারান্দাটি ; কাড়াটট=মহিষটি ; আবার 'রান' শব্দ যোগে বাবুরান=সন্তানদের ; মৌরিচ্‌রান=লঙ্কার।

(২৩) লিঙ্গ, বচন এবং কারকের ক্ষেত্রে বিশেষণের তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন—পাঁচুরান হপনকিন অর্থাৎ পাঁচুর দুই ছেলে। গুরুরান চেলা=গুরুর শিষ্য।

(২৪) ণিজন্ত, পারম্পরিক ক্রিয়া এবং শব্দ বা ক্রিয়ার দ্বিত্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। ণিজন্তরূপ সাধারণ ক্রিয়ার এবং দ্বিত্বরূপে ব্যবহৃত ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রচলিত। দ্বিত্বরূপের ক্রিয়ার উপর যে-সব ণিজন্তরূপের সৃষ্টি হয়

সেখানে 'অকো' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—'দাল অকো' এবং

মূল	কর্মবাচ্য	পরোক্ষক মধ্যবর্তী	ণিজন্ত	পারস্পরিক
দাল	দাল অকো	দাল জান	দাল অকো	দাপাল
(আঘাত করা)	(কাউকে আঘাত করা ; বা, আঘাত পাওয়া	(কারো জন্য আঘাত করা)	(কাউকে আঘাত করতে দেওয়া)	(পরস্পরকে মারা)
দাল দাল	দাল দাল অকো	×	দাল অকো কো	দাপাদাপি
(খুব আঘাত করা)	(কাউকে খুব আঘাত করা)	×	(কাউকে খুব আঘাত করতে দেওয়া)	(পরস্পরকে খুব মারা

(২৫) সাঁওতালী ভাষায় voice বা বাচ্য চার প্রকার ; কর্তবাচ্য, কর্মবাচ্য, ছাড়া মধ্যবর্তী-বাচ্য ও পরোক্ষ মধ্যবর্তী-বাচ্য।

(২৬) সাঁওতালী ভাষায় ব্যক্তিবাচক, নির্দেশক, প্রশ্নবাচক এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম পদ আছে। প্রথম পুরুষ বোঝাবার জন্য যে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ দেখা যায় তার দ্বিবচন এবং বহুবচনে দু'টি করে রূপ হয়। একটি inclusive, অন্যটি exclusive। যেমন—

আমি / 'ইঞদঞ'		
একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ইঞদঞ/ইন	আলাঞ্/আলান	আবেঞ, আলাঞ আবো, আলা।

(২৭) সাঁওতালী ভাষায় ক্রিয়ার কাল সাত প্রকার। বর্তমান, সাধারণ অতীত, পুরাঘটিত অতীত, সুদূর অতীত, সংরক্ষিত অতীত, ভবিষ্যৎ, এবং সংরক্ষিত ভবিষ্যৎ কাল (reservative future tense)।

আবন = করা

	মুখ্যকর্ম	গৌণকর্ম	কর্মবাচ্য	পরোক্ষ মধ্যবর্তী	
১ বর্তমান	আবন-এট				
২ সাধারণ অতীত	আবন-কেট	আবন-এট	আবন-এন	আবন-অন	
৩ পুরাঘটিত অতীত	আবন-অকট	আবন-অকাবট	আবন-অকন	আবন-অকাবন	
৪ সুদূর অতীত	আবন-লেট আবন-লক		আবন-লেন		
৫ সংরক্ষিত অতীত	আবন-কট		আবন-কন	আবন-কেন	
৬ ভবিষ্যৎ	আবন	আবন-অ	আবন-অকো	আবন-জান	
৭ সংরক্ষিত ভবিষ্যৎ	আবন-কা		আবন-কোক	আবন-কোক	

(২৮) এ ভাষায় নির্দেশক সর্বনাম পদের বাহুল্য অত্যধিক। প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক শব্দ বোঝাবার জন্য রূপের পরিবর্তন ঘটে। সামান্য দূরবর্তী, নিকটতর, নিকটতম অনুসারেও রূপবিবর্তন হয়। যেমন—

অঞেদঞ, ইঞেদঞ / অন, ইন শব্দ

	কিছু দূরবর্ত্তী	নিকটতর	নিকটতম
একবচন	প্রাণী-অপ্রাণী= হিনি-হিনা=	প্রাণী-অপ্রাণী= ইনি-ইনা=	প্রাণী-অপ্রাণী নি-নিআ
দ্বিবচন	হিনকিন-হিনাকিন	ইনিকিন-ইনাকিন	নি-কি-নিআ-কি
বহুবচন	হেনকো-হিনা কো	ইনিকে-ইনাকো	নি-কো-নিআ-কো

প্রয়োগ—নিকটবর্তী যে বস্তু দেখা যায়—অনা; দূরবর্তী যে বস্তু দেখা যায়—হনা।

(২৯) কিছু সাঁওতালী শব্দের উদাহরণ, যে-সব শব্দগুলি আমরা বাংলা ভাষাতেও সরাসরি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রহণ করেছি। সংগৃহীত শব্দগুলিকে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণে ভাগ করে দেখানো হ'ল।

(১) বিশেষ্য পদ

(ক) মানুষ ও আত্মীয়স্বজন

সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ

বাবা—বাবা

আপা—পিতা

বাবু—সন্তান/ছেলে

আয়ো—মা

মামা—মামা

মৌমি—মামী

কাকা—মেসো (ছোট)

চাচা—কাকা

দাদা—বড় ভাই

রৌনডি→রাঁড়ি→বিধবা

ছৌডবি→ছিনরি→স্বামীবিচ্ছিন্না

ভৌয়াদি→ভায়াদি→এক বংশোদ্ভুত ভাই

ফুল—বন্ধু

গুরু—গুরু

চেলা—শিষ্য

দারাহারা—পরিবার, দার

জুরী—সখী

(খ) মানবদেহ, মন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ

সির্—শিরা

থো—থুতু

জাঙ্ঘা তাল্কা—পায়ের চেটো

চেটো—পায়ের তলা, বা পায়ের ডিম

জাঙ্ঘা—পা, জানু

পিলা—প্লীহা, পিলা

পাঁজরা—পঞ্জর, পাঁজরা

নুনু—স্তন (গ্রাম্য শব্দে শিশুর পুংলিঙ্গ)

আলাঙ—জিভ (আল্জিভ)

লুতুর—কান

মন্—মন

হুদিস্—চিন্তা

মায়া—মমতা, স্নেহ

দুক্—দুঃখ

বতর—ভয়

লাজাও—লজ্জা

আস—আশা

আসিরবাদ (ভর)—আশীর্বাদ

ভরসা—আস্থা

দিল্—সাহস, হৃদয়

হিস্কা—ঈর্ষা

জুবীন—যৌবন

জিয়ন—জীবন

গরি—মুশকিল

(গ) গৃহ-সম্বন্ধীয়

সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ

ওড়া, অড়া—বাড়ি

দালান্—দালান, পাকাবাড়ি

কুড়িয়া—কুঁড়ে ঘর

গাড়→গড়—দুর্গ

গাড়—গর্ত

মেলা—চাল, বৈঠকখানা

পিন্ডা—পিঁড়ে, বারান্দা

পাঁচ্রি—প্রাচীর,পাঁচিল।

কাঁত্—দেওয়াল

খারায়—খামার

কুল্হি—গ্রামের/গলির রাস্তা

ডি, ডিহি—পাড়া/পল্লী

ডাহার—উঁচু রাস্তা

সিড়হি—সিঁড়ি

খুন্টি—খুঁটি

পীড়—পাড়

হুরকীড়—হুড়কো, খিল

ছামে ডাঃ→ছামড়া→ছাডনা

—(বিবাহ আসরের ছাদন)

বাদরে—বাইদ জমি

(ঘ) খাদ্য, পানীয় ও শস্য

সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ

চাউলে, চাওলে—চাউল, চাল

মাড়া—মণ্ড, মাড় (ভাতের ফেন)

খাঁই—খৈ

বুট—ছোলা

রাসে→রস—ঝোল

সৌতু→সাতু—ছাতু

জাও সৌতু—যবের ছাতু

বুিট সৌতু—ছোলার ছাতু

পেঠৌ—পিঠা

লাড়ু-মিঠাই—মিষ্টান্ন নাড়ু, মিঠাই

ভজ্—ভোজ

হাঁনডি, হাণ্ডি—হাঁড়িয়া, মদ

মৌরিচ→মরিচ—লংকা

পেঁয়াজ—পেঁয়াজ

রৌসুন—রসুন

আদ্হে—আদা

জিরৌ—জিরা

ধান্য়া→ধনিয়া—ধনে

দারোচিনি—দারুচিনি

বাসিয়াম—পান্তাভাত

(বাসি+আম=ভাত)

ফসল—শস্য

গুহুম্→গোধুম—গম

বাজ্ড়া—বাজরা

টিসি—তিসি

দাল—ডাল

মুম্—মুগ

রাহেড়—অড়হর

শাক—শব্জী

আলু—আলু

মুলা—মূলা

কাল্লা→কারলা—করলা

রামঝিঙা—ঢ্যাড়শ

(ঙ) পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, মাছ

সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ

কাড়া—মহিষ, মোষ
সাঁনড—ষাঁড়
গাঁই—গাই
ম্যারম—ছাগল
ভেডা—ভেড়া
গাদহা—গাধা
সুকরি—শূকর
পুসি—বিড়াল
খিকড়ি—খেঁকশিয়াল
বিজি—বেজি, নেউল
তোড়—কাঠবিড়ালি
খুরী—খুর
কোল→কোয়ল—কোকিল
চিত্‌রি—তিতির
পারবা—পায়রা
গিদি—গৃধ্র, শকুন
সুঁগাপুকী—শুঁয়াপোকা
পুকী—পোকা
রঁ—মাছি
সুঙ্‌গৌ—শুঁড়/হুল
ঘুঘ্‌রি→ঝিঝরি—ঝিঁ ঝিঁ পোকা
জঁক—জোঁক
ঝিনুক—ঝিনুক
মিরগী→মিরগেল—মৃগেল
কাত্‌লা—কাত্‌লা
রহি—রুই
ইলসী—ইলিশ
পুটি—পুঁটি
সোল্—শোল
মণ্ডিগ্‌ড়ি—মাগুর
গাঁড়াই—গড়াই মাছ
(গাঁড়ী—গড়ে / ছোট পুকুর)

(চ) সাংসারিক আসবাবপত্র ও পোশাকাদি

চুল্‌হী→চুলো—উনুন
থারি—থালা
বাটি—বাটি
জামবাটি—জামবাটি, বড়বাটি
থালাক্—থালা (পাতার বাটি)
ডালি—ডালি, ডালা
ধামা—ধামা
হুন—আড়ি
কাঠা—কাঠা, কুনকে
পিটারি—প্যাটরা, মোট
চৌউকি—চৌকি, তক্তপোশ
মেচ্, মোচি—কেদারা
মাচিঞ—উঁচু আসন/মেচা
কুলুপ—তালা
বিন্‌ঠি—বঁটি
বরলম্→বল্লম, বর্শা
টাঙ্‌গা—কুড়াল, টাঙ্গি
কোপচি—কাঁচি
সুইচ্—ছুঁচ
গদা—মুগুর
মাল—জিনিস
অঙ্গারিয়া→অঙ্গার→আগুন বা কয়লা
পুড়িয়া—পোটলা

ধুতি—ধুতি
পিছাঁউডি—পিরান, চাদর
গামছা—গামোছা, গামছা
ছাতাঁর/চাতম—ছত্রম, ছাতা
হাঁসলি—হাঁসুলি
বৌজু-বাজু
মালা—হার, মালা
বেশোয়ার—মেয়েদের বক্ষাবরণ
(ব্লাউজ)
সিঁদুর—সিন্দুর
সোনারি, সনা—স্বর্ণ, সোনা
রূপাজ—রূপা

(ছ) প্রাকৃতিক বস্তু
সাঁওতালী শব্দ—বাংলা শব্দ
ধেরৃতি—পৃথিবী
হুডুর, বিজলি—বিদ্যুৎ
কুড়হাঁ—কুয়াশা
ঝারণা—ঝর্ণা
গাঁড়িয়াঁ→গড়ে—ডোবা
পুখরি→পুখুর—পুকুর
সৌমুদ→সমুদ্র—মহাসাগর
দৌরয়াঁউ—দরিয়া, সাগর
দিগ্‌হি—দিঘি
ঢেও—ঢেউ
ফত—ফেনা
ভাপ্—বাষ্প, ভাপ্
ধুঁবাঁ—ধোঁয়া
রাতাং, সিসির—শিশিরবিন্দু, শিশির
খেত্—নীচু জমি

পোডা, পোড়া—পতিত জমি
সিমাঁ—সীমা, সীমানা
সুঁড়্যা—বন্যা
বাঁদ—বাঁধ
চাঁদো—চাঁদ
সেতাঃ—সকাল
কিয়া—কেয়া (ফুলবিশেষ)
চম্পা—চাঁপা („ „)
বাহা—ফুল
পরব—পর্ব, পরব, উৎসব
নাই—নদী
জবা—জবা (ফুলবিশেষ)

(জ) অন্যান্য
সাঁওতালী—বাংলা
রাস্কা—আনন্দ
সুক—সুখ
কঁয়ে→কয়ে→কহে—উত্তর
তেতাং→তৃষ্ণা—তিসা
ঢল—ঢোল
সাডেকান—সাড়া-শব্দ
গাঁজন—গঞ্জন, গঞ্জনা
কুল্‌হু—কলু (জাতিবিশেষ)
ঘানি—ঘানি
যুগি—ফেরিওয়ালা
যুগরে—যুগে
লাড়হাই—লড়াই, সংঘর্ষ
কাথা—কথা
অল—লিপি (আলিম্পন)
রাস—সাহস

সাঁওতে—সঙ্গে
আগাড়—অগোছালো, ছড়ানো
স্লুক—সহযোগিতা
আগুিল—ধন ; আগুেলা—ধনীলোক
রোথঃ—রথ
সিপাই—শান্তিরক্ষক
বন্দি—বন্দী

(২) বিশেষণ
সাঁওতালী—বাংলা
মোট—মোটা
মঞ্জ—মঞ্জু—সুন্দর
ওসার—চওড়া
খাট—খাটো, ছোট
ভোত্ড়ো—ভোঁতা
সৌজ্হে—সোজা
কালা—কালা (বধির) পুং
কালি—(বধির স্ত্রী) কালা
লেল্হা→লেলা—বোকা
হামাল—ভারী
ঘেঁচ—ঘন
লল→লেলিহান—গরম
টাট্কা—তাজা, টাট্কা
পচ্রা—খারাপ, নিষিদ্ধ, কাপুরুষ
আঠাল—আঠালো, আঠাযুক্ত
নাচার—অসহায়
মাইলা—ময়লা
ওদা→অদা—ভিজা
রহড়—শুষ্ক
খাটোয়া→খাটিয়ে—পরিশ্রমী

লাংটা—ল্যাংটা, উলঙ্গ
বেটর—কুৎসিত
পায়েমায়ে—নিরীহ
চিঁকৌড়→চিক্কণ—মসৃণ
খারা→খর—নোনা
সাদা—সাদা রং
রাজ→রাপাজ—রাজকীয়
জড়তে—জোড়া (একসঙ্গে দুটি)
উটুপুটু—আটুপাটু—চাঞ্চল্য
নাওয়া—নূতন
সঁধাড়—সুগন্ধ
লিকয়-লকয়—দোদুল্যমান
লিকিৎ-লিকিৎ—হেলে দুলে
আলা→এলানো—শিথিল
গুব্লা-গুব্লি→গুম্রানো—অস্থির
পাছে—পিছনে

(৩) ক্রিয়া-বিশেষণ
সাঁওতালী—বাংলা
হাঁকপাঁক—তাড়াতাড়ি, শীঘ্র
হারেফারে—উদ্বেগসহকারে
বেজায়—অত্যধিক
একেন—একমাত্র, মাত্র
আচ্কা—হঠাৎ
ভিত্রি—ভিতর
বাইরে—বাইরে, বাহিরে,
আড়ে—ধারে, পাশে
বেড়হায়—চতুর্দিকে
গোটা বেড়হায়—সমস্তদিকে
বছর দিন—সারাবছর

পৌহিল→পহেলা—প্রথম
এক্‌কাল্‌→এককালে—একেবারে
উম্‌—স্নান করা
দৗড়—দৌড়ান
আও—আনো (নিয়ে এসো)
খরচ্‌—খরচা করা, ব্যয় করা
বাসাঙ্‌—ফুটানো জল
জতন→যত্‌ন—যত্ন করা
চাখা—স্বাদগ্রহণ করা (taste)
সালহা→সলা—পরামর্শ করা
হুদিন—চিন্তা করা
থাপা—থাপ্পড় মারা, চড় মারা
লাড়াও—নড়ানো
থির্‌—স্থির, থামা, শান্ত হওয়া
থুকুম—একবারে থামা
মুচৌৎ—মোচন করা, শেষ করা
নাই খিলি—না খাওয়া
ছাপ্‌রা—ছাপিয়ে যাওয়া
সির্জা ও হচ্‌—সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি করা
হারা ও—হেরে যাওয়া
হারে-ফারে—এদিক-ওদিক/ তাড়াতাড়ি
ডুবুজ গুজু—ডুবে মরা
ইড়িজ→ইজ্‌রিয়ে দেওয়া—নিভিয়ে দেওয়া
সেবায় লাগিৎ—সেবায় লাগে
সাঁওয়ার—পরিষ্কার করা

বাঁকুড়ার শুশুনিয়া-বিহারীনাথ পাহাড়তলী ও দক্ষিণ বাঁকুড়ার কিছু অঞ্চল পরিভ্রমণকালে আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ ঘটেছিল। সেই সুবাদে তাদের কাছ থেকে ভাষা-শব্দ সংগ্রহ করা যেমন সহজ হয়েছে সেরকম তাদের জীবনকথা বা মর্মবাণীও কিছু কিছু শুনেছি। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছে সাঁওতালদের বারো মাসের তেরো পার্বণ ও বিভিন্ন রকম লৌকিক আচরণের সঙ্গে বৈদিক ধ্যান-ধারণার যথেষ্ট মিল রয়েছে। বেশ কিছু অস্ট্রিক শব্দের সঙ্গে আর্যমূল শব্দেরও মিল রয়েছে। কে কার থেকে নিয়েছে ধরা মুশকিল। তবে আর্যদের মূল ভাষায় অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় শাখায় এসব ভাষার অস্তিত্ব ছিল কিনা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারলে তা নির্বাচন করা সম্ভব হতে পারে। মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে সংস্কৃত ভাষাতেই শতকরা তিরিশটির মতো শব্দ অনার্যগোষ্ঠী থেকে নেওয়া। পরবর্তী ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় এসব তথ্যের স্বরূপ নির্ধারণ করার ইচ্ছা রইল।

অনার্যভাষা থেকে আগত দেশী শব্দের কয়েকটি উদাহরণ

গড়া=গোয়াল (কোল শব্দ)। সাঁওতালী ভাষায়—গড়া আবেগে।

চোঙ্গী=গোয়াল পূজা (কোল শব্দ)। সাঁওতালী ভাষাতে 'গড়া' শব্দের

আর একটি অর্থ ক্ষুদ্র জলাশয় বা ছোট পুকুর। আমাদের দেশী ভাষাতেও ছোট তলাশয়কে গড় / গোড়্যা বলে থাকি। যেমন—খপ কর্‌্যে গোড়্যাটায় একট ডুব দিয়েঁ্য আর। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ছোট পুকুরটায় একটি ডুব দিয়ে আয়। আবার 'অলস' বা 'কুঁড়ে' অর্থে 'গোড়্যা' শব্দ ব্যবহার করি।—কি গোড়্যা লোক রে বাবা! অর্থাৎ, কি কুঁড়ে লোক।

'ল্যাদা' একটি প্রচলিত শব্দ। অর্থ বোকা / অলস, শব্দটি কোলগোষ্ঠীর। আবার মুণ্ডারী ভাষায় অলস অর্থে 'লাঁদিয়া' শব্দটি প্রয়োগ করে। ওরাঁও শব্দে (দ্রাবিড়) ল্যাদা = অলস। আমরা বাঁকুড়াবাসীরা বলি—আচ্ছা ল্যাদা ছেল্যা বটে যা হোক। অর্থাৎ, বেশ বোকা ছেলে।

'পাগ / পাক' শব্দটি কুরুখ শব্দ। অনেকের ধারণা সংস্কৃত প্র-গ্রহ শব্দ থেকে এর উদ্ভব। এ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই দেখেছি শব্দটি বেশ প্রচারিত, যেমন—মোটা দড়ি = পাগাদড়ি। নামধাতু পাক্ > পাকানা / পাগানো, ব্যবহার —আজকাল খুব ধর-পাকড় / পাগড় চলছে। অর্থাৎ আজকাল খুব ধরা ও মোটাদড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলছে।

'মাল' = উঁচু জায়গা। শব্দটি দ্রাবিড়। এ অঞ্চলে 'মাল' শব্দ যোগে বহু গ্রামনাম আছে, যেমন—মালপাহাড়ি, ব্যবহার—মাল জমি, ফসল ত ভাল হবেক নাই।

'গজাল' = পেরেক / লৌহ শলাকা। কোল শব্দ। সাঁওতালী ভাষায় 'গর্জ' অর্থাৎ সংযোগকারী বস্তু। এ থেকেই গুঁজা বা গুঁজে দেওয়া শব্দের উৎপত্তি। তাছাড়া সূক্ষ্ম ভাষায় 'গজ' = অঙ্কুর।

'চাঁদনী রাত' বা জ্যোৎস্না রাতকে অনেকে বলে 'জনারাত'। হয়ত জ্যোৎস্না > জোছ্‌না > জনা। একটি পোকার নাম 'জোনাকী পোকা', এ অঞ্চলে বলে 'জনাপোকা' বা 'জনাপকা'। [যে পোকা চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ আলো দেয়।] অর্থাৎ জ্যোৎস্নার মতো পোকা, বা জোৎস্নার আলোর মতো আলো দেয় যে পোকা। হিন্দী ব্যাকরণে জোনা-কী-পোকা—জোনাকী। এ অঞ্চলে বলে জোনার (জ্যোৎস্নার) পোকা—জোনাপোকা। ঠিক এরকম জনারাত, বা জস্‌তারাত।

'সিটা' শব্দটি প্রায় লুপ্ত। তবুও দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে (বিশেষতঃ মেদিনীপুর ঘেঁষা অঞ্চলগুলোতে) কিছু কিছু লোক এ শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থ 'টক'। যেমন—আমটা বড্ড সিটা। শব্দটি প্রাচীন।

এ অঞ্চলের কথার টানে বা উচ্চারণরীতিতে 'গো'>গা হয়ে যায়। যেমন—হ্যাঁ-গা, তুমি কাদের মেয়্যা। শব্দটি প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় থেকে আগত বলে মনে হয়। **Revd. Ferd. Hahn** তাঁর **Kurukh Grammar** গ্রন্থে বলেছেন, **'Go—dear, used among relatives'**. আমরাও ঐ একই অর্থে 'গা' শব্দটি ব্যবহার করি। আসলে মল্লভূমী ভাষাঞ্চলের প্রধান উচ্চারণরীতিই হ'ল 'আ' বা 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত।

আঞ্চলিক শব্দে বিদেশী প্রভাব

বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজারের মতো ফারসী-আরবী-তুর্কী প্রভৃতি মূল শব্দ আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। উপভাষা ভেদে এই শব্দগুলির মান ও পরিমাণ ভিন্নতর। যেমন,—পশ্চিম ও পূর্বী বাংলায় মুসলমান শাসন ও মুসলমানী উপনিবেশ স্থানীয় উপভাষায় যে পরিমাণ আরবী ও ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষায় সেই তুলনায় ঐসব ভাষার ব্যবহার অনেক কম। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রথমদিকে এখানকার সরকারী কাগজপত্রের মাধ্যম ছিল বাংলা নয়, ফারসী। ফলে, আমাদের আলোচ্য পরিমণ্ডলের উপভাষায় আরবী, ফারসী শব্দ যে ঢুকেছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারপর ভূমিজ-বিদ্রোহ বা চোয়াড়-বিদ্রোহ (১৮৩৩-৩৪) হওয়ার পর জয়েন্ট কমিশনার ডেন্ট সাহেব এই অঞ্চলের যাবতীয় রাজকর্মে ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ব্যবহারের সুপারিশ করেন। পরবর্তী দলিল-পত্রাদি বাংলায় লিখিত হলেও তাতে বহু ফারসী শব্দের প্রয়োগ অব্যাহত ছিল। তাছাড়া হিন্দী-ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাসমূহের মধ্য দিয়েও কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দ আমাদের আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষায় পরিগৃহীত হয়েছে। ভাদু-তুসু-ঝুমুর-বাউল ইতাদি গানের মধ্যেও তার পরিচয় মেলে।

(অ) ফারসী ও আরবী শব্দ

ফারসী শব্দ : কবজ / কব্‌জে =(দমিয়ে রাখা)—'দলমাদল বেটা তুমার কবজে রাখ সাবধানে।'

কমর =(জোর/শক্ত)—কমর বাঁধ্যে লাগ বিয়ান, ই-যে তুমার লাতির বিয়া।

কারবারী =(ভাল-মন্দ বিচার)—'তুষু আমার মোড়ে ছেলা জানে না কারবারী।'

কুলুপ=(বন্ধ করা)—মু'য়ে ইবার কুলুপ আঁট ভাসুর আসছ্যেন ঘরবাগে।
গুণাকার=(অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড/শাস্তি)—মারকে মার আবার চৌদ্দসিকা গুণাকার।
ছরকট=(বিশৃঙ্খল)—তুমার সব কাজেতেই ছরকট্।
জবান=(কথা)—'মিছা তুমার ভালবাসা, মিছা তুমার জবান গ।'
জাঁহাবাজ=(দুর্দান্ত)—এ্যামন্ জাঁহাবাজ মেয়্যা বাপের জম্মে দেখি নাই।
জিগির=(জিজ্ঞাসা)—উয়াকেই জিগির করে্য দ্যাখ উ-ক্যা বটে।
মর্দ্দ>মরদ=(পুরুষ)—মরদ মানুষের আবার নজ্জা কিসের ?
মাইন্দার=(মাইনা+দার)>মান্দার=(শ্রমিক)—মুনিস-মান্দার লিয়েই আমাদের কাজ।
মাদী>মর্দ্দ+ঈন=মাদীন (স্ত্রী পশু)—মাদী ছাগলটা গেল কুথা ?
মিশি—(নানা বস্তু মিশ্রিত দন্তমঞ্জন)—মিশি দাও সারা নিশি, আর কি কুনো কাজ নাই।
রেজকী / রেজগী=(খুচরা পয়সা)—টাকাটা দাও রেজকী করে আনছি।
শরম=(লজ্জা)—এ্যাতগুলান লোকের ছামুতে পীরিতির কথা পাড়লি তুর এ্যাকটু শরম নাই।
সয়দা/সওদা=(খরিদ করা, ক্রয়যোগ্য জিনিস)—সব সয়দা বাদ দিয়ে আগে লিবে ভাতের চাল।
হরদম্=(সবসময়)—হরদম্ গণ্ডগোল আর ভাল লাগে নাই।
হুঁস=(চৈতন্য / সাবধান)—ডাগরই হইছ্যে কুনো কাজে হুঁস (করতে শিখে) নাই। হুঁস করে কাজ করলে বকতে হয় না।

(আ) আরবী শব্দ

আদৎ, ইজ্জৎ, কাহিল, খাতির, গোসা, জুলুম, জিম্মা, জেব (পকেট), জলদি, তলাশ / তল্লাস, ফয়সালা, ফরক / ফারাক, ফিকির, মুলুক, মালুম, শড়প / শড়ক (—'ই সড়পে উ সড়পে লোক চলেছে সার দিয়ে'), সাফ, সই, হয়রান, হায়া, হুচুক, হারাম।

(ই) পর্তুগীজ শব্দ

পিরেক<পেরেক ; সাবুন<সাবান ; পিয়ারা<পেয়ারা ; পিঁফা<পেঁপে ; তামুক<তামাক।

(ঈ) ইংরেজী শব্দ

আপিস্ (Offiice), ইশ্কুল (School), ইস্কুরুপ্ (Screw), উড্-পেনসিল্ / উট-পেইসিল (wood-pencil), কিলিপ (clip) কুম্পানী (company), গিলাস (glass), টিপিন (tiffin), টিকিট/টিকস্ (ticket), মাইরি (By-Mary), লুট/নোট (note), হুপ্/হুক্ (hook), বেংচি (bench), সিমিট/সিমেণ্ট (cement), সিপ্টি-পিন (Safety-pin)।

(উ) অন্যান্য কয়েকটি দেশী শব্দ

(১) খেড়িয়া ভাষা [শবর জাতির ভাষা খেড়িয়া]

খেড়িয়া—বাংলা

আঁইখ্—চোখ (আঁখি)

আগিন—আগুন

আঁজির—পেয়ারা

আমাবস্যা—অমাবস্যা

আরনী—আয়না/আরশি (mirror)

উড়াকল—এরোপ্লেন

উন্দুর—ইন্দুর/ইঁদুর

উপরাইৎ/উপরাৎ—উঁচু ডাঙ্গা

একে/এ্যাহক—এক/এ্যাক

এতেখন—এখন

কদাইড—কোদাল

করিস্—করিস্

কাঁওয়া—কাক

কাঁগসি/কাঁগজি—কাগজী লেবু

কাঁটি—কাঁটা

কাড়া—মোষ, কাড়া

কাথা—কাঁথা

কাদ—কাদা

কাম—কাজ

কামাড়—কামান/শ্রাদ্ধ

খেড়িয়া—বাংলা

কাম্বাড়—কামার

কাহাড়—কাহার

কিন্দ—কেন্দ>কেঁদ

কিস্—কি

কুকুইড—মুরগী

কুকুর—কুকুর

কুটুম—কুটুম্ব

কুসুম—কুসুম (একজাতীয় টক ফল, বীজ থেকে তেল হয়)

কেঁকড়াস—কেঁকলাস

কেহু—কেহ

খাবা—খাইব

খাসি—খাসি

খেজুইড—খেজুর

খেঁড—খেড় (লাউজাতীয় শব্জী)

খেত—ক্ষেত্র, মাঠ

গাঁয়—গাঁ, গ্রাম

গিধি—শকুন

গীৎ—গান

গুইড—গুড়

খেড়িয়া—বাংলা

ঘুঁগী—ঘুগী
ঘোডা—ঘোড়া
চাঁদ—চাঁদ
ছাও—ছা, বাচ্চা
ছাগড়—ছাগল
ছাঁচা—ছাঁচ
জাঁজলা—জানালা
জাড়্—রাজব্যাঙ
জাড়—শীত
জাম্ব—জাম
জুহ্নার—জোনার
জঁর—জ্বর
টাঁড়—টানো, টেনে ধরো
ডোল—বালতি
তহর—তোর (তর)
তাড়—তাল (তাড়+ই=তাড়ি—তালরসজাত মদ্য)
তেঁতুইড়—তেঁতুল
তেবে—তবে
দাওলি—দা
দের—দেবর
ধুঁয়া—তামাক (বিড়ি)
ধুঁয়ামুষ্ঠি—খৈনী, দোক্তা
নদী—নদী
না, নাও—নাই, নেই,
নানী—নানী
নিকড়াই—বাহির করা, নিংড়ে দেওয়া
নিবন্নিনাম—শেষ হল (নিবারিত হল)

খেড়িয়া—বাংলা

নিদি—ঘুম, নিদ্
পরব—পরব, পর্ব, উৎসব
পাখুইর—পাখী
পাতর—পাতা
পিঁপি—পিঁপড়ে
পেপ্‌সিল—পেন্‌সিল/পেইসিল
পৌয়াড়—খড়/পুয়াল
বঁউ গাছ—বট গাছ
বড—বড়
বাসাসং—বাতাস/বাসাত্
বিডি—বিড়ি
বিলাতী—টমেটো
বাঁধ—বাঁধ
বেলা—সূর্য, সময়
বেহায়—বেহাই
ভঁড়—ভালো
ভাজি, ভ্যাজক—ভাজ (দাদার স্ত্রী)
ভাঁটাই—বেগুন
ভাডুক—ভালুক
মকে—আমাকে
মড়াইৎ—মড়া
মহুন—মহুল, মহুয়া, মোল
মাইট—মাটি
মাউস্, মাস—মাংস, মাস
মাক—মায়ের ('ক' 'র'-বিভক্তির চিহ্ন)
মাদাইড়—মাদল
মুই—আমি
মুড—মুণ্ড>মুড়>মুড়া>মাথা

খেড়িয়া—বাংলা

মুরি—মুড়ি
মা-বাও—মা, বাবা
মুরিচ—লঙ্কা
রসুইড়—রসুন
লিখিং—লেখা
লুহা—লোহা
শশুরাক—শ্বশুর
সাঁওতাড়—মাঝি, সাঁওতাল
সিম্ব—সিম্
সুরু—ছোট, মিহি
সুরু বড—ছোট-বড়
হামর—আমার

খেড়িয়া—বাংলা

হেবাক—হবে
যাম—যাব
গেলায়—গেল
কাম—কাজ
চিহর—চিৎকার কর, চেঁচাও
(যেমন—বাবুকে চিহর
অর্থাৎ বাবুকে ডাক।)
চাঁড়ে—তাড়াতাড়ি।
(যেমন—হে বাবু, তুঁই চাঁড়ে নিদি
যাঁও (নিদারে)
অর্থাৎ, বাবুসোনা তুই তাড়াতাড়ি
ঘুমা রে।)

খেড়িয়া ভাষার কথোপকথন

কে আছত ?—কে আছ ?
মুই মঙ্গল আছি—আমি মঙ্গল (ব্যক্তির নাম) আছি।
কুঁথি যাবে ?—কোথায় যাবে ?
হাড় বাহিত্‌ যাম—হাল বাইতে যাব।
কিস কুরিৎ যাম—কি করতে যাব ?
হাড় বাহিত যাম—হাল বাইতে যাব।
ন বাবা যাস্‌ না—না বাবা যেও না।
কানি যাম নাও ?—কেন যাব না ?
নদী বান আনকে—নদীতে বান এসেছে।

(২) বীরহোড় ভাষা

বীরহোড়—বাংলা
চাপাইকুন—চাপিয়ে
ছাল্যা—ছেলে, ছেল্যা
জল—জল

টকি—টোকা (ছোট ঝুড়ি)
মরিয়া হারাই গেল—মরে নষ্ট হয়ে গেল
হোয়—হয় / আছে
সোরগ—স্বর্গ
সোরগের জল—বৃষ্টি

বীরহোড় ভাষার উদাহরণ

হামরা জংলী দেশের লক বটি, হামাদের ঘর দুয়ার নাই, খেত-খামার নাই, বনে যায়ে পাতর কুড়াই, ঝাঁটি কাটি, তবু হামরা পরব করি, বাঁধনা পরব, করম পরব। পরবে লোতন কাপড় পড়ি। তিন চার দিন লে নাচ গীত্ হয়। মদ, হাঁড়িয়া সব খাঁয়ে দাঁয়ে আনন্দ করি।

(৩) কুর্মালী ভাষার কিছু নিদর্শন

(পুরুলিয়া ও পুরুলিয়া ঘেঁষা পশ্চিম বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত)

কুর্মালী—বাংলা

অরা—ওরা
অহে—ওই, ওহে
আনি—এনে
আঁগনায়—আঙ্গিনায়/উঠানে
আহেক—আছে
আগুঁই—আগে, পূর্বে
উপড়াই—উপড়িয়ে>উপড়ে, তুলে
এহে—এই
কুটুম্—কুটুম্ব, কুটুম
কওয়া—কাক
কল্লি—করলাম
কলাই—মাসকলাই, বিরি
কাঁহু—কোথাও
কেরি—করে
কেরব—করব

কুর্মালী—বাংলা

কেহিকে—কয়ে, বলে
খালেক—খেল, খেয়ে গেল
গীত্—গান, গীত
গায়ত—গেয়ে, গাইতে
গদগদাই—প্রবল বেগে, প্রচণ্ড
ঘেরি—ঘিরে
ঘার—ঘর
চোট—আঘাত, চোট>চট
ছাঁওয়া—ছায়া,
ছিটকাই—ছিটিয়ে
ছাওয়া (ল)—ছেলে
ছুটছুট—ছোট ছোট
জাতি—জাতি
জঁটা—জঁটা
জনমে—জন্মে, জনমে

কুর্মালী—বাংলা	কুর্মালী—বাংলা
জল—বৃষ্টি, জল	বলহিক—বলছি
ঠাহর—ঠিক	বলিদান—বলিদান, উৎসর্গ
ঠঁট—ঠোঁট	বহু, বিটি—বৌ, মেয়ে/বিটি
ডভা—ডোবা	বুট—ছোলা, বুনি—রোপণ করি
ডিংলা—কুম্‌ড়ো	বাঘ, বাঘা—ব্যাঘ্র, বাঘ
ঢুঁঢ়া—খোঁজা	বালি—বালুকা, বালি
তিষ্টা—তৃষ্ণা, তিষ্টা	বীচ—বীজ
তিষ্টাইছে—তৃষ্ণা পেয়েছে	ভাত—ভাত
দেখি—দেয়	মঁয়—আমি
দিঞ—দিয়ে	মটর—মটর, মুগ—মুগ
ধর্ম—ধর্ম	মাথাঁ—মাথা
ন, নিহি—না (নিহি পায়ল—হ'ল না/পেল না)	মাস—মাংস
পাঁঠা—পাঁঠা	রকৃত—রক্ত
পাথর—পাথর	রাখত্—রেখে দিত/রাখত
পানী—জল	রেহে দেলেক—রেখে দিল
পায়ল—পেল	শিয়ার—শেয়াল
পিয়াস—পিপাসা	সামাই—সেঁধিয়ে, ঢুকে, প্রবেশ করে
পরসাদ—প্রসাদ	সভে—সবাই
পুতহ্—পুত্র, ছেলে	সুঁধে—শুঁকে, ঘ্রাণ নিয়ে
পূজা-অর্চনা—পূজা-অর্চনা	সুনহিক্—শুনছ
বুধ—বুদ্ধি	সুবিস্তা—সুবিধা
	হামি—আমি

কুর্মালী ভাষার নমুনা (এ ভাষায় সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তির **'র' 'ক'** হয়)

গরমেক দিনে পানী ঢুঁঢ়ি ঢুঁঢ়ি জীবন গেলেক। ধানেক চারা সভ মরি গেলেক। ঘারলে আঁগনায় সভে ধরম পূজাক মানত কেরিকে গদগদাই জল আলেক।...

অর্থাৎ, গ্রীষ্মের দিনে জল খুঁজে খুঁজে (প্রত্যাশায়) জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ধানের চারা সব মরে গেল। ঘরের আঙ্গিনায় সবাই মিলে ধর্মপূজার মানত করল। প্রবলভাবে বৃষ্টি এল।

(৪) খোট্টা / ভাষার কিছু শব্দ

খোট্টা—বাংলা

অলতী—কচু
অসুখ—অসুখ
অহ—আমি
আইহে—আসি
আওয়া—আসা
আবাদ—চাষ, আবাদ
আম—আম
আলিয়ো—এলাম
আলু—আলু
উ—সে
একগো—একটা
ওকীল—উকিল
ওকরবাদ—তারপর
কোইলা—কয়লা
কাম—কাজ
কামট—কাজটি
কৈসে—কি করে
কাঁহা—কোথায়
কুঁল—পুল (Breeze)
কঁহলে—বললি (স. পু.)
কহল/কহলেহ—বল্লেন (ম. পু.)
কহলিয়ো—বল্লাম (উ. পু.)
কঁহলে—বল্লে (প্র. পু.)
করইত—করিত, করত

খোট্টা—বাংলা

খাতি—ক্ষেত, মাঠ
খাদ—গর্ত, নীচু জমি
খুড়া—খুড়া, কাকা
খালে—খেয়েছিস
খাইলেহেঁ—খেয়েছেন
খায়েক—খাবার
খবর—সংবাদ, খবর
গাঁও—গ্রাম
গয়ার—গোয়ালা
গলমাল—গোলমাল
গাই—গাওয়া
গাইলিয়ো—গাহিলাম, গাইলাম
গেলিয়ো—গেলাম
গীত—গান
গেলু—গেল
ঘর—ঘর
ঘেরি—ঘরে
ঘইলা—ঘড়া, বড় কলসী
ঘাঙরা—রমাকলাই
চরাও—চরানো
চরাওয়ে—চরাতে
গাই—গরু
চিলম—কলকে
চড়ান—সাজা, তৈরী করা

খোট্টা—বাংলা

(চিলম চড়ানো = কলকে সাজা)

ছাতি—বুক

ছট—ছোট

জবর—বিরাট

জঁড়রা—জোনার, ভুট্টা

জিহনা—যেও না

জলদি—তাড়াতাড়ি, শীঘ্র

জ্বর—জর

জাইখন—যাইয়া, গিয়া

ঝিঙা—ঝিঙে, ঝিঙা

টেক—আটক

ডর—ভয়

ডাং—লাঠি

তোঁহ—তোকে / তোমাকে

তোঁয় / তঁই—তুই / তুমি

তহর—তোমার

তহনি—তোরা

তোঁহে—আপনি / তুমি

তেকরবাদে—তারপর

তামখু—তামাকু, তামুক

দাল—ডাল

দকান—দোকান

দেখি—দেখে

দেলিয়ে—দিলাম

দে রহলাই—দিচ্ছিল

ধোয়—ধোওয়া

নুনু—ছোট ছেলে

নুনিয়া—ছোট মেয়ে

খোট্টা—বাংলা

পৈসা / পইসা—পয়সা

পেরুয়া—পায়রা

পোরল—পরল (ঝিঙার মতো শব্জী)

পাইলাক/পাইলিয়ো—পাইলাম, পেলাম

পিছুয়াড্ডে—পিছনে, পশ্চাতে

পানি—জল

পারাঁই—পালিয়ে

ফুফু—পিসী

বাঁটি—বণ্টন, ভাগ, বেড়ে

বেইগন—বেগুন

বনাই—বানিয়ে, তৈরী করে

বিহান—সকাল

বেরা—বেলা

বাঁদ—বাঁধ

বড়মায়—বড়মা, জেঠিমা,

বাইরাহালে—বেরিয়ে আসি,

বাইরাল্যে—বেরুলে

বাঁধ—বড় জলাশয়, পুকুর

বিরি—বিরিকলাই, মাসকলাই

বাদে—পরে

বাগালি—বাগালের

বাদে—পরে

বিললি—বেড়াল

ভুখ—ক্ষুধা > খুদা > খিদে

ভাত—ভাত

ভাজি—ভাজা

ভাব্‌রা—বেশনের তৈরী ফাঁপা তেলেভাজা (ভাপযুক্ত দ্রব্য)

খোট্টা—বাংলা

ভালা—বর্শা
মায়—মা
মামা—মামা
মুগ—মুগ
মুহ্—মুখ
মামলা—মামলা, মোকদ্দমা
মাছ—মাছ
মাস—মাংস
মিলে—পাওয়া যায়
মসী—মাসী
যাহ—যাওয়া
যাহ্‌হলিয়ো—গেল
রামঝিঙা—ঢেঁড়শ
রাতি—রাত্রি, রাত
লাহড়/লাহুড়—অড়হর
লাগি—হয়/আছে
লওয়া—লাউ (শব্জী)
লেইখুন—নিয়ে আসা

খোট্টা—বাংলা

লি—নেওয়া
লিলি—নিলি
শুতি—শোওয়া
শুতিয়ে—শুই (উ. পু.)
সাগ—শাক্
সাঁঝ—সন্ধ্যা
সাপ—সাপ, সর্প
সুধিয়া—জিজ্ঞাসা
সুধিয়াওলাক—জিজ্ঞাসা করল
সতরে—সতর্ক হয়ে, সাবধানে
হাঁড়ি—হাঁড়ি, কলসী
হাম, হামে—আমি
হামর—আমার
হামরা—আমাদের/আমরা
হেলা—চাওয়া
হলয়—হ'ল, হয়েছে
হাথ—হস্ত, হাত

খোট্টা ভাষার প্রয়োগ নমুনা

লকুল সদ্দার নাম লাগি। টুঙ্গি-জোড়দা ঘর লাগি। হামে বাগালি করি। বিহানে হামি ঘুমাইকে উঠলে গরু চরাওয়ে বনে গেল হলিয়ে ত একগো জবর বাঘ দেখলিএ। বাঘ দেখিকে তখন ভালা উঠাঁয়কে মারলিএ্যা ছাতিটয়, যেমনি মারলিয়ে ওই সেঁই মরি গেলে। ঘরমে আইকে হামি যখন হাথ-মুহ্ ধোয়কে ভাত খা হলিয়ে, তখন একগো বিললি এলে, হামি মায় বনেক কহানি কহলই। মায় কহলেহ—তরোঁ যে কহ্‌লিয়ে, হামে বনে জিহনা।

অর্থাৎ, নকুল সর্দার আমার নাম। টুঙ্গি-জোড়দায় আমার ঘর। আমি গরু চরাই। বাগালি করি। সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে গরু চরাতে

গিয়েছিলাম, তখন একটা বড় বাঘ দেখতে পেলাম। বাঘ দেখে তখন বর্শা উঠিয়ে তার বুকটায় যেই মারলাম বাঘটা মরে গেল। ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খাচ্ছিলাম, তখন একটা বিড়াল এলে, আমি মাকে বনের কথা বললাম। মা বললেন—'তোকে যে আমি বলেছিলাম বনে যাস না।'

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

(১) হিন্দী শব্দ ও তার প্রয়োগ

কেঁচ্‌ড়া—হি. কিচ্চড় = কাঁচা/অপক্ক।

—দেখতেই অমন কেঁচড়ামারা বয়স অনেক।

গুসা = গস্‌>গসা=হি. গুস্‌সা>গোসা = সামান্য কথাতেই রাগ।

—একটু কিছু বললেই উনি গুসাঘরে ঢুকবেন।

বহত—অনেক।

আর উয়ার সঙ্গে যাই, বহত শিক্ষা হঁইছ্যে।

সিধা—সোজা।

সিধা যাবি, সিধা আসবি, কুনোবাগে ভালবি নাই।

শশুরাল—শ্বশুর।

তুর শশুরালট বড় ভাল নোক আছে রে বিটি।

নেহর / নাইহর—জ্ঞাতিঘর / পিতৃগৃহ।

'নেহর যাঁয়্যে খাব পাকা তেঁতুল র‍্যা।' (ইমলী রে)।

লুকা—ছাপা / লুকাছুপা—সংগুপ্ত / লুকানো।

কুনকুছু লুকাছাপা করতে গেলিই বেজ।

বুঝে-সুঝে—সম্‌ঝে, চিন্তা-ভাবনা করে।

পর ত' লয় নিজের ঘর বুঝে-সুঝে চলতে হব্যেক।

চাঁদি—রূপা / রূপার টাকা।

ব্যাটা হলে গিনি দিবে, আর বিটি হলে বুঝি চাঁদি।

লাচি কুঁদি—(হি. কুঁদ) = ঝাঁপানো, আনন্দে লাফ-ঝাঁপ করা।

'রাবণ-কাটার বাঁদর লাচ' সংটয় দেখলি বাঁদরটর ক্যামন লাচন-কুঁদন।

(২) ওড়িয়া শব্দ

পতর (পত্র); বুয়াসিন (ছোট ভায়ের বৌ); ছুয়া>ছা (শাবক); গটাই / গটে (একটা / সমগ্র); টিকে / টুকু (সামান্য)।

১. Linguistic Survey of India—Grierson.

২. Origin and Development of the Bengali Language—S. K. Chatterjee.

৩. ডঃ সুধীর করণের মতে ঃ ঝাড়খণ্ডী নামটি রাজনৈতিক। সে কারণে ইহা বর্জনীয়, এই অঞ্চলের ভাষা 'সীমান্ত-রাঢ়ী' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত, রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে এ অঞ্চলের ভাষার যোগসূত্র বর্তমান। কাজেই রাঢ়ী উপভাষা একটি সাব-ডায়ালেক্ট, বা প্রত্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষা নাম দিলে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে এ অঞ্চলের ভাষার মধ্যে লোক ভাষার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান। লোকায়ত সংস্কৃতি। পৃঃ ৪২।

৪. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড) —মাণিকলাল সিংহ।

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দার্থ-বিচার

উচ্চারণে এক অথচ অর্থগত দিক দিয়ে ভিন্ন—এরকম বহু শব্দ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের শব্দকে বলে 'সমোচ্চারিত শব্দ'। আমাদের বাঁকুড়া তথা মল্লভূম অঞ্চলের উপভাষাতে এই শ্রেণীর বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

(১) সমোচ্চারিত শব্দ

কড়া—আংঠা, রিং ; কড়া—আকল ; কড়া—কড়াই (রন্ধনের পাত্র)।
কাড়া—পুং মহিষ ; কাড়া—পরিষ্কার করা ; কাড়া—কেড়ে নেওয়া।
খাড়া—সোজা ; খাড়া—ডাঁটা ; খাঁড়া—অস্ত্রবিশেষ।
গাড়া—গর্ত ; গাড়া—পোঁতা ; গাড়া—ছোট পুকুর।
গড়—ভূমিষ্ঠ প্রণাম ; গড়—দুর্গ ; গড়—ঢেঁকিতে ধান / চাল কুটার সময় যে স্থানে ধান / চাল দেওয়া হয়।
গুঁড়ি—গুঁড়ো ; গুঁড়ি—গাছের গোড়া ; গুড়ি—চুপিসারে।
ঘাঁটা—গরুর খাদ্য বিশেষ ; ঘাঁটা—মিশ্রিত / মাখা ; ঘাঁটা—রাগ (ওকে ঘাঁটিও না)।
চাঁছা—পরিষ্কার করা ; চাঁছা—ক্ষীর।
চাঁড়—গরজ ; চাঁড়—শীঘ্র।
ছাঁচ—কাঠামো (Model) ; ছাঁচ—কুঁড়ে ঘরের খড়ের ছাউনির শেষ প্রান্ত।
পিঁড়া—বারান্দা ; পিঁড়া—কাষ্ঠাসন।
পুয়া—চারাগাছ ; পুয়া—¼ অংশ ; পুয়া—পোহানো / যাপন করা।
পণ—প্রতিজ্ঞা ; পণ—যৌতুকের টাকা ; পণ—২০ গণ্ডায় ১ পণ।
ফুরফুরা—মুড়ি ; ফুরফুরা—হালকা / মচমচে।
ব্যাঁত—মুখ ; ব্যাঁত—লোভ।

ভালা—তাকানো ; ভালা—বর্শা।

মাড়া—পদদলিত করা ; মাড়া—মাইরি By-Mary.

যাত্রা—যাওয়া ; যাত্রা—সং।

রং—বর্ণ (Colour) ; রং—গানের ধুয়া (বিশেষতঃ ঝুমুর)।

লাড়া—নাড়ানো ; লাড়া—পরিত্যক্ত অংশ।

বুড়ি—বৃদ্ধা ; বুড়ি—কেন্দ্র (Centrer) ; বুড়ি—ধারাপাতের মাপ। যেমন—১ বুড়ি সিকি।

সবলা—শক্তিশালী নারী ; সবলা—যে বলতে পারে।

হলহলে—ঢিলাঢালা (loose) ; হলহলে—একধরণের সাপ।

থান—পূজাস্থল ; থান—পাড়হীন ধুতি।

টাবা—ফোলাফোলা ; টাবা—টক লেবু।

২। **তৎসম শব্দজাত ভিন্নার্থক সমরূপ যুগ্মশব্দ**

গরা<গৌর ;=(১) গৌরবর্ণ / ফর্সা ; (২) ইংরেজ।

মাঝ<মধ্য ;=(১) মধ্য গৃহ / মধ্যস্থান ; (২) কলা গাছের কাণ্ডাংশ।

৩। কখনও কখনও একটিমাত্র শব্দে বাক্যাংশের সমগ্র অর্থ সংহত হয়, তখন সেই শব্দ বিশেষণের বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন—

কুচি=কাঠের টুকরো টুকরো অংশ।—কুচিগুলা তুলে রাখ্।

খাঁচি—বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী ছোট ঝুড়ি।—খাঁচি করে শাগকটা ধুয়ে আন।

গুঁড়ি—চালের গুঁড়ো, বা গাছের গোড়া।—ঐ কটা পিঠা কুলাব্যাক নাই, সব গুঁড়িট মাখ্যে দ্যা। বা, পুরানো গুঁড়ি পাটা হবেক মজবুত।

চিতি—চিত্রিত দেহ সর্প।—ঢোঁড়া লয়, হলহলে লয়, চিতি বটে।

চুয়া—নদীর তীরে বালিতে গর্ত করে জল বের করা।—চুয়ার জল বটে কত পরিষ্কার।

ছোট্কা—দেওর / বরের ছোট ভাই।—ই সব ছোট্কার কাণ্ড।

থান—পূজাস্থল ;—মা মনসার থানে গড় করে আয়।

বাট্না—মশলা, বিশেষতঃ সরিষা।—বাটনা বেটে কমর গেল।

পণ—যৌতুকের টাকা।—কন্যাপণ বারো হাজার টাকা।

সাঁজ—সন্ধ্যাপ্রদীপ / সন্ধ্যাআরতি।—ও ছটুবৌ সাঁজ দেখাও।

শুকা—শুক্‌নো মাছ।—শুকার তরকারী দিয়ে ভাত রুচে না।

৪। (ক) উচ্চারণে মিল আছে অথচ অতিশয়োক্তিতে মূল উপমেয়র বিলোপ ঘটে, এবং উপমান প্রধান হয়ে ওঠে, ফলে শব্দের অর্থ-ভিন্নতা দেখা যায়। এরকম নূতন শব্দ হ'ল—

চঁচ্=চঞ্চুর মতো ধারালো কাঁটা।

মারহাট্টা=মহারাষ্ট্র প্রদেশের শক্তিশালী লোকদের প্রচণ্ড ক্ষমতা। সম্ভবতঃ 'বর্গী-হাঙ্গামা'র ভীতি এর মূলে রয়েছে, তাই মারধোর করার প্রবণতা বোঝাতে 'মারহাট্টা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—মারহাট্টা ছেলে।

(খ) অনেকক্ষেত্রে অর্থের অবনতি ঘটে। যেমন—

পিরিতি<প্রীতি ; বাখান<ব্যাখ্যা ; বাস<গন্ধ ; ফুটা<নিঃস্ব / সর্বস্বান্ত হওয়া ; ফক্কড়<ফকির, বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো নিষ্কর্মা ব্যক্তি ; নজর<কু-দৃষ্টি।

(গ) অনেকক্ষেত্রে অর্থ সংকুচিত হয়। যেমন—

গরাম=গ্রাম। বর্তমানে গ্রামদেবতা।
গড়=গর্ত। „ ঢেঁকির পাড় পাড়ার নির্দিষ্ট গর্ত।
ঘাটা=মাখানো। „ গরুর জন্য মিশ্রিত খাদ্যবিশেষ।
থান=স্থান। „ দেবতার আশ্রয়স্থল।
ঠাঁর=ইঙ্গিতবোধক ক্রিয়া। বর্তমানে ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গি।
সাঙ্গ / সাঁগা>সাঁঘা=সঙ্গ। „ উপবিবাহ।
ভাতুয়া=ভাত। „ ভাতের বিনিময়ে কাজ।
ভাতার=ভাত দেয় যে। „ স্বামী।

(ঘ) সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে শব্দের পরিবর্তন। যথা—

'নাছ' / 'লাছ'=রথচালনযোগ্য প্রশস্ত পথ।
বর্তমানে—খিড়কি দরজা।
'বাড়ী'=গৃহ। „ গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ বা খামার।

(ঙ) মূল অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি ও সংযোগ না রেখে বিকল্প শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ। যেমন—

'তরল' = জলীয় পদার্থ। কিন্তু 'সোজা' অর্থেও 'তরল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রায় সব প্রশ্ন তরল হয়েছিল।
'তাপ' = উত্তাপ, উষ্ণতা। কিন্তু 'দুঃখ' অর্থে বা অত্যাচার অর্থে 'তাপ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—কালার বাঁশী শুনে মরি মনস্তাপে গো।

(চ) কোন কোন শব্দ তার নিজস্ব অর্থ হারিয়ে অতিরিক্ত বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—
কাঁক্ড়া = বিছা ; গাড়র = ভেড়া ; বালক = ছেলা ; লাউ = তুম্বা ; শিল = পাথর ; হুল = পাথর।

(ছ) অনেক সময় আবার লিঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে এরকম শব্দ খুব কম। যেমন—'ঢেমনা' শব্দটি।
শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক। অর্থ দুষ্ট বা কপট ব্যক্তি। মূল মুণ্ডারী শব্দ ঢাম = ঠাট্টাকারী বা মিথ্যা অহংকারী। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গের 'ঢেমনা' শব্দটির অর্থ হল 'রক্ষিতা'।

(জ) এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলির মূল অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট হওয়ায় পরিচিত শব্দ-ধ্বনি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। যেমন—'জোনাপোকা' বা 'জোনাকি'। মূল জ্যোৎস্না > জোনা, এর সঙ্গে 'পোকা' সংযুক্ত হয়েছে। 'বাস্‌মাতা' = মূল 'বসুমতী'। পরে 'মতী' 'মাতা' হয়েছে। 'হিঁস্‌কুটি = মূল 'হিংসুটে'। পরে 'কূট' / 'কুটিল' যুক্ত হয়েছে।

(ঝ) এমন কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ আছে যার মধ্যে উপমা সংযুক্ত থাকলেও বাইরে থেকে তা চেনা যায় না। এরকম কয়েকটি শব্দ হ'ল—
আঁধু-ছাঁদু = অন্ধের মতো স্খলিত ছন্দ।
কুল-আঁঠি = কুলের আঁটির মতো শক্ত আকল।
ঘুঘু-ঘেরা = ঘুঘুপাখীকে ঘিরে ধরার মতো ষড়যন্ত্র / কৌশল।
জড়-পুঁটলি = জড়িয়ে জড়িয়ে পোঁট্‌লা বাঁধার মতো অবস্থা।
ঢঁড়-গিলা = ঢোঁড়া সাপের ব্যাঙ গেলার মতো স্থবির অবস্থা।
বাঁধা-ছাঁদা = বেঁধে বেঁধে ছন্দবদ্ধ করা, বা, ছন্দে ছন্দে (স্তরে স্তরে) বন্ধন করা।

(ঞ) কয়েকটি অভিনব সুভাষণ বা প্রতিশব্দ। যেমন—কুলুপ-খাড়ি / আঁচল-খাঁড়ি = ঘরদুয়ার, বাক্সতোরঙ্গ ইত্যাদি বন্ধ করবার জন্য তালাচাবি।

মেয়েরা বিশেষতঃ বৌয়েরা সে চাবি আঁচলে বেঁধে রাখে বলে এ অঞ্চলে একে 'আঁচল-খাড়ি' বলে।

'পেঁইসিল-বাড়া' = পেন্সিলকে তীক্ষ্ণ করবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। এখানে যন্ত্রটিকে 'বাড়ানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'বাড়ন্ত' = শেষ হয়ে যাওয়া। (বাড়+অন্ত)। সাধরণতঃ ভাত মুড়ি, চাল, চিঁড়ে, সিঁদুর ইত্যাদি শুভ জিনিস শেষ হয়ে গেলে 'নেই' শব্দটি ব্যবহার না করে 'বাড়ন্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারণ আমাদের এদেশের সংস্কার ঐসব জিনিস গৃহে চিরন্তন হয়ে থাকুক। তাই 'শেষ' শব্দের পরিবর্তে 'বাড়ন্ত' শব্দের প্রয়োগবিধি।

ধ্বনি-বিচার

(স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি)

স্বরধ্বনি

বাংলা ও তার অন্যান্য উপভাষার মতো মল্লভূমী উপভাষারও মৌলিক স্বরধ্বনি অ, আ, ই, উ, এ, এবং কখনও কখনও 'ও'। বাংলার নিজস্ব স্বরধ্বনি 'অ্যা' এখানকার উপভাষার একটি বিশিষ্ট স্বরধ্বনি। যেমন—এক>এ্যাকা, তেল>ত্যাল, ছেলে>ছেলা>ছেল্যা, ইত্যাদি।

মানচিত্রে বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চল পশ্চিমরাঢ়ীয় অঞ্চল। রাঢ়ীয়-ভাষা-অঞ্চলের ভাষা হলেও স্বরপ্রকৃতিতে এ অঞ্চলের উপভাষায় স্বতন্ত্র তিনটি ধ্বনি লক্ষ্য করা যায়, এগুলি হ'ল লঘু উচ্চারিত ই, উ, অর্ধস্বর 'য়' অর্থাৎ ইয়, ইয়া, ইয়ে।

লঘু 'ই' আছে স্বরবিপর্যস্ততায়। যেমন—রাইত>রাত>রাত্রি। পাইখ>পাখি>পক্ষী। লঘু 'উ' প্রায় স্থানপরিবর্তনগত বা বিপর্যয়গত। এ ধরণের উচ্চারণ খুব কম শোনা যায়। যেমন—আউখ>আখ>ইক্ষু; ঠাওক্‌রণ>ঠাকুরণ>ঠাক্‌রণ।

লঘু 'য়' একটি অর্ধস্বর। তবে সাধারণ 'য়'-শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। সেজন্য শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য'-ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। এই অর্ধস্বর বা লঘুস্বর 'য' আবার

তিনভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) শব্দের শেষে ; যেমন—আল্য<আইল<আসিল/এলো ; হল্য<হইল<হোল। (২) শেষে এবং মধ্যে ইয়া (ই+য়+আ) যেমন—হর‍্যা<হরিয়া<(হরি+ইয়া) ; গুণ্যা<গুণিয়া (গুণ+ইয়া) ; হড়বড়্যা>হড়বড়িয়া (হড়বড়+ইয়া) ; গুড়গুড়্যা<গুড়গুড়িয়া (গুড়গুড়+ইয়া)। (৩) 'ইয়ে'—যা দ্রুত উচ্চারণে সঙ্কুচিত হয়ে ইএ্য (ই+য়+এ) রূপপ্রাপ্ত হয়। যেমন—আল্যে<আসিলে / এলে<আইসিলে ; আন্যে< আনিয়ে / এনে<আনিয়া ; থাক্যে<থাকিয়ে / থেকে<থাকিয়া ; বল্যে< বলিয়ে / বলে<বলিয়া।

ব্যঞ্জনধ্বনি

এ অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হ'ল—

ক, খ, গ, ঘ = কণ্ঠ্যবর্ণ / কণ্ঠ্যধ্বনি।
চ, ছ, জ, ঝ = তালব্যবর্ণ / তালব্যধ্বনি।
ট, ঠ, ড, ঢ = মূর্ধণ্যবর্ণ / মূর্ধণ্যধ্বনি।
ত, থ, দ, ধ = দন্ত্যবর্ণ / দন্ত্যধ্বনি।
প, ফ, ব, ভ = ওষ্ঠ্যবর্ণ / ওষ্ঠ্যধ্বনি।
ঙ, ঞ, ন, ণ, ম, ং, ँ = নাসিক্যবর্ণ / নাসিক্যধ্বনি।
শ, ষ, স, হ = উষ্মবর্ণ / উষ্মধ্বনি।
ড়, ঢ় = তাড়িত ধ্বনি।
ল = পার্শ্বিক ধ্বনি।
র = কম্পিত ধ্বনি।

এছাড়া 'য়'-এর উচ্চারণ 'জ'-এর মতো। 'অন্তঃস্থ-ব'-এর উচ্চারণ বর্গীয় 'ব'-এর মতো। 'ঙ' এবং 'ং' অনেক সময় এক ও অভিন্ন। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মতো এ অঞ্চলের উপভাষাতে অল্পপ্রাণ এবং অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাণিত এবং ঘোষীভূত হবার প্রবণতা দেখা যায়। সেকারণে দৃঢ়তা ও কঠোরতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ভাষা সভ্য মানুষজনের কাছে 'মোটা ভাষা'। তবে একথাও ঠিক যে এখানকার পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা ভাষা যা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন তা মূল মানভূম—ঝাড়খণ্ডী ও বাঁকুড়া অঞ্চলের (মল্লভূম) ভাষার সঙ্গে প্রায় একরূপ। শুধুমাত্র ধ্বনিগত দিক দিয়ে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। কারণ উচ্চারণে কলকাতা-ভাগীরথীতীরের মার্জিত ভাষা থেকে মানভূম, মল্লভূম ২/১ শত

বছর পিছনকার ভাষা। সুতরাং এ দুই ভাষার মধ্যে বেশ কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য নজরে পড়ে। যেমন—

ভাগীরথী অঞ্চল	মল্লভূম অঞ্চল	ভাগীরথী অঞ্চল	মল্লভূম অঞ্চল
গুচ্ছ	গোছা / গছা	গোটা	গটা
রুগ্ন	রগ্‌না	ঝোলা	ঝলা
ওঝা	অঝা	থোকা	থকা
কোল	কল	ঔষধ	ওষুদ
লৌহ	লুয়া / লুহা	চৌখস	চখা
ভাদ্র	ভাদর	চর্ম	চাম
স্তবক	থপা	ইন্দুর	উন্দুর
দামোদর	দামুদর	সাংঘাতিক	সাঁগিন
রোম	রুয়া	অঙ্কুশিকা	আঁকুশি
চণ্ডাল	চাড়াল	স্থিতি	থিতি
ধ্যান	ধিয়ান	ইন্দ্র	ইন্দ্‌

১। স্বরধ্বনির **প্রথম ধ্বনি 'অ'**। কাজেই 'অ'-কে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'অ' একটি নিম্নমধ্যস্থ শুদ্ধ স্বরধ্বনি। এ অঞ্চলের উপভাষাতেও 'অ'-এর ব্যবহার যে উক্তরূপ তার প্রমাণ—

আদিতে 'অ'—অ-সটা / অ-সঠা ; অ-বেলা / অ-বিলা ; অ-কথা / অ-কুথা।

মধ্যে 'অ'—কম্ (অ) ল=কমল্; কাজ-অল্=কাজল্; রগ্‌-অড়=রগড়্; গত্‌অর=গতর ; পত্‌অর=পতর।

অন্তে 'অ'—চ (চ+অ)=চল্; ধব (ধব্‌+অ)=পরিষ্কার; চিত্ত (চিত্‌+অ)=ছবি।

উচ্চারণ ভেদে 'অ'

ক) প্রকৃত অর্থে 'অ' :—যেমন—পরব, গতর, পতর ;

খ) নির্দেশক অর্থে অ=ট / টা :—যেমন—লোকটি=লোকট / লোকটা ; বাটিটা=বাটিট ; মেয়েটা=বিটিট ;

গ) 'উ'-কার 'অ' রূপে :—গুচ্ছ=গছা ; রুগ্ন=রগা / রগ্‌না ;

ঘ) 'এ'-কার 'অ' রূপে :—নারিকেল=নারকল ;

ঙ) 'ও'-কার 'অ' রূপে :—ওঝা=অঝা; ও (সম্বোধন অর্থে) অ. ডোবা=ডবা, খোঁড়া=খঁড়া, সোমবার=সমবার;

চ) 'ও'-কার এবং 'ঔ'-কার 'অ' রূপে :—ঔষধ>ওষুদ>অষুদ; লৌহা> লোহা>লহা; গৌর>গোরা>গরা; চৌখস>চোখস>চখা;

ছ) বিপ্রকর্ষের ক্ষেত্রে :—ভাদ্র>ভাদর; পর্ব>পরব; গর্ব>গরব; মহার্ঘ—মার্ঘ>মার্গ>মারগ।

২। স্বরবর্ণের **দ্বিতীয় ধ্বনি 'আ'**। 'আ' কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি। কারণ 'আ' উচ্চারণের সময় জিভ নিম্নে অবস্থিত হয়, এবং মুখগহ্বরের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের কেন্দ্রে অবস্থান করে। 'আ' উচ্চারণে ওষ্ঠাধর বিকৃত হয়, অর্থাৎ 'হাঁ' হয়ে যায় বলে একে 'বিকৃত ধ্বনি'ও বলা হয়।

ক) আদিতে 'আ'—আশ্বিন=আশিন; আলস্য=আলিস; আম্র=আম;
মধ্যে 'আ'—কার্পাস=কাপাস;
অন্তে 'আ'—ডিংলা, ছেল্যা, বিশা, ঝিঙা, ডুমকা।

খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন অনেক সময় 'আ' রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—অঙ্কুশিকা (আঁক্‌শি); সম্মুখ (ছামু / সামনে)।

গ) শ্বাসাঘাতে 'আ'—তমাল (তামাল); মহাজন (মাহাজন); চণ্ডাল (চাঁড়াল); ফর্সা (ফার্‌সা / ফারচা)।

ঘ) নাসিক্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনে 'আ'—চম্পা>চাঁপা; চর্ম>চাম; ঘর্ম>ঘাম।

ঙ) অতিরিক্ত স্বরের সংকোচনে 'আ'—স্তবক>থপা; মস্তক>মাথা।

চ) সমাসবদ্ধপদে 'আ'—ইকাপ্যাট=একজনের জন্য পেট (পেটের চিন্তা / খাবার চিন্তা)।
গরভী-খাকি=গর্ভ খেয়েছে যে / গর্ভ নষ্ট করেছে যে নারী।
ভাতুয়াপেটা বা প্যাটভাতুয়া=পেট ভরাবার জন্য ভাতের বিনিময়ে পরিশ্রম বা কাজ।
বাঁদ্‌রামুয়া=বানরের মুখের মতো কুৎসিত বা বিকৃত মুখ যার।

ছ) অনুকার বা শব্দদ্বৈতে 'আ'—ফটাফট্; টপাটপ্; খপাখপ্;

জ) তুচ্ছার্থে 'আ'—বন্যশূকর=বরা; রামচন্দ্র=রামা; বিশ্বনাথ=বিশা;

ঝ) 'ই'-কারের ক্ষেত্রে 'আ'—ইক্ষু>আখ;

ঞ) অন্যান্য ক্ষেত্রে 'আ'—জয়পুর=জয়পুরা; তিলবনী=তিলাবনী; খয়েরশোল=

খয়রাশোল ; সোনামুখী=সোনামুয়া ; ছেলে=ছা ;
বিবাহ=বিয়া / বিহা ;

৩। স্বরবর্ণের **তৃতীয় ধ্বনি 'ই'**। উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ই' উচ্চাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং প্রঃস্থত ধ্বনি।

আদিতে 'ই'—ইচ্‌ড়া / ইচ্‌লা<চিংড়ি ; ইচ্‌রা<আঁচড়।

মধ্যে 'ই'—বহিন<বোন ; সাগিন<সাংঘাতিক ; গহিন<গহন।

অন্তে 'ই'—থিতি<স্থিতি ; রাতি<রাত্রি ; টাঁটি<মাটির ছোট পাত্র ; গুগ্‌লি<শামুক।

ক) 'অ' হিসাবে 'ই'—সজ্ঞান=সিয়ান।

খ) 'উ' হিসাবে 'ই'—বায়ু=বাই / বাউ ; পরমায়ু=পরমাই।

গ) 'ঋ' হিসাবে 'ই'—শৃগাল=শিয়াল ; মৃণাল=মিনাল ; ঘৃণা=ঘিনা।

ঘ) 'এ' হিসাবে 'ই'—বেলা=বিলা ; সে=সি ; একা=ইকা ; মেলা=মিলা।

ঙ) স্বরভক্তিতে 'ই'—গৃহস্থ>গিরস্থ ; মৃগী>মিরগী ; জ্ঞান>গিয়ান ; বৃক্ষ>বিক্ষ / বিরিখ্য ; স্নান>সিনান ; ধ্যান>ধিয়ান।

চ) অন্যান্য—স্কুল>ইস্কুল ; গাঁঠে>গাইঠে ; কলিকাতা>কইলকাতা ; প্রীতি> পিরিতি।

৪। স্বরবর্ণের **পঞ্চমস্বর 'উ'**। উচ্চারণের নিয়মানুসারে 'উ' উচ্চাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এবং ওষ্ঠ্যধ্বনি ও বর্তুলস্বর।

শব্দের আদিতে 'উ'—উদ্‌মা, উপ্‌কার / উব্‌গার, উথুলা, উকুন।

শব্দের মধ্যে 'উ'—বাছুর, থুবড়া (থ্‌+উ+ব্‌+অ+ড়্‌+আ) কুক্‌ড়া, ঠুঠা, ঝুড়ি, ডুম্‌কা, বাখুল, পাছুড়া।

শব্দের অন্তে 'উ'—কুইলু (কোকিল) ; নুনু (ছোট ছেলে) ; শু (শয়ন কর্) ; ধু (ধৌত কর্) ; দুদু (দুগ্ধ) ; ছুটু (ছোট)।

ক) 'অ'-কারের ক্ষেত্রে 'উ'—শকুনি>শুকুনি / শুগুনি / শুক্‌নি / শুগ্‌নি ; কলসী>কুলসী (সাঁ. ভা) ; নদী>নুদী ; মণি>মুনি।

খ) 'আ'-কারের ক্ষেত্রে 'উ'—বিনা>বিনু ; রামা>রামু ; রুখা>রুখু ; শুখা>শুখু / শুকু।

গ) 'ই'-কারের ক্ষেত্রে 'উ'—ইন্দুর>উন্দুর / উন্দুর।

ঘ) 'ও'-কারের ক্ষেত্রে 'উ'—রোম>রুঁয়া ; কোন>কুন ; দামোদর>দামুদর ; গোয়াল>গুয়াল ; কোদাল>কুদাল।

ঙ) 'ঔ'-কারের ক্ষেত্রে 'উ'—লৌহা>লুহা ; রৌপ>রূপা ; ধৌত>ধুয়া।

চ) স্বরভক্তিতে 'উ'—শুক্রবার>শুক্কুরবার ; ভ্রূ>ভুরু।

ছ) অন্যান্য—আলু-থালু>এলোমেলো ; আঁকু-পাঁকু>আঁক-পাঁক ; ছুটু-ছুটু> ছোট-ছোট।

৫। স্বরবর্ণের **একাদশ বর্ণ / দ্বাদশ বর্ণ 'ও'**। উচ্চারণরীতি অনুসারে 'ও' উচ্চ-মধ্যস্থ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, বর্তুল এবং ওষ্ঠ্যধ্বনি।

ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ও' বিকল্পে 'অ' হয়। যেমন—ওসার>অসার ; এবং 'অ' বিকল্পে 'ও' হয়। যেমন—অতীত>ওতীত ; অমিয়>ওমিয়।

খ) 'ঔ'-কারের ক্ষেত্রে 'ও'—পৌষ>পোষ ; ঔষধ>ওষুধ।

গ) স্বরভক্তিতে 'ও'—শ্লোক>শোলোক ; শ্লো>শোলো।

৬। 'অ্যা' বাংলার নিজস্ব স্বরধ্বনি। উচ্চারণরীতি অনুসারে 'অ্যা' কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি।

ক) 'ইয়া' প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে 'অ্যা' ব্যবহৃত হয়। যেমন—ছেলিয়া>ছেল্যা ; পুরুলিয়া>পুরুল্যা ; ঝুমুরিয়া>ঝুমুর‍্যা।

খ) অন্যান্য—বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চলের উপভাষায় 'অ্যা' ধ্বনি বহুল-প্রচলিত। যেমন—ত্যাল, প্যাট, ল্যাজ, ব্যাল, থ্যাঁজা।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি বা স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা

ঝাড়খণ্ডী ঘেঁষা বাঁকুড়া অঞ্চলের উপভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা। এই অনুনাসিক প্রবণতা রাষ্ট্রীয় ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাতেও যথেষ্ট প্রচলিত।

গ্রীয়ারসন থেকে শুরু করে আচার্য সুনীতিকুমার ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ সকলেই এই অঞ্চলের উপভাষায় অনুনাসিকের প্রাচুর্যকে একটি বিশেষ লক্ষণচিহ্ন বলে মনে করেছেন। শব্দে এ রীতি প্রয়োগ ছাড়াও অসমাপিকা ও অসমাপিকাযুক্ত যৌগিককালের ক্রিয়াপদগুলিতে এই অনুনাসিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আদি-মধ্য বাংলার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সঙ্গে এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

স্থানভেদে অনুনাসিক স্বর-ধ্বনির অবস্থান ও অবস্থান বিপর্যয়

'অ' অনুনাসিক উচ্চারণে 'অঁ' হয়। যেমন—

অঁটা = ১) আটকিয়ে রাখা।—'কমর-কষায় অঁটায় বিড়ি।

২) বেশী পরিমাণে খাওয়া।—ভাল-মন্দ খুব অঁটারে এসো না।

অঁকা = বোকা।—আমাকে খুব অঁকা লোক পেয়েছ বুঝি ?

অঁড়কক = আনাড়ি।—আচ্ছা অঁড়কক লোক যা হোক তুমি।

কঁকা = বোবা।—বিধির কি বিচার, একটা ছেলা দিল তাও আবার কঁকা।

কঁচড় / কোঁচড় = কোমরের বস্ত্রাংশ, টঁ্যাক।—কঁচড় ভোরে তুলব মোরা ভূয়ের যত ফুল, শিউলি বকুল।

খঁকা = খোকা।—জয় রাধাশ্যাম, গৃহস্থের খঁকা হোক।

বঁটা = বোটা / বৃন্ত।—পানের বঁটায় করে টুকছু চুন দাও তো।

স্বতোনাসিক্যীভবন—জটা > জঁটা ; কচি > কঁচি ; শশা > শঁশা ; পচা > পঁচা।

'আ' অনুনাসিক উচ্চারণে 'আঁ'। যেমন—

আদিতে—আঁক = অঙ্ক ; আঁক-কাড়া = দাগটানা / দাগকাটা ; আঁট = শক্ত / চাপা ; আঁখ = ইক্ষু।

মধ্যে—হাঁসি, খাঁচি,হাঁতী, ছাঁচি / ছাঁচ-ত্যাল (সরিষার তেল) ; ঝাঁটি, গাঁজাল, ঝাঁকড়া, ঝাঁঝ, ঝাঁঝাল।

অন্তে—খায়েঁ্য, চায়েঁ্য, হয়েঁ্য। এগুলি আবার খেঁয়ে, চেঁয়ে, হঁয়ে রূপেও ব্যবহৃত হয়।

ক) শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে অনুনাসিক হয়। যেমন—
অঙ্কুশিকা = আঁকশি ; দন্ত = দাঁত ; দণ্ড = ডাঁট / ডাঁটা।

খ) অনুস্বর লুপ্ত হলে অনুনাসিক হয়। যেমন—
পাংশু = পাঁশ/পাঁশুটে (ছাইবর্ণ), কংসারি = কাঁসারি ; বংশ = বাঁশ।

গ) স্বতোনাসিক্যীভবনে অনুনাসিক হয়। যেমন—
ছায়া > ছাঁয়া ; কর্কোট > কাঁকুড় ; অর্বুদ > আব > আঁব, শ্বাস > শাঁস, পক্ষ > পাখা > পাঁখা।

'ই' অনুনাসিক উচ্চারণে 'ইঁ'। যেমন—

ইঁদ, ইঁজোল-পিঁজোল, বিঁড়া, ছিঁচা, ঝিঁগা, বিঁধা।

সাধারণতঃ ক) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে 'ইঁ' হয়। —বিন্দু→বিঁদ, হিন্দু→হিঁদু, সিন্দুর→সিঁদুর, ইন্দুর→ইঁদুর।

খ) অনুস্বর লুপ্ত হলে 'ইঁ' হয়।—হিঁসা > হিংসা।

গ) স্বতোনাসিক্যীভবনে 'ইঁ' হয়।—তিক্ত > তিঁতা, বিদ্ধ > বিঁধা।

'উ' অনুনাসিক উচ্চারণে 'উঁ' হয়। যেমন—
উঁচল-পাঁচল ; উঁচু ; উঁনুর ; সুঁইসাঁধ ; কুঁই-কাঁই ।

ক) 'ম'-লুপ্ত হলে 'উঁ' হয়। যেমন—ভূমি>ভুঁই ; ধূম>ধুঁয়া।

খ) স্বতোনাসিক্যীভবনে 'উঁ' হয়। যেমন—কূটজ=কুঁড়চি ; কূপ=কুঁয়া ; যূথী=যুঁই ; উচ্চ=উঁচু ; উট=উঁট।

'এ' অনুনাসিক উচ্চারণে 'এঁ' হয়। যেমন—
কেঁদ, কেঁদরা, গেঁড়া, খেঁচা / খিঁচা, ছেঁকা।

ক) সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে—গ্রন্থি=গাঁট=গেঁট।

খ) স্বতোনাসিক্যীভবনে—ধৃষ্ট>ধূর্ত>ঢেঁটা, শ্বাস-নেওয়া=হেঁশুরা।
এসব ছাড়া আছে স্বরলোপ ও স্বরবিপর্যাস।

স্বরলোপ হয় তিনভাবে। ১) আদিতে ২) মধ্যে ৩) অন্তে।

১) আদিতে স্বরলোপ—উপরশোল>পরশোল ; অবস্থান>বাথান ; সঙ্গীত>গীত ; অভ্যন্তর>ভিতর ; উড্ডুম্বর>ডুমুর।

২) মধ্যে স্বরলোপ—কলম্বিক>কলমী ; কর্দম>কাদা ; খর্পর>খাপ্‌রী ; গর্ত>গাব ; ঘণ্ট>ঘাঁ্যাট ; পিঞ্জর>পাঁজ্‌রা ; জীবন্ত>জীয়ল ; বল্কল>বাকল ; মঙ্গলা>মংলী ; কুক্কুট>কুক্‌ড়া ; থানাদার>থান্দার ; হরিতকী>হত্তুকী ; সরিষা>সর্ষে ; কর্মকার>কামার ; বৃহস্পতি>বেস্‌পতি; বসুমাতা>বাস্‌মাতা ; সজিনা>সন্না।

৩) অন্তে স্বরলোপ—অগ্র=আগ; অন্য=আন; চর্ম=চাম; লতা=লত্‌; ভিক্ষা=ভিখ্‌; বন্যা=বান; বড়অম্বা=বড়মা; খোঁচা=খঁচ্‌; লজ্জা=লাজ; সজ্জা=সাজ; গতি=গৎ; রীতি=রীত্‌; ভিত্তি=ভিৎ; চঞ্চু=চঁচ্‌>ঠোঁট; যোগিনী=যোগিন্‌; ডাকিনী=ডাকিন্‌।

স্বরবিপর্যয়

রুমাল>উরমাল ; বাতাসা>বাসাতা ; বাক্স>বাস্ক ; পিশাচ>পিচাশ।

ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে ধ্বনিগত দিক দিয়ে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১) কণ্ঠ্যধ্বনি ২) তালব্যধ্বনি ৩) মূর্ধণ্যধ্বনি ৪) দন্ত্যধ্বনি ৫) ওষ্ঠ্যধ্বনি। তাছাড়া আছে মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনি এবং ঘোষ ও অঘোষধ্বনি।

১) ক, খ, গ, ঘ ধ্বনিগুলি কণ্ঠ্যধ্বনি। কণ্ঠ্যধ্বনির প্রথম ধ্বনি **'ক'**। ধ্বনিটি অল্পপ্রাণ ও অঘোষধ্বনি, এবং প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি।

আদিতে—কড়্চা—রোজনামচা; কচ্ড়া=মহুয়ার ফল; করম=বৃক্ষবিশেষ এবং আদিবাসীদের কৃষি-উৎসব। কওলা=কুয়াশা; করকেট=টিন-বিশেষ।

মধ্যে—খক্লা=ফাঁকা, বাক্লা=আসন, আঁক্রি=অঙ্কুর।

অন্তে—মুক্=বকুনি, ঢক্=ধাঁধাঁ, আঁক্-পাঁক্=অস্থির, আঁক্=বেড়া, অঙ্ক, দাগ।

অনেক সময় 'ক'-এর বিকল্প হিসাবে 'গ' এবং 'প' উচ্চারিত হয়। যেমন—কাক্>কাগ্, শাক>শাগ্, চকা (খোসা)>চপা, সড়ক>সড়প, হুক্>হুপ।

'খ'-ধ্বনিটি কণ্ঠ্যধ্বনি। মহাপ্রাণ ও অঘোষ এবং দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনি।

খ-এর উচ্চারণ আদিতে—খরা, খলা, খরে-খরে (অমসৃণ) খি, খড়, খবর, খড়কে, খাবল, খালা, খাচি।

খ-এর উচ্চারণ মধ্যে—রাখান, আখান<আখ্যান, বাখুল, বখা।

খ-এর উচ্চারণ অন্তে—বঁখ, আখ, চোখ।

'গ'-ধ্বনিটি কণ্ঠ্যধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ এবং তৃতীয় ব্যঞ্জনধ্বনি।

আদিতে—গতর=গাত্র; গরা=গৌরবর্ণ / ফর্সা / ইংরেজ; গড়া=ঢালু; গরাম =লৌকিক (গ্রাম্য) দেবতা; গজাল=পেরেক; গিদি=মাথার ঘিলু গাব=গর্ত; গড়্যা=ছোট পুকুর বা কুঁড়ে।

মধ্যে—বাগাল=রাখাল (যে গরু চরায়); আগাছা, আগ্ড়া।

অন্তে—কনবাগে=কোনদিকে; আগু=অগ্র; ঘুগু=ঘুঘু; বাগ=ব্যাঘ্র; কাগ=কাক; মাগ (স্ত্রী)।

'ঘ' কণ্ঠ্যধ্বনির চতুর্থ বা শেষ ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও ঘোষধ্বনি।

আদিতে—ঘুন্সী, ঘাগু, ঘড়া, ঘটি, ঘসর-ঘসর, ঘটাং-ঘট;

মধ্যে—বাঘুৎ=ব্যাঘ্র=লৌকিক দেবতা ব্যাঘ্ররায়।

অন্তে—মাঘুই—মাঘমাসের উৎসব। বাঘ, মাঘ।

২) **চ, ছ, জ, ঝ হ'ল তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি।**

'চ' তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—চং, চপা, চট্কা, চটক, চড়ক, চরা, চড়কা (বিদ্যুৎ)।

মধ্যে—খেঁচড় (রাগী); গচ্চা (ক্ষতিপূরণ); কঁচ্ড়া (মহুয়া ফল); কচ্লা (কাচা, ধৌত করা)।

অন্তে—খাম্‌চা=মুঠি ; খঁচ্‌=খোঁচা ; বঁচ=বৈঁচি ; ছঁচ্‌=গোবর দিয়ে ন্যাতা দেওয়া ; লাচ্‌=নৃত্য ; পশ্চাদ্‌ / কোথাও কোথাও আবার পশ্চাৎ=পিছা>পিচা ; কঁচ (কোনা) ; তুরুক>চুরুক ; বীজ> বীচ।

'ছ' তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—ছকা=সাঁতলানো / ভাজা, ছলা=ছলনা, ছটা=কিরণ, ছড়া= ছড়ানো, ছোট ছোট কবিতা, একগাছি।

মধ্যে—উছল ; অছুত ; কাছিম।

অন্তে—চাঁছি, মাছি।

'জ' তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির তৃতীয় ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—জলুই=পেরেক ; জুমড়া=অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ ; জনার=ভুট্টা ; জুড়া=লাগান, ঠাণ্ডা ; জড়=একত্রিত করা ; জবরা=জঞ্জাল ; জবড়-জং=কিম্ভূতকিমাকার।

মধ্যে—আঁজির ; পাঁজর ; গিজির পিটি=এলোমেলো ; সাজন্ত।

অন্তে—লাজ্‌ ; ভাজ ; রোজ ; খোঁজ ; সাজ।

'ঝ' চতুর্থ তালব্যধ্বনি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—ঝাঁপান, ঝলংঝপং, ঝড়া, ঝকমারী।

মধ্যে—ঝাঁঝরা, মেঝেন, ঝিঁঝট ঝিঁঝি, ওঝা, বোঝা।

অন্তে—সাঝ, মাঝ, ঝাঁঝ।

ট, ঠ, ড, ঢ এগুলি মূর্ধণ্যধ্বনি।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মতো বাঁকুড়া অঞ্চলের উপভাষাতেও মূর্ধণ্যধ্বনির প্রবণতা যথেষ্ট। এগুলিকে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনিও বলা হয়।

'ট' মূর্ধণ্য প্রথম ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—টং=অগ্রভাগ, ট্যাঁক রাগ, ট্যাঁপ=অহংকার / কাপড়ের অঞ্চল-প্রান্ত, টপ্‌=দ্রুত, টক=অম্ল।

মধ্যে—কট্‌রা=মাটির বাটি, মটকা=স্বাস্থ্যবান, একধরণের বস্ত্র, শটকা= গলায় আটকে যাওয়া ; লটকা=লেগে যায়, লটকন=সিঁথির মতো মাথার একধরণের অলংকার।

অন্তে—টিট্=ঠিক, বট=অব্যয়বিশেষ ; ঝট্=তাড়াতাড়ি, এছাড়া—টা'ট (পাতার ছাউনি), মট্, ফট, ঠাট, ঠিক, কট।

'ঠ' মূর্ধণ্যধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—ঠসক, ঠমক, ঠ্যাঁটা, ঠ্যালা, ঠেকা।

মধ্যে—কাঁঠা, গঠন, গঠাল, জেঠিমা।

অন্তে—কাঠ, জ্যৈষ্ঠ।

'ড' মূর্ধণ্যধ্বনির তৃতীয় ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—ডহর, ডবা, ডর, ডিবা, ডিংলা, ডাগর-ডেরখা।

মধ্যে—বড্ড, জাড্য।

অন্তে—বড্ড।

'ঢ' মূর্ধণ্যধ্বনি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—ঢং, ঢাঢর, ঢক্‌রা, ঢপ্, ঢিপি, ঢিল, ঢিমা।

মধ্যে—ঢিঢি, ঢঢ্ঢড় (ফাঁকা, অন্তঃসারশূন্য)।

অন্তে— ×

ত, থ, দ, ধ ধ্বনিগুলি দন্ত্যধ্বনির অন্তর্গত।

'ত' দন্ত্যধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—তলানি, তাগড়, তড়পা, তড়াক, তড়তড়া।

মধ্যে—বতর, পতর, তিতির, সতর (সতর্ক), লতর-পতর (নরম)।

অন্তে—রীত্, ভিত্, ছাত্, বিত (বিত্ত)।

'থ' দন্ত্যধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও অঘোষধ্বনি।

আদিতে—থপা, থাক দেওয়া, থাসা, থুবড়া।

মধ্যে—লিথম (নিতাম), সিথান (গোড়া, যেমন—মাথা সিথান), বাথান, থুথু।

অন্তে—কাঁথ (ভিৎ)।

'দ' তৃতীয় দন্ত্যধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—দম্‌কা, দামড়ানো, দমে।

মধ্যে—ভাদর, গিদের (গর্ব) মাদুর, পেঁদানো (ভুলিয়ে)।

অন্তে—ফাঁদ, বিঁদ, চাঁদ, কেঁদ, চঁদ (পদবী), ছাঁদ (ছন্দ)।

'ধ' চতুর্থ ও শেষ দন্তধ্বনি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—ধব (ফর্সা), ধড়ক্যা (হিসাব ; বে-ধড়ক্যা=বে-হিসাবী), ধসংধস্

(অগোছালো), ধ্যাপা (স্থূল), ধ্যাসাড়ে (একটানা)।

মধ্যে—ধুঁধুঁল, নধর, সাধু, মাধব, সাধক।

অন্তে—বধ্ (হত্যা), রোধ>রধ>রদ=বন্ধ, সাধ ।

প, ফ, ব, ভ, ম, ধ্বনিগুলি ওষ্ঠ্যধ্বনি।

'প' ধ্বনিটি ওষ্ঠ্যধ্বনির প্রথম ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—পং (অঙ্কুর), পরব (পর্ব, উৎসব), পতর (পাতা), পঁটা (কফ), পটকা (রোগা, বজি), পঁটলা (মোট)।

মধ্যে—ঢ্যাপসা (বৃহৎ), ফপড়া / ফপসা (ফাঁকা, শূন্য) চপ্‌রা (তর্ক), চপড়া (বড় মুড়ি), চপ্ (তেলেভাজা)।

অন্তে—গপ্‌গপ্, ঝাঁপ, সাপ, খাপ, ছাপ, চাপ।

'ফ' ধ্বনিটি ওষ্ঠ্যধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—ফক্কড়, ফপ্‌সা, ফুটানি, ফুলম্, ফুটা, ফাবড়া, ফিকা, ফিরকানি।

মধ্যে—উফাল (লাফ), ফাদের।

অন্তে—কফ্, পাফ্, লাফ্।

'ব' ধ্বনিটি ওষ্ঠ্যধ্বনির তৃতীয় ধ্বনি। অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণ।

আদিতে—ব (গা), ববা (বধির), বদা (বিস্বাদ), বড়াং (প্রচার)।

মধ্যে—জব্‌রা, ফাব্‌ড়া, ছিব্‌ড়ে, তবড়া, গোবর।

অন্তে—আব্, গাব্, ডাব, লারব।

'ভ' ধ্বনিটি ওষ্ঠ্যধ্বনির চতুর্থ ও শেয ধ্বনি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

আদিতে—ভড়ং, ভবক (সুগন্ধি), ভটভটি, ভ্যাঁদা (বোকা), ভ্যাক্ (বেহায়া), ভগালো (মোটাসোটা), ভাব্‌রা (ভাপযুক্ত দ্রব্য)।

মধ্যে—ভুড়ভুড়ি, ভট্‌ভটি, বেভার (ব্যবহার), স্বভাব।

অন্তে—লোভ>লুভ, ক্ষোভ।

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই পাঁচটি ধ্বনি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

'ঙ' ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যবহার করা হয়। এর বিকল্প বর্ণ হ'ল 'ং'। যথা—বাঙলা=বাংলা, রঙ=রং।—এছাড়া 'ং' ব্যবহৃত শব্দাবলী—ডিংলা, ডুংরি, চং, হেংলা, ভেংচি, তিড়িং-বিড়িং, চিংড়ি, জং, ভড়ং, সং, ব্যাং, ঠ্যাং।

'ঞ' ধ্বনিটি মল্লভূমী উপভাষায় বিশেষ ব্যবহৃত। এ অঞ্চলে নাসিক্য-

ধ্বনির ব্যবহারপ্রবণতা হেতু অধিকাংশ শব্দশেষে 'ঞ' ধ্বনিটি উচ্চারণ করা হয়। বানানের ক্ষেত্রে সবসময় 'ঞ' না লিখে ই, য়াঁ, য়েঁ, ইয়ঁ ইত্যাদি লেখা হয়। মধ্য-বাংলায় 'ঞ'র প্রয়োগ রয়েছে। যেমন—কাহাঞি। মল্লভূমের বিভিন্ন জায়গায় বলে খাঁয়্যে, যাঁয়্যে, কাঁহারিঞা (কাহার আজ্ঞা), করাঞি (কর্‌াঁই)।

'ন' ধ্বনিটি দন্ত্যবর্গীয় নাসিক্যধ্বনি। যথা—নাবাল্, ন্যাং, নিকা, নামলা (অসময়), নামো, নিখি (উকুনের ডিম), নাড় (বিধবা), নদী, নেঙ্গস (বিষাক্ত সাপ), ন্যাতা, নাময়, ন্যাড়া, ন্যাংটা।

'ম' ধ্বনিটি ওষ্ঠ্যবর্গীয় নাসিক্যধ্বনি। যথা—মোড়ে—ছোট; মেচুড়ি-পুঁইফল; ম্যাড়-কাঠামো (Structure), মাচা, মাড় (ভাতের ফ্যান), মচ (গোঁচ), ম্যাচা (একধরণের সন্দেশ), ম্যাচ (মাছের ডিম), মাড়ুলি (সকালবেলায় গৃহস্থের আঙ্গিনায় ও পূজামণ্ডপের সামনে গোবরের গোল প্রলেপ), মিন্‌ষা, মেমা (চিৎকার) মুদা, মাদুর।

শ, ষ, স, হ—এগুলি উষ্মধ্বনির পর্যায়ভুক্ত।

'শ' সাধারণ বাংলা ভাষার মতো এ অঞ্চলের উপভাষাতেও শ, ষ, স, হ,—এরক্ষেত্রে 'শ'-এর প্রাধান্য বেশী। যেমন—সিশে (শিশি) শাঁশ, পাঁচ, শাঁই (বাঁই), শুট্‌কি, শুক্‌না, শিষে।

'ষ' এবং **'স'**-এর ব্যবহার যে নেই তা নয়, তবে তুলনামূলকভাবে কম। যেমন—

মিন্‌ষা—'এ্যাত করে করি ঘর, তবু মিনষা বাসে পর।'
বিষ্—মুয়ে একটু মধু নাই, চব্বিশ-পহর বিষ ঝরছে।
ষাঁড়—খাচ্ছ-দাচ্ছ আর ধর্মের ষাঁড়ের মতো ধুমধুমাচ্ছ।
সক্‌ড়ি—দিলে ত নেড়ে সক্‌ড়ি হাতে।
সিপি (ছিপি/ঢাকনা)—শিশেটর সিপিটা খুল।
সিটা (টক, দাগ)—মেরে একবারে কালসিটে বসিঁই দিঁইছে।
—সিটা আমট খায়েঁ্য দাঁতট আমলে গেল।
সম্বরা—ডিংলার ঝলিট সম্বরা দিয়েঁ্য ছকে দাও।

'হ'—মল্লভূমী ভাষাঞ্চলে 'হ' ধ্বনির ব্যবহারবাহুল্য যথেষ্ট চোখে পড়ে। যেমন—বিয়া>বিহা, বেয়ান>বিহান, ডহর, ডাঁহা, ডিহি, বহাল, হদ্‌কা, (এগিয়ে পড়া) হেড়ল (বৃহৎ), হাঁপা (বিপদ) হাঁপাল (স্বাস্থ্যবান), হেতের> হাতিয়ার (লোহার অস্ত্রবিশেষ), হুচুক, হিড়িক, হাংলা, হিলহিলা, হুঁ।

'র'—কম্পিত ধ্বনি। যেমন—রগড়, রাং (মেটে), রং (তামাশা), রলা (রোলা, খুটি), রা (কথা), রঁদ (বেড়া), রুলি (হাতের অলংকার, বালা ; সরু খুঁটি), রগা (কুষ্ঠ), রীত্ (রীতি), রাখ্নী (রক্ষিতা), গতর (স্বাস্থ্য, দেহ)।

'ল'—পার্শ্বিক ধ্বনি। যেমন—ল্যাবা, ল্যালা, লাড়া, লবাত, লহ (রক্ত), লুড়কি (ছোট), লি (নয়), লং (লবঙ্গ), ল্যাদা, লদ্পদ্, লেঠা, লুতুপুতু।

'ড়', 'ঢ়'—তাড়িত ধ্বনি। 'ড়' তাড়িত অল্পপ্রাণ ধ্বনি। প্রয়োগ—গোড়ে>গড়্যা, ভড়ং, ঢঁড় (ঢোঁড়াসাপ), সুড়ং, মাড়, মাকড় (মর্কট), কাঁড়া, গাড়ল, গাড়, হিড়হিড়া।

'ঢ়'—তাড়িত মহাপ্রাণ ধ্বনি। প্রয়োগ—পিঁঢ়া, লাঢ়, লুঢ়া, বুঢ়া।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা

ক>খ ঃ—কন্দর>খন্দর ; কাঠি>খাটি ; কুক্কুট>কুক্ড়া ; কর্কশ> খস্খস্যা ; পুকুর>পখুর ; খুকু>খুখু ; তোকে>তোখে ;

গ>ঘ ঃ—পাগা (গরু বাঁধবার দড়ি)>পাঘা ;

চ>ছ ঃ—চঁচ্>চঁছ্ ; খঁচ্>খঁছ ; কাচা>কাছা ; কাঁচ্>কাছ ;

ট>ঠ ঃ—বটে>বঠে ; বটিন>বঠিন ; কাঁটাল>কাঁঠাল ; টুন্কি>ঠুনকি ;

ত>থ ঃ—হাত>হাথ ; তাতে>তাথে ; হতাম>হথাম ; ব্যস্ত>ব্যস্থ ;

প<ফ ঃ—পেঁপে>পেঁফে / পিঁফা ; পতঙ্গ হিন্দী ফতঙ্গ>ফড়িং আপেল>আফেল ; কপাল>কফাল ; কাপ>কাফ ;

জ>ঝ ঃ—বাঁজা>বাঁঝা ; মেজে>মেঝে ; মাজন>মাঝন ; সেদ্ধ / সিদ্ধ>সিজ ;

দ>ধ ঃ—দূর>ধূর ; দুস্থ>ধুস্ত ; দ্রিমি-দ্রিমি>ধিমি-ধিমি ;

ব>ভ ঃ—ডোবা>ডোভা ; সবাই>সভাই ; কবুতর>কভুতর ;

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির অল্পপ্রাণতা

খ>ক ঃ—ভিক্ষা / ভিখ>ভিক্কা / ভিক্ ; শাঁখা>শাঁকা ; সখ>সক্ ; সুখ>সুক্ , রুখু>রুকু ; রোখ্>রোক্ ; রাখ>রাক্ ; এখেন> একেন (উৎসব) ;

ছ>চ ঃ—কাছা>কাচা ; পিছন>পিচন ; ইচ্ছা>ইচ্চা ; কচ্ছে>কচ্চে ;
কিছু>কিচু ; কচ্ছপ>কাছিম>কাচিম্ ; যাচ্ছ>যাচ্চ ;
কুছ-পরোয়া>কুচ্ পরোয়া ;

ঠ>ট ঃ—কাঠ>কাট ; ঠাঁঠ>ঠাঁট ; ঠোঁঠ>ঠোঁট ;

থ>ত ঃ—গৃহস্থ>গৃহস্ত ; মাথা>মাতা ; উথলা>উতলা ; সাথী>সাতী ;
কাঁথা>কঁ্যাতা / কাঁতা ;

ফ>প ঃ—লাফ>লাপ ; লম্ফ>লম্প ; সাফ (পরিষ্কার)>সাপ ;

ঘ>গ ঃ—মাঘ>মাগ ; বাঘ>বাগ ;

ঝ>জ ঃ—সাঁঝ>সাঁজ ; মাঝ>মাজ ; মেঝেন>মেজেন ; ঝাঁঝ>ঝাঁজ ;

ধ>দ ঃ—দুধ>দুদ্ ; সাধ>সাদ্ ; বাঁধ>বাদ্ ; বন্ধন>বন্দন ;

ভ>ব ঃ—সভা>সবা ; কভু>কবু ; রম্ভা>রম্বা ; সন্দভ>সন্দব ;

অঘোষধ্বনির সঘোষপ্রবণতা

বক>বগ, শকুন>শগুন, উপকার>উব্গার, শাক>শাগ, কাক>কাগ, কুঠার>কুড়াল, দিক>দিগ, উপুড়>উবুড়।

ঘোষধ্বনির অঘোষপ্রবণতা

বীজ>বীচ, কূটজ>কুড়চি, ডুংরি>টুংরি, দণ্ড>ডণ্ড, দাঁড়া>ডাঁরা, বিপদ>বিপত্ সুবিধা>সুবিদা,

'ন'-এর 'ল' প্রবণতা

বাঁকুড়াঞ্চলের উপভাষায় 'ন'-এর স্থানে 'ল' উচ্চারণপ্রবণতা একটি বৈশিষ্ট্য। যথা—

ন>ল—নয়>লয়, নাচ>লাচ, নদী>লদী, নব্বই>লব্বই, নজর>লজর, নাতি>লাতি, নরম>লরম, নাগর>লাগর, নগদ>লগদ, নায়েক> লায়েক, নবীন>লবীন, ন্যাতা>ল্যাতা, নিতাই>লিতাই, নুব>লুব নাপিত>লাপিত।

আবার 'ল'-কে 'ন'-রূপে উচ্চারণ করার রীতিও যথেষ্ট আছে। যথা—ল>ন ঃ—
লম্বা>নম্বা, লাউ>নাউ, লংকা>নংকা, লম্ফ>নম্ফ / নম্প ; লাজ>নাজ, লাথি>নাথি, লোক>নোক, লোকসান>নোকসান / নুসকান, লাশ> নাশ / লাদ>নাদ, লবঙ্গ / লং>নবঙ্গ / নং ; লজ্জা>নজ্জা, লাল>নাল, লালু>নালু। 'নি'-উপসর্গ-যুক্ত শব্দে 'লি' ব্যবহার। যথা—নির্লজ্জ>লিলজ্জ ;

নির্বংশ>লিব্বংশ ; নির্বুদ্ধি>লিবুদ্ধি; নির্গুণ>লির্গুণ। নি-খাউকি>লি-খাউকি। নিধন্যা>লিধন্যা। একটি প্রবাদ—

লি-ধন্যার ধন হলে দিনে ত্যাখে তারা,
লি-ভাতারির ভাতার হলে বাসে বাপের পারা।

স্বরভক্তি—ভক্ত>ভক্‌ত ; প্রাণ>পরাণ / পেরান ; শ্রী>ছিরি ;

স্বরসঙ্গতি—কুড়াল>কুডুল ; বিলাতি>বিলিতি ; শকুনি>শুকুনি ; তুলসী>তুলুসী।

ব্যঞ্জনধ্বনি বিপর্যয়—বাতাস>বাসাত। ফ্যাকাসা>ফ্যাস্‌কা। লোকসান>লোসকান। একটু>টুয়েক / টুকহু।

এসব ছাড়া, ধ্বনিতত্ত্বনির্ভর উপায়গুলিকে বিশেষ কয়েকটি ভাগে ফেলা যেতে পারে। যেমন—ধ্বনিবদল বা ধ্বনিবিকল্পন (Sound-Substitution) শব্দটির গোড়ার বা অন্য জায়গার একটি ধ্বনি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য একটি (—উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি বা দূরবর্তী) ধ্বনি বসিয়ে দেওয়া হয়। কিংবা কখনো কখনো একগুচ্ছ শব্দের নানা ধ্বনিকে একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি দিয়ে স্থানচ্যুত করা হয়।

দ্বিতীয় উপায়টি হল ধ্বনি-সংযোগ। শব্দের মূল গঠনটি হয়ত ঠিক রইল, কিন্তু কোন কারণে বাইরে থেকে নতুন ধ্বনি এসে কোনো একটা জায়গায় জুড়ে গেল। (অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য ধ্বনির চেয়ে Syllable বা অক্ষরের সংযোগই বেশী হয়।) শব্দের প্রথমে জুড়ে যাওয়া ঐ অক্ষরে ধ্বনিগত পরিবর্তনের উদাহরণ বাংলা ভাষাতে খুব বেশী নেই, কিন্তু আমাদের মল্লভূমির ভাষাতে প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'ফ', 'ব' কিংবা 'চি' ধ্বনিটি। প্রতি শব্দের সঙ্গে এইসব ব্যঞ্জনস্বরের যুক্ত 'সিলেবেল'টি যুক্ত হচ্ছে—'আরফামি কিরফি করফব'—অর্থাৎ আমি কি করব। আর, 'চিআ চিজকে চিআ চিমি চিযা চিব'—অর্থাৎ আজকে আমি যাব।

তৃতীয় ধ্বনিনির্ভর উপায়টি হল শব্দের ধ্বনি বা সিলেবেলের ক্রমকে বিপর্যাস বা উলট্‌পালট্ করা। সমাজপ্রান্তের বিভিন্ন বৃত্তিগোষ্ঠী বা নিম্নসম্প্রদায়গত অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষায় এ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া গেছে। যেমন—'আন্দাজ' উচ্চারণে হয়ে যায় আন্‌জাদ, কিংবা বাতাস হয়ে যায় বাসাত।

এছাড়া বাঙালি বধূ বা শিশুদের ভাষায় ধ্বনিগত কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—'হক্কাল=সকাল। পিসি=তিতি। দিবে=দিগে। 'ছোট তিতি কাল হকালবেলায় তুমি একটা হাম দিগে' অর্থাৎ, 'ছোট পিসি কাল সকালবেলায় তুমি একটা আম দিবে।' গ্রামীণ বধূদের গুরুজনের নাম উচ্চারণে সংস্কার হেতু কালি=নালি। লক্ষ্মী=ফক্কি। হরি=ফরি। এমনকি শব্দের আদিবর্ণ উচ্চারণও নিষিদ্ধ তাই শ্বশুরের নাম যদি 'করাল' হয় কিংবা স্বামীর নাম যদি কালীচরণ হয় তাহলেও বধূ 'কাপাস' উচ্চারণ করে না বলে 'নাপাস'। যেমন—'ফক্কীপূজার প্রদীপে নাপাস তুলার সলতে কর।' অর্থাৎ 'লক্ষ্মীপূজার প্রদীপে কাপাস তুলার সলতে কর।'

ধ্বনি ও বর্ণের রূপ বিচার

কারক ও বিভক্তি

কারককে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(১) কর্তা, (২) কর্ম, (৩) করণ, (৪) সম্প্রদান, (৫) অপাদান ও (৬) অধিকরণ। এছাড়া আছে সম্বন্ধপদ।

কর্তাকারক—যার দ্বারা কোন কিছু কাজ সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ যে কাজ করে তাকে কর্তা বলে। কর্তাকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। অনেক জায়গায় কর্তায় অ, এ, য়, তে প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন দেখা যায়।

(ক) কর্তায় **প্রথমা** বিভক্তি বা **লুপ্ত** বিভক্তি—

আস্য **বিয়ান** খাঁয়্যে যাও পস্ত-চচ্চড়ি।
কেলটে ছোঁড়া বাঁশী বাজায় কদমগাছতলে।
হাত তিনেক ছেঁড়া **কানি** মা-বিটি টানাটানি।

(খ) কর্তায় **এ** বিভক্তি—

রতনে রতন চিনে ভালুকে চিনে শাঁকআলু।
কুকুরে পায় নাই পাত, **কাগে** খায় নাই ভাত।
বিড়ালে ভাং গেছ্যে হাঁড়ি বৌ-এর কি দোষ।

(গ) কর্তায় **তে** বিভক্তি—

বুলবুলিতে ধান খাঁয়েছ্যে খাজনা দুব কিসে।

কোন **সাপেতে** দংশিত তোকে না জানি মন্তর।

(ঘ) কর্তায় **য়** বিভক্তি—

লাভের গুড় **পিঁপড়ায়** খায়।

কালায় বাজায় আড় বাঁশী, মন করে আনচান।

শুধু **শাঁখায়** হাত দুখানি কেমন সেজেছে ছ্যাখ।

কর্মকারক—যে বস্তুকে অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে। কর্মকারকে প্রথমা ও সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

জামাই বলি এলি বুড় **কাঁড়া** লিলি ক্যানে?

আমারে না ডাক্যে **বঁধুরে** কে জাগালি বল্?

কর্মকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সকর্মক, (২) অকর্মক। সকর্মক ক্রিয়া আবার দুটি ভাগে বিভক্ত, যেমন—মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম। আর যে কর্মে বিভক্তির চিহ্ন থাকে সেটি গৌণকর্ম। যেমন—

ছা-টাকে লিয়ে বসল **দুধুভাতু** খাঁওয়াতে।

মুখ্য ও গৌণকর্মে বিভক্তিহীনতা—

কন্ বেহুলা **তুষু** লিবে, খুল গলার **চাঁদমালা**।

গড়্যার **গেঁড়ি** কুড়ায় আন বলি আমি **কাখে**।

হে **কন্যা** দান, মাথায় **কাপড়** টান।

সখী লিয়ে চল্ সখী চল্ টপা **মহুল** কুড়াতে।

অনেক সময় মুখ্যকর্মে **'কে'** বিভক্তির প্রয়োগ ঘটে। যেমন—

চাঁদকে সবাই বলে মামা, চাঁদের মামা ক্যা বটে?

বাগলিকে ভাই গড়িয়ে দুব সোনায় বাঁধা লাল ছড়ি।

আর যাব নাই **জলকে** আমি কদমতলার পাশ দিয়ে।

অকর্মক ক্রিয়া নামপদে **'অন'** প্রত্যয়যোগে সমধাতুজ কর্মপদ গঠিত হয়।

যেমন— এ্যামন **কিলন** (মুষ্টি) কিলাব যে জন্মের শোধ তুলে লুব।

এ্যাইসা **পালন** (নিয়ম) পাল্লি, মরে জীবন জুড়ালি।

করণ কারক—যার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণ কারক

বলে। যেমন—

যখন যার ভাগ্য খুলে ছাই **মুঠাতে** সনা ফলে।
মাগা (চাওয়া) **জিনিসে** আশ মিটে না।
পথের কুকুর মাড়েই (ভাতের ফ্যান) খুশী।
কাঁটাতে কাঁটা তুলা যায়।

করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি—

বেলা যে গেল আর কতক্ষণ **কোদাল** পাড়বে ?
(কোদাল দিয়ে মাটি কাটবে ?)

করণ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি—

সনার দিলম রতনচূড় তাও হারালি কপালগুণে।

করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি—

দুধে-আলতায় পা দিয়ে তুমু দাঁড়াল ঝলমলিয়ে।
ঝাঁটার **মুড়ায়** মার্যে মার্যে তুমার পীরিত ঘুচাব।

ক্রিয়া বিশেষণে 'এ' বিভক্তি—

ডাক্যে ডাক্যে ঘুম ভাঙ্গালম্।
বেজারে বেজারে (রাগতভাবে) চোখ খুললে।
চাল নামালম্ **রসে রসে** মুড়ি ভাজলম্ রগড়ে।

সম্প্রদান কারক—যার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা হয় কিংবা কোন কিছু দান করা বোঝায় তাকে বলে সম্প্রদান কারক। কর্মকারকের বিভক্তিচিহ্নই সম্প্রদান কারকে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

শিবকে পূজ ভক্তিভাবে।
গরীবকে দাও যতন করে।

অপাদান কারক—যা থেকে ক্রিয়ার কাজ সম্পাদিত হয়, তাকে বলে অপাদান কারক। যেমন—

'বাঁশের **চেয়ে** কঞ্চি দড়।'
ই-ধার **হতে** দিলম সাড়া, সাড়া গেল নামো পাড়া।
উপর **থেকে** পড়ল ছুরি, ছুরি বলে আমি ঘুরেই মরি।

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সাহা তাঁর 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা' গ্রন্থটিতে অপাদান কারক প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছেন, 'শুধু মানভূঁয়া ঝাড়খণ্ডীই নয়, ঝাড়খণ্ডের প্রায় সবকটি উপভাষাতেই 'লে' বিভক্তি চলে।' আমাদের আলোচ্যভূমি বাঁকুড়া

তথা মল্লভূমীয় উপভাষাও ঝাড়খণ্ডী ভাষার মতো অপাদান করকে **লে** বিভক্তি প্রয়োগ করে। যেমন—

মায়ের **লে** মাসীর দরদ।

পাহাড়-পর্বত **লে** নামাইলা কপিলা।

গাছের **লে** ফুল ঝরছ্যে কুড়াই বিহানবেলা।

অধিকরণ কারক—ক্রিয়ার আধারকেই বলে অধিকরণ। অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি ছাড়া এ, য়, তে, রে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়।

অধিকরণে **শূন্য** বিভক্তি—

কুলি কুলি জল যায় ছেল্যার হাতে ঘুনী।

উপরে গাঁয়ের বিটি তুমি **নামগাঁ** ক্যানে গেলে।

অধিকরণ কারককে তিন প্রকারে চিহ্নিত করা যায়। ১) দেশাধিকরণ, ২) কালাধিকরণ, ৩) ভাবাধিকরণ।

স্থানাধিকরণ / দেশাধিকরণে **এ** বিভক্তি—

প্যাটে খিদে **মুয়ে** লাজ।

উয়রে ভাদ বস্যে আছে **ছাঁচ্‌তলে** ট্যামক করে (রাগ/অহংকার করে)।

বাঁকুড়াতে দেখে এলম তুষু পূজার ধুম কত।

বিছানাতে জল গড়াল ভিজল খুকুর বিছানা।

কালাধিকরণে **এ** বিভক্তি—

সকালে ফুটেছে ফুল বিকালে কি থাকে।

ছেল্যকালে বিয়া দিয়েঁ্য কি ঝকমারী কর্যেছি।

বাঁধনা-পরবে আমরা মরি গরবে।

ভাবাধিকরণে **এ** বিভক্তি—

ভাদু আমার ভাদর মাসে ভাবের **ভাবনায়** বিভোর গো।

সূর্যোদয়ে পদ্মফুটে ই-কথা ত সবাই জানে।

দেশাধিকরণ ও কালাধিকরণে **কে** বিভক্তি—

আজ ফিরে যাও রসের নাগর **কালকে** আবার দিখা হবেক।

সেই **কব্‌কে** (কবে) গেইচে, আজও আসার নামটি নাই।

গাঁ-কে আল্য সরু শাখা তুষু বায়না ধর্যেছে।

ম্যাঘ দেখে মনে হচ্চে **আজকে** গুটেক জল হবেক।

দেশকে ইবার আকাল এলো চালের দর যে পাঁচটাকা।

অধিকরণে **য়** বিভক্তি—

'বাড়ীর **নামায়** নারকেলগাছটি ভারে ভারে সাজাব।
এক পয়সার পস্ত কিনে **চৌমাথায়** আজ ছড়াব।
কুলির জলে সিনান করে **ঝরকায়** চুল শুকাব।
ডাগর **খঁপায়** ফুল গুঁজে লে দেখবি ক্যামন সাজন্ত।

অধিকরণে **তে, এতে** বিভক্তি—

কুন খেরালি মন ভুলালি **ঘরেতে** মন রয় না।
মনেতে ভাবিয়া ছ্যাখ জলে তুমার ক্যা আছে।
বনেতে ফুটেছ্যে ফুল গন্ধ ম, ম, কর্যে গ।

অধিকরণে **রে** বিভক্তি। সাঁওতালী গানে **রে** বিভক্তির অধিক প্রাধান্য দেখা যায়। করম গানে—

'সরিষা কাটাই গেল **মাড়ুয়ারে** কি জাওয়া ডালিরে।'
'ঠাকুরাহি সিরিজালা গাইয়া **থোয়োরে**।'
'হুরিপাল হিরিফিরি নালিকুল **ধারেরে**—হড়ম আলা স্থতা জীউয়ী জয় রাগ।'

সম্বন্ধপদ—ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদের অন্বয় বা সংযোগ না থাকায় সম্বন্ধপদ কারক নয়। বিভিন্ন অর্থে সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ—

শূন্য বিভক্তি—

বিষ্টুপুর-ছুঁড়ি কিনল কলকাতাতে **পাট-শাড়া**।
(বিষ্টুপুর-ছুঁড়ি = বিষ্ণুপুরের মেয়ে ; পাট-শাড়ী = পাটের শাড়ী)।
বেলাতোড়ে **ধর্ম-গাজন, অযোধ্যা-দশহরা**।
(ধর্ম—গাজন = ধর্মঠাকুরের গাজন, অযোধ্যা-দশহরা = অযোধ্যার দশহরা উৎসব)।
ভর-**যৌবন বেলা,** পীরিতি বড় জ্বালা।
(ভর-যৌবন বেলা = ভরা যৌবনের সময়)।

'র' বিভক্তি—

আমার থুকু মান কর্য়েছে **মানের** কপাট খুল না।
বাঁকুড়ার গামছা, **বেলাতোড়ের** মেচা (সন্দেশ বিশেষ)।
বিষ্টুপুরের পাটের কাপড়, **রামপুরের** মেচা (উচ্চাসন)।
—'ইসব লিয়ে শ্বশুরঘরে যাবে তুমি চাচা।'

'আর' বিভক্তি—

খালভরা বাসে পর, **খালভরার** যাব নাই ঘর।

তুলুসতলার মাটি, মনে মানি খাঁটি।

ছাঁমড়াতলায় (ছাদনাতলায়) দেখ্যে এলম **কনিয়ার** বাপের বড় ট্যামক্‌।
(অহংকার)

গোবর গাড়ার জল গোবর গাড়াতেই যায়।

'এর' বিভক্তি—

বনের ফুল বনেই শুকালো।

ঘরের বউ পথে বেরুলো।

ধূরের কুটুম—খাতির তার বেশী হবেই।

আগডালের ডাঁসা আঞ্জির আগেভাগে পেড়ো না।

'কের' বিভক্তি—

—**কত্‌কের** জিনিস ? (কতদামের জিনিস ?)

—**যতকের** বুলবি। (যতদামের বলবি।)

—**আজকের** বটে ত (আজকের হবে তো)

—লয় ত কি **কালকের**। (নয় তো কি কালকের ?)

সাঁওতালী ভাষায়—

বনকেরি আগুন (বনের আগুন)

মাএকেরি দুধু (মায়ের দুধ)

ক্ষেতকেরি মাটি (ক্ষেতের মাটি)

বনকেরি বাহা (বনের ফুল)

'কা' বিভক্তি—

ডুংরি কা ধারে, মহুল পাড়ে ক্যা রে।

সবই **ভগবানকা** খেলা।

সেহি জোতে বাঁধব **কপিলাকা** পুত।'

'কার' বিভক্তি—

যাচ্ছ কন্যা দিয়ে যাও গ **সমবছরকার** ঋণ সুদে।

ই **বছরকার** নামি বর্ষায় সনা ফলবেক লকলকিয়ে।

সুবাইকার তরে সুবাই করলে ভাবনা কি আর এ্যাই সংসারে।

নানাপ্রকার সম্বন্ধ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ যেমন—

কর্তৃসম্বন্ধ—রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ।

কর্মসম্বন্ধ—মনসার পূজা।

করণ সম্বন্ধ—হালের চাষ।

সম্প্রদান সম্বন্ধ—পূজার ফুল।

অপাদান সম্বন্ধ—ডানের ভয় (ডাইনির ভয়)

অধিকরণ সম্বন্ধ—গাঁয়ের লোক।

অন্যান্য—

ঝারিকে পানি (ঝারির জল)

হাথকে ফুল (হাতের ফুল)

লি-লাজক লাজ নাই (নির্লজ্জের লজ্জা নেই)

গতর খাউকিক বড় গলা। (গালি অর্থে। গতরখাকির বড় গলা)

বাকর ঘর। (বাবার ঘর)।

নামধাতু

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চলের উপভাষায় নামধাতুর প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণে ৩২১ পৃষ্ঠায় ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন, 'রাঢ়ীর পশ্চিম অঞ্চলে নামধাতুর প্রতি পক্ষপাত সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট।'[১] কাজেই এ অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত নামধাতুগুলির রূপকৌশল রাঢ়ীয় ভাষারীতির মতই। অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ (পদের) উত্তর 'আ', 'আন'-প্রত্যয় যোগে গঠিত। যেমন—

বিশেষ্য

অম্ল>অমলাই, আমলায় ;

আলস্য>আল্‌সা, আলসানো ;

ঈর্ষা>রিষা>রিষাই ;

কোদাল>কদ্‌লানো, কদ্‌লায় ; কচ্>কচাই>কুচাই ;

কাঠ>কাঠাই ; কঁচড়>কঁচড়ায় ; কিল>কিলাই ;

খাবল>খাব্‌লায় ; খুঁট>খুঁটায় ; ক্ষয়>খয়>খুয়াই / খোয়াই ;

খঁচ্>খঁচায় ;

গাৰল>গাবলায় ; গাড় (গর্ত)>গাড়ায় ; গাঁঠ>গাঠায় / গিঁঠায় ;

গুঁতা>গুঁতান ; গাঁইতি>গাঁইতায় ; গাদা>গাদায়>গাদানো ;
ঘৃণা>ঘিনা>ঘিনায় ;

চাপড়>চাপড়ায় ; চড়>চড়ায় ; চিট>চিটায়>চিটানো ; চোট>চটাই ; চথা>চথায়।

ছাপ>ছাপায় ; ছ্যার>ছ্যারায় ; ছলক>ছলকায় ;

জুতা>জুতানো ; জংলা>জংলায় ; জমা>জমায়>জমানো ; জাড়>জাড়ায়>জাড়ানো ;

ঝলক>ঝলকায়>ঝলকানো ; ঝাড়>ঝাড়ায় ; ঝালি>ঝালায়>ঝালানো ;

টাল>টালানো ; ঠুঁটি>ঠটিয়াই>ঠুঁটিয়াই>ঠেঁটো ; ঠক্কর>ঠক্‌রানো ;

ডিং>ডিংগায়>ডিংগানো ; ডিম/ডিমা>ডিমালি ; ডহর>ডহরাই ;

ঢেলা>ঢেলায়>ঢিলানো ; ঢিপি>ঢিপাই ;

ত্যাল>ত্যালানো ;

থুতি>থতনা>থতনায়>থতনানো ; থান>থানায় ;

দাঁত>দাঁতায়>দাঁতানো ; দোষ>দোষালি>দোষানো ;

ধস্‌>ধস্‌কায় ; ধুঁয়া>ধুঁয়ানো ;

পাথর>পাথরা ; ফাবড়>ফাবড়ানো ফাবড়া ; ফালি>ফালানো ;

বিয়া>বিয়ানো ; বাঁদর>বাঁদরানো ; ব্যথা>ব্যথানো ;

ভুলুক>ভুলকাই ; ভাঁড়>ভাঁড়ানো ;

মোচড়>মোচড়ানো, মুত্‌>মুতায়>মুতানো ;

যুত>যুতাও ;

রুচা/রুচি>রুচায় ; রক্ত>রক্তায় ;

লেলা>লেলানো ; লেংড়া>লেংড়ানো ; লোভ>লোভা>লোভানো ;

লাথি>লাথায়>লাথানো ;

বিজুলি>বিজলায় ;

হুংকার / হাঁকার>হাঁক্‌রায়>হাঁকরানো ; হিংসা>হিংসানো ; হাত>হাতানো ;

বিশেষণ—উত্থ>উথলায়>উথ্‌লানো ;

চিকন>চেক্‌নায় ; ঠাণ্ডা>ঠাণ্ডায় ;

বুড়া>বুড়ায় ; বারমাস>বারমাস্যা / বারমেসা ;

রোগা>রোগাটে / রোগানো ; রুগ্ন>রুগ্‌নানো ,

তিক্ত / তিত>তিক্তায় / তিতায় ;

থুবড়>থুবড়ায় ; থাপ্পড়>থাপড়ায় ;

ধুমসা>ধুমসানো ; ধ্যাবড়া>ধ্যাবড়ানো ;

ডাঁশা>ডাঁশানো ; ডগ্‌ডগে>ডগডগায় ; শক্ত>শক্তায় ;

ধ্বন্যাত্মক শব্দে নামধাতুর রূপলাভ

কন্‌কন্—কন্‌কনায় ; কল্‌কল্—কল্‌কলায় ; কট্‌কট্—কট্‌কটায় ; করকর—করকরায় ; কচ্‌কচ্—কচ্‌কচায় ;

খল্‌খল—খলখলায় / খল্‌খলানো ; খিল্‌খিল—খিল্‌খিলায়ঁ ; খড়খড়—খড়খড়্যা ; খটখট—খটখটায় ;

গড়গড়—গড়গড়্যায় ; গটগট—গটগট্যায় ; গম্‌গম্—গমগমায় ; গরগর—গরগরায়ঁ / গুরগুরাই ; গুড়গুড়=গুড়গুড়্যা ;

ঘুটঘুট—ঘুটঘুট্যা ; ঘচ্‌ঘচ্—ঘচঘচ্যায় ;

চপ্‌চপ্—চপ্‌চপ্যা ; চিক্‌চিক্—চিক্‌চিক্যা / চিক্‌চিকায় ;

ছপ্‌ছপ্—ছপ্‌ছপ্যায়ঁ ; ছুক্‌ছুক্—ছুক্‌ছুক্যায় ; ছ্যাঁৎছ্যাঁৎ—ছ্যাঁৎছ্যাতায়।

ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝমায় ; ঝাঁ ঝাঁ—ঝাঁঝানো ;

টপ্‌টপ্—টপ্‌টপায় ; টুপ্‌টুপ—টুপ্‌টুপায়ঁ ; টুস্‌টুস্—টুসটুস্যা ;

ঠক্‌ঠক্—ঠক্‌ঠক্যা ; ঠুকঠুক—ঠুকঠুকায় ;

ঢুক্‌ঢুক—ঢুকঢুকায় ; ঢুলঢুল্—ঢুলঢুলায় ; ঢুম্‌ঢুম্—ঢুমঢুমায় ;

তপ্‌তপ্—তপতপা ; তল্‌তল—তলতল্যা ;

থলথল—থলথল্যা ; থুপথুপ—থুপথুপ্যায়ঁ ।

দম্‌দম্—দমদমায় ; দুলদুল—দুলদুলায় ; দড়দড়—দড়দড়ায়ঁ ;

ধপ্‌ধপ্—ধপধপায় , ধড়ধড়—ধড়ধড়ায় ; ধুমধুম—ধুমধুমায় ;

নড়নড়=নড়নড়ায় ; নত্‌নত্—নতনতে / নতনতায় ;

পক্‌পক্—পকপকায় ; পত্‌পত্—পতপতায় ; প্যালপ্যাল—প্যালপ্যালায় ;

ফদ্‌ফদ্—ফদ্‌ফদায়, ফড়ফড়—ফড়ফড়্যা ; ফক্‌ফক্—ফকফক্যায় ;

ব্যাড়ব্যাড়—ব্যাড়ব্যাড়্যা ; বিড়বিড়-বিড়বিড়্যায়ঁ ; বিদ্‌বিদ—বিদ্‌বিদ্যায় ;

ভক্‌ভক্—ভকভকায় ; ভনভন—ভনভনায় , ভদ্‌ভদ্—ভদ্‌ভদা ;

মড়মড়্—মড়মড়ায় ; ম্যাজম্যাজ—ম্যাজম্যাজাই ;

যবযব—যবযবা / যবযবানো ;

রম্‌রম্—রমরমা ; রং রং—রং রঙ্গ্যা ;
লকলক্—লক্‌লক্যা, লক্‌লকানো ; লত্‌লত-লতলত্যা ;
শন্‌শান্—শনশনাই ;
সড়সড়—সড়সড়্যা ; সপ্‌সপ্—সপ্‌সপ্যাই ;
হিড়হিড়—হিড়হিড়্যায় ; হদ্‌হদ্—হদ্‌হদায় ; হুড়হুড়—হুড়হুড়ায় ; হিল্‌হিল্—হিলহিলায়।

একই ধ্বনির দ্বিত্ব প্রকাশ ছাড়াও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহু ব্যবহার আছে। যেমন—

কড়মড়, বদ্‌খদ, গুবগুবানো, আটুপাটু, লটপট, খচ্‌মচ্, তিড়বিড়, রিম্‌ঝিম্, খসর-মসর, ঝিঁলির-মিলির, তড়বড়।

বিদেশী শব্দে নামধাতুর প্রয়োগ

কাহিল=কাহিলই, কবুল=কব্‌লা, কায়দা=কায়দাব, খতম=খতমই, গরম=গরমই, বদল=বদলা, নরম=নরমাও, সাবান=সাবানই।

লিঙ্গ

'অ'-কারান্ত পুরুষবাচক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ

অবুঝার—অবুঝারী ; আমার তুমু অবুঝারী বুঝাও হে বংশীধারী।
জ্ঞানমান—জ্ঞানমানী ; এ্যাতগুলান বিটি হলে কি হবেক স্বাই জ্ঞানমানী।

'আ'-কারান্ত পুরুষবাচক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ

বেটা-বেটি ; পাঁঠা-পাঁঠি ; ছোঁড়া-ছুঁড়ি, খাঁদা-খাঁদি ; হেংলা-হেংলি, কঁকা-কঁকি ; খোকা-খুকি ; ঢেঙ্গা-ঢেঙ্গি ; নেড়া-নেড়ি ; ল্যাংড়া-লেংড়ি ; থুবড়া-থুবড়ি, বড়কা-বড়কি ; আঁটকুড়া-আঁটকুড়ি ; খালভরা-খালভরি ; ডুমকা-ডুমকি।

'উ'-কারান্ত পুরুষবাচক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ

পুটু-পুটি ; মোটু-মুটি, মুট্‌কি ; রামু-রামী ; পুচু-পুচি ; লুদু-লুদী ; খুদু-খুদি ; নুনু-নুনি ; চুনু-চুনি।

'নি' 'নী'-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ / 'ইনী' প্রত্যয়

ডোম-ডোমনী ; লাতি-লাত্‌নী ; ধোবা-ধোবানি ; কুইলা-কুইলানি ; বাগালি-বাগালিনী।

'আনী'-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ

কুচুটে-কুচুটানি ; নাপিত-নাপ্‌তানি ; হাঁড়ি-হাঁড়িয়ানি ; ভূমিজ-ভূমিজানী ; মাহাত-মাহাতানী।

'ইন'-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ

বাউরি-বাউরিণী ; সাঁওতাল-সাঁওতালিন্ ; মাঝি-মাঝিন/মেঝান ; গোপ-গোপিন্ ; মালী-মালীন।

'স্ত্রী'-শব্দে লিঙ্গ পরিবর্তন

বেটাছেলে-বিটিছেলে ; মরদমানুষ-মেয়ামানুষ ; পুলিশ-মেয়েপুলিশ ; ডাক্তার-মেয়ে ডাক্তার।

আলাদা আলাদা শব্দে লিঙ্গ নির্দেশ

বর-কনে/কইন্যা ; মুনিষ-কামিন ; জামাই-বিটি ; মরদ-মেয়া ; বাপ-মাই ; স্বামী-স্ত্রী ; বেটা-বৌ।

বচন

'গুলা', 'গুলান' বিভক্তি যোগে বহুবচন। যেমন—

ছা—একটি ছেলে ; ছাগুলা / ছাগুলান—অনেক ছেলে ;

বেটা—বেটাগুলা / বেটাগুলান ;

—বেটাছাগুলান বড্ড চিল্লাচ্ছে।

'রা' বিভক্তিটির মূল ষষ্ঠী 'কর' বিভক্তি যোগে বহুবচন। যেমন—

বিটিছারা = বিটিছা + রা ;

—ডাগর ডাগর বিটিছারা মুচ্‌ক মুচ্‌ক হাসে।

ছেলেপুলেরা = ছেলেপুলে + রা ;

—আয়রে আয় ছেলেপুলেরা মেলা দেখতে যাবি।

এছাড়া, তুমি + রা = তোমরা, আমি + রা = আমরা।

'দের' বিভক্তি যোগে

বাজ্যিকার + দের = বাজ্যিকারদের > বাইজাদের ;

নাচ্‌নী + দের = নাচ্‌নীদের ;

—**বাইজাদের** (বাজ্যকারদের) দই, চিঁড়া, নাচ্‌নীদের পান
এগু তুমি যোগাড় কর, পরে হবেক গান।

'বহুত্ব'বাচক বা **'সমূহ'**বাচক বিশেষণ যোগে

সব লোককে পার করিতে লুব আনা আনা
শ্রীমতীকে পার করিতে লুব কানের সনা।
অনেকদিনের ভালবাসা আজকে হ'ল জানাজানি।
যতগা (যতগুলো) মাগবি (চাইবি) **ততগা** (ততগুলো) পাবি।

'দম' 'দমে' বিশেষণ যোগে—

দমে খাবি আর **দমতক** কাজ করবি।

'গেদে' যোগে বহুবচন—

আজ রাতভর **গেদে** জল হচ্চে। **গেদে** খাঁয়েলে।
সিনিমার ই বইটায় **গেদে** ভিড় হচ্ছে।
ঠাণ্ডা বতরে (ঠাণ্ডা হাওয়ায়) **গেদে** ঘুম হবেক।

'খাতা' যোগে বহুবচন—

শাড়ি আল্য **খাতা খাতা** ভাসুর মাথায় ধর ছাতা।
মৌ উড়ছে **খাতা খাতা** মৌচাকেতে বাঁধবে বাসা।

'গুচ্চার' 'গুচ্ছেক' যোগ করে বহুবচন—

—আজ ইটা উটা খাওয়া হইছে **গাদা-গুচ্চার** রেঁধো না।
—**গুচ্ছেক** লোক ডেকে কি হবে।

'বনী' যোগে (বনী=বন)

শালবনী, জামবনী, ধ-বনী, কাঁটাবনী-ইত্যাদি (বহু শালগাছ, বা জামগাছ আছে এই অর্থে।)

বিশেষ্য-বিশেষণ-অসমাপিকার দ্বিরুক্তিতে

জালি জালি তুলবে কাল্লা ; মহুল পড়ে টপা টপা ; কলি কলি ফুল তুল না ; ছাব্‌কা ছাব্‌কা পিঠা গড় ; জনে জনে বসে পড় ; জ্যান্ত জ্যান্ত মাছ আনবে ; 'হার' বা 'আলি' জাত 'হালা' শব্দের দ্বিরুক্তিতে—

মাছ ধরি হালা হালা।
হালা হালা বনফুলের মালা।
সন্দেশ খাব হালা হালা।

অনুসর্গ ও উপসর্গ

নাম অনুসর্গ—নামপদ কিংবা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ কখন কখন অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়।

আগু=(অগ্র, অপাদান+অধিকরণ কারক)

আগু তুমি যাবে, পেছু আমি যাব।

উপর=(উপরি, অধিকরণ কারক)

উপর পাটা নাম পাটা আসতে যাতে ঠুকায় মাথা।

কাছ=(নিকট, অপাদান+অধিকরণ কারক)

মনের দুখ্‌খু চাপতে লারি কইব আমি কার কাছে?

কাজ=(কার্য, চতুর্থী বিভক্তি)

কাজে কাজে বেলা হ'ল মু' করো না (বকুনি দিও না) তুমরা গ।

ছামু=(সম্মুখ, দ্বিতীয়া+সপ্তমী)

—ছামুপানে ভেলে যাবে, দেখ হুঁচুট খেও না।

—দাঁড়াও আমার ছামুতে শ্যাম দেখি নয়ন ভরে।

টাক, টেক্‌=(পরিমাণ, অন্তক, ষষ্ঠী বিভক্তি)

ঘণ্টাটাক সবুর কর। পুয়াটেক চাল হলেই হবেক।

ঠিকে, ঠাঁই=(নিকটে, দিকে)

'পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ী জাঁও।' কৃ, কী,

কনঠিকে যাবি? কার ঠিকে থাকবি?

তক=(পর্যন্ত, দ্বিতীয়া বিভক্তি)

ভোজঘরে গলাতক খেয়ে পেটটা চড়চড় করছে।

বেলাতক আর ঘুমায়ো না।

তরে=(জন্যে, চতুর্থী বিভক্তি)

উয়ার তরে ঢাকাই শাড়ী আমার তরে ছিঁড়া কানি?

থান, থানে=(স্থান, সপ্তমী বিভক্তি)

ঠাকুরথানে মাথা ঠেকাও।

তুলুসথানে পিদিম দাও।

দিগে, দিকে=(দিক, দ্বিতীয়া বিভক্তি)

'বাড়ীর দিকের লাউ-এর ডগা কুলির দিকে যায়।

ধার=(দিকে, সপ্তমী বিভক্তি)

নদীর ধারে হাট বসেছে।

পেছু=(পশ্চাৎ, চতুর্থী বিভক্তি)

পেছু পেছু যাচ্ছ কুথায়?

পাশ=(পার্শ্ব, দ্বিতীয়া বিভক্তি, 'চতুর্থী বিভক্তি) ও সপ্তমী বিভক্তি

ইয়ের পাশে উ দেখে শুনে গু।

বিনু, বিহন, বিহনে=(ছাড়া, ভিন্ন, পঞ্চমী বিভক্তি)

জল বিনু মাছ থাকে না। কিষ্ট বিহনে রাই বাঁচে না।

ভিতর=(অভ্যন্তর, সপ্তমী বিভক্তি)

ঘরের ভিতর ঘর নাচে কনে বর।

মাঝু=(মধ্য, সপ্তমী বিভক্তি)

আগু লয়, পেছু লয় মাঝু মাঝ্ যাবি।

লেগে=(জন্যে, চতুর্থী বিভক্তি)

যাবার লেগে বায়না ধর না।

সঙ্গে / সঁগে=(সঙ্গ, তৃতীয়া বিভক্তি)

যাই দিব অঙ্গে, তাই যাবেক সঙ্গে।

অ সই, তুমার সঁগে যাব আমি যমুনারই কুলে গ।

সমেত=(সহ, তৃতীয়া বিভক্তি)

ছা সমেত মাকে ছাড়্যে দে।

ফুলসমেত ডালটা ভাঙ্গিস্ না।

সাথে=(সহ, চতুর্থী বিভক্তি)

সঙ্গে সাথে মিলেমিশে কাজকর্টা করে্য লে।

অ ঠান্‌দি, সাথে লিয়ে ছেলা বুড়া যাচ্ছ নাকি চণ্ডীতলা।

অসমাপিকা অনুসর্গ—

করি=(√ কর, তৃতীয়া); কি করি র'াধিবি বাছা এ্যাত জনের রান্না।

ছাড়ি=(? ছড্ডই, ছড্ডই, পঞ্চমী); তোমা ছাড়ি থাকতে লারি।

থাকি=(√ থাক্, পঞ্চমী); বন থেকে বেরাল্য হাতী লটকা লটকা কান।

—রাজার দ্যাশ বিষ্টুপুর উথান থেকে বহুদূর।

লাগি=লেগে (√ লাগ্ চতুর্থী বিভক্তি)।

মিনসের লাগি এত করি তবু মিনসের মন ভরে না।

এ্যাকটি মাত্র শাড়ীর লেগে এ্যাত ক্যান ঝকমারি।

কোন কোন এলাকায় 'লেগে'>'নেগে' রূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা—

তুর নেগে (লেগে—জন্যে) বাগুন পোড়া

খায়েঁ্য টুকুন মু-ছাড়া (মুখকে ছাড়া)।

উপসর্গ

এ অঞ্চলের সংগৃহীত উপসর্গগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১) তৎসম, ২) শব্দস্থানীয়, ৩) বিদেশী উপসর্গ।

১) তৎসম উপসর্গ—

'অ'—(স্বার্থিক অর্থে)

অ-ঢেল = অনেক, অ-টুট = শক্ত, মজবুত।

'অ'—নঞ্ অর্থে

অ-খাদ্য, অ-কাল, অ-গুণতি, অ-সটা, অ-খেদ, অ-ঠেকা, অ-পুবা (অ-প্রভাত), অ-খেকো।

'অন্'—(বিশিষ্টার্থক রূপে)

অন্‌হেলা = অবহেলা, অন্‌বেলা = অবেলা, অন্‌পড় = মূর্খ।

'অব্'—(অপ্ অর্থে)

অব্‌গুন, অব্‌গড়ন (অপ্-গঠন, বিকৃত)

'আ'—(স্বার্থিক অর্থে)

আবাল, আসমুদ্র, আপাদমস্তক।

'নি'—(নঞ অর্থে)

নি-কড়িয়া (যার কড়ি নাই), নি-খাউকি (যে খায় না), নি-গন্ধী, নি-গতরী, নি-গুণিয়া, নি-চুলা, নি-লজ্জা।

'পতি'—(প্রতি অর্থে)

পতিফল = উপযুক্ত ফল ; পতিহিংসা, পতিদান।

'লি' / 'নি'—(নঞ্ অর্থে)

লিধন্যা (অলক্ষ্মী), লিভাতারি (গালি অর্থে—বিধবা) লিলজ্জ (নির্লজ্জ), লি-মেগো (গালি অর্থে-বিপত্নীক)

২) শব্দস্থানীয় উপসর্গ। (সমাস সম্বন্ধীয়)—

'আগ—(অগ্র অর্থে)

আগডাল, আগবাড়ানো, আগবেলা, আগদাঁত বা আগদেঁতো।

ব্যবহার—'আগডালে বস কোকিল, ডাক মধুর স্বরে।'

'অ ভালবাসা তুর আগদাঁতে ভমর বসা।'

'আড়'—(অর্ধ অর্থে)

আড় বাঁশ, আড়-কালা, আড়-খেপা, আড়-বেলা, আড়বোংগা।

'আধ'—(অর্ধ অর্থে)

আধবুড়া, আধবয়সী, আধখেকো, আধপাকা, আধপুড়া।

'আধা'—(অর্ধ>আধ+আ)

আধাদিন, আধামাস, আধামাইনা আধাকাজ, আধাবাট (অর্ধপথ), আধা পেট।

ব্যবহার—'জামাই যখন আধাবাটে, বিটি তখন পখুরঘাটে।

'আন্'—(অন্য অর্থে)

আন্‌মনা, আন্‌দিন, আন্‌খবর, আন্‌কাজ।

ড্যাঁক—(অর্ধ অর্থে)

ড্যাঁক-সিজা (অর্ধসিদ্ধ)

প্রয়োগ—ড্যাঁক-সিজা ভাত, দেখে মাথায় হাত।

'দর' / 'দড়'—(অর্ধ অর্থে)

দরকচা / দড়কচা, যেমন—দড়কচা আম, দড়কচা চেহারা।

প্রয়োগ—দিনরাত খেটে খেটে চেহারাটা অমন দরকচা মেরে গেছে।

'দেড়'—(দ্বি-অর্ধ অর্থে)

দেড়হাতি, দেড়ফুটে, দেড়গুছি, দেড় আঙ্গুলে।

'নাম'—(নীচু অর্থে)

নাম-পাড়া, নামকুলি, নামজাত, নাম-বাঁকুড়ো।

'নিত্'—(চিরকাল অর্থে)

নিত্‌রুগী, নিত্‌ভোগী, কিন্তু নিত্‌কোনে বা নিত্‌বর অর্থে কনে অনুরূপ ও বরের অনুরূপ বোঝায়।

প্রয়োগ—নিত্‌ভোগী হয়ে হয়ে নিত্‌রোগী হয়ে যেও না।

৩) বিদেশী উপসর্গ

'বে'—(ঠিক নয় / ঠিকানাবিহীন)

বে-জাত, বে-আক্কেল, বে-চাল, বে-পাত্তা।

'লা'—(না অর্থে)

লা-পাত্তা / লি-পাত্তা (নিখোঁজ)

লা-খাউকা / লি-খাউকা (অভুক্ত)।

'হর'—(প্রত্যেক অর্থে)

হরকাজ, হরদিন, হরদম, হরকথা।

'হাফ>হাপ (অর্ধ অর্থে)

হাপহাতা, হাপছুটী, হাপ ইস্কুল, হাফপ্যাণ্ট।

'হেড'—(প্রধান অর্থে)

হেড পণ্ডিত, হেড মুরুব্বি, হেডপাণ্ডা, হেডমিস্তিরি।

প্রত্যয়

প্রত্যয় তিন প্রকার (১) কৃৎ প্রত্যয়, (২) তদ্ধিত প্রত্যয় (৩) বিদেশী প্রত্যয়।

(১) কৃৎ প্রত্যয়

অন্—

মাগন (মাগ্+অন)=চাওয়া ;

মাগনের ছেলে ঝোঁক তো হবেই।

গড়ন (গড়্+অন)=গঠন ;—আহা, মুখের **গড়নটি** ঠিক দুগ্গার মত।

জ্বলন (জ্বল+অন)=জ্বালা—তুর কথার বড্ড **জ্বলন**।

উড়ন (উড়্+অন)=ওড়া—মন হল্য আজ **উড়ন** পাখী।

মরণ (মর্+অন)=মরা—দুরদুর তোর **মরণ**ও হয় না।

'অনা'—(অন্ত+আ) ;

কুট্না (কাট্>কুট+অনা)—**কুট্না** কাটি, **বাট্না** বাটি তবে ত রান্না।

বাট্না (বাট্+অনা)

ফুট্না (ফুট্+অনা)=ফুল তুলবি **ফুট্না ফুট্না**।

চাখ্না (চাখ্+অনা)='দে নারে ছলাভাজা মদের টুক্‌হু চালনা।'

চাট্না (চাট্+অনা)=লোভী=তু আচ্ছা **চাট্না** বটিস্।

'অনী'—

গাঁথনী (গাঁথ্+অনী)—ঘরের **গাঁথনীটা** আগে মজবুত কর।

খাউনী (খা+অনী)—আমার তুষু পান **খাউনী** একশ পানে আঁটে না।

দুলুনী (দুল্+অনী)=অ, মা, আমার লোলক দুলুনী বিটি যে গো।

এরকম—তুলুনী, রাঘনী, (রক্ষিতা), মাজুনী, দেখনী।

'অন্তী'—

দেখ্+অন্তী—দেখন্তী ; যেমন—**করন্তীর** লাজ নাই **দেখন্তীর** লাজ।

কর্+অন্তী=করন্তী ; হস্+অন্তী=হসন্তী।

'আ'—

গল্+আ=গলা, ঘাঁট্+আ=ঘাঁটা, খাট+আ=খাটা, ছিঁদ্+আ=ছিঁদ/ছেঁদা, ধর্+আ=ধরা, ছেঁক্+আ=ছেঁকা, মর্দ>মাড়্+আ=মাড়া, কাড়+আ=কাড়া।

'আই'—

কাট+আই=কাটাই ; সেরকম—বাছাই, মাড়াই, ঝাড়াই, কাড়াই, ছাঁটাই।

'আট'—

ঘুর্+আট ; **ঘুরাট** পথে না গিয়ে সজা পথে চ।

সেরকম—ধরাট, ভরাট, জমাট।

'আটি'—

ধর্+আটি=ধরাটি ; খাওয়া-দাওয়ায় একটু **ধরাটি** করা ভাল।

ভর্+আটি=ভরাটি, জম্+আটি=জমাটি, ঘুর+আটি=ঘুরাটি।

আতি / 'আতী'—(বৃত্তিক অর্থে)

ভাচাতি (ভাচা+আতি)=যে স্ত্রীলোকের বৃত্তিগত পেশা ধান বা চিড়া ভানা (ভাঙ্গা)।

ব্যবহার—চার সের ধান ভানতে কতই বা **ভাচাতি** লাগবে !

কিংবা—**ভাচাতি** বৌকে একবার ডেকে আন চিড়ের বায়না দুব।

'আন'—

কাটান্ (কাট+আন), কাড়ান (কড়্ঢ়>কাঢ়+আন), এরকম, গড়ান, বিছান, ছিটান, ঝাড়ান, সিঁটান।

'আনী' (অন্ত+ঈ)—

মাড়ানী, ঝাড়ানী, উঠানী, বসানী, ছাড়ানী, কাড়ানী।

'আর' (কার)—

অ+বুঝ+আর / কার=অবুঝকার ;

প্রয়োগ—তুমি বড্ড **অ-বুঝকার** লোক হে।

আলি—

জাইগ্যালি>জাগলি=জাগ+আলি।

ভোরেই কুইল্যা ডাইক্যা ডাইক্যা ঘুমন্ত রাই **জাইগ্যালি**।

'ই'—

গাঁথি (গাঁথ+ই)=তাজা ফুলের মালা **গাঁথি** পরাই দুব তুর গলে।

'ইয়া'—(এটি একটি বহুলপ্রচলিত প্রত্যয়)

করাইয়া, শুনাইয়া, খাটাইয়া>খাটিয়া।

খাটিয়া ছেলের আবার রোজগারের অভাব।

'ই' / 'ঈ'—

কাড়ি, নাড়ি—হাত নাড়ি, পা নাড়ি দুয়ারে বসে চাল কাড়ি।

'উয়া'—

খাটুয়া, ভাতুয়া, মুতুয়া।

—**খাটুয়া** লোক ভাতুয়াতে কাজ করবে কেন?

'কা'—

টুট্‌কা, হুড়কা, হুট্‌কা, মুট্‌কা, জুড়কা।

'কার'—

জিত্‌কার, রিত্‌কার, হিত্‌কার।

'কি'—খাওকি, যাউকি, ছেঁচকি, হেঁচকি।

'নি'—টিপ্‌নি, খেলনি, নাচনি / নাচুনি, কাঁদ্‌নি, রাঁধ্‌নি।

প্রয়োগ—**টিপ্‌নি** কলটি টিপে দিলেই জল ব্যারাবেক ভক্‌ভকাই করে।

'ড়া'—কেমড়া (চুলকান), গমড়া (গুম্+ড়া)।

—ঘামাচিগুলা **কেমড়াতে** পাচ্ছ নাই বলে অও **গমড়া** মু করো না।

'অল', 'ল'—

মিটল, ছুটল, মরল, ধরল, ভরল, জুটল।

প্রয়োগ—**জুটল** এসে ডাকত।

ভরল সোনায় দু হাত।

ছুটল ছেলের দল।

মরল দু'একজন।

ধরল জনাকয়।

মিটল সবার ভয়।

(২) তদ্ধিত প্রত্যয়

'অট'—(বৃত্তি অর্থে)

মালট (মল্লবৃত্তি বা মাল), করট (করবৃত্তি), ঝালট।

'অন্ত'—

ধনন্তী (ধন আছে যার), পুতন্তী (পুত / পুত্র আছে যার)।

'আ'—মাঝা (মধ্য+আ), কালা (কাল+আ), ভালা (ভাল+আ) এ ছাড়া, নদীয়া / নদীআ, বাবুয়া, রাতিআ, বাঁসিয়া, বেপারিয়া।

ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে তুচ্ছার্থে 'আ'—

গোপাল>গোপ্‌লা, মঙ্গল>মংলা, সুবল>সুব্‌লা।

'আই'—

রূপাই (রূপ+আই), রামাই (রাম+আই), লখাই।

'আড়ি'—পেছাড়ি, আগাড়ি, মাড়াড়ি (মাড়োয়ারি)।

'অম', 'আম'—ফুলাম / ফুলম্ (সুগন্ধ)।

'আনি'—ফুট্+আনি=ফুটানি—খুব তো মুখে ফুটানি, কাজট কর দেখি।

মর্দ+আনি=মর্দানি, গেঁজ+আনি=গেঁজানি।

'আমি'—নোংরামি, নেংটামি, বাঁদরামি, চ্যাংড়ামি।

'আল'—চিটিয়াল, কাঁটিয়াল, আঠাল, বাচাল, লাঠিয়াল, ভুঁটিয়াল, ডাঙ্গাল, বাঙ্গাল।

'আলি / আলী'—বেহালি>বেহাল্যা—বেহাল্য মরদ হোত সায়া শাড়ী লুলুক দিত।

সাঁখালি>সাঁখাল্যা—সাঁখাল্যা পুরুষের মুখে ছাই, পেছু পেছু শুদুই যায়।

এ ধরণের শব্দ—কুড়মালী, ছেনালী, ডিংরালি, দুধালি।

'ই'—ধারি (কিনারা>কিনাৎ),—রাস্তার ধারিই আমাদের ঘর।

থাপি (পুরু, মোটা)—কাপড়টা বেশ থাপি বটে ত।

ডগি (ছোট ডগা)—লাউ ডগি পস্ত, আর কেঁড়ুলির ডাল রাঁধলিই হবেক।

কচি (কচি কচি পাতা)—সরস্বতী পূজায় বনফুলের সঙ্গে আমকচি, জামকচিও তুলতে ভুল না।

খুচি / খাঁচি (ক্ষুদ্র ঝুড়ি), খুকি (ছোট মেয়ে)।

'ইয়া' 'ইয়'—দ্রুত উচ্চারণের জন্য 'ইয়া' প্রত্যয় 'আ' / 'অ্যা' হয়ে যায়। মল্লভূমি ভাষাঞ্চলে এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ব্যবহার অত্যধিক। যেমন—

ক) কুচ্‌কুচিয়া, কলকল্যা, কাঁঠাল্যা, কুটকুটিয়া>কুটকুট্যা, কুচুট্যা।

খ) খরখরিয়া, খুঁতখুঁত্যা, খেজুর্‍্যা (গ্রামনাম), খেঁড়িয়া>খেঁড়্যা।

গ) গাঁঠ্যা (গ্রন্থি), গনগণ্যা, গড়গড়্যা, গুড়্যা (গুড়ের মতো মিষ্টি)।

ঘ) ঘুটগেড়িয়া (গ্রামনাম) ঘুটঘুট্যা, ঘরকনিয়া (ঘরকুনো), ঘ্যাঁচ্‌ড়া।

চ) চাউল্যা, চারকুন্যা (চারকোণবিশিষ্ট লণ্ঠন), চিমড়্যা চড়কা, (বিদ্যুৎ)।

ছ) ছলছলিয়া / ছলছল্যা, ছা-পুয্যা, ছেল্যা, ছচ্‌র্‍্যা (হেংলা), ছরকটা।

জ) জুমড়্যা, জাবদা, জঁঘ্যা, জবরা, জ্যাবড়্যা।

ঝ) ঝড়ঝড়্যা, ঝরঝর্‍্যা, ঝুমুরিয়া ঝুটঝুট্যা, ঝাম্‌টা, ঝাপটা।

ট) ট্যাঁস্‌ট্যাঁসা, টলটল্যা, ট্যাবট্যাবা, টঁক্যা, টাঁড়্যা, টুনটুনিয়া।

ঠ) ঠরঠরিয়া, ঠুনঠুন্যা, ঠলঙ্গা (ঠোঙ্গা), ঠসক্যা।

ড) ডুমুর্‍্যা, ড্যাবড্যাবিয়া, ড্যাবক্যা, ডহর্‍্যা, ডিংল্যা, ডেরথ্যা।

ঢ) ঢনঢনিয়া>ঢনঢন্যা, ঢেসনা, ঢেমনা (কুচরিত্রের লোক)।

ত) তলতল্যা, তপতপ্যা, তেলতেল্যা, তেঁতুলিয়া>তেঁতুল্যা।

থ) থল্‌থল্যা, থপথপিয়া>থপথপ্যা, থুত্থুড়্যা, থ্যাবড়া।

দ) দামড়্যা, দাড়িয়া (দাড়ি আছে যার), দুলদুল্যা, দামড়া, দুবলা।

ধ) ধপ্‌ধপ্যা, ধুমধুম্যা, ধড়ফড়িয়া, ধুড়ধুড়্যা, ধুমস্যা, ধুমড়া।

ন) নিগুণ্যা, নুনিয়া / নুনে (ছোট ছেলে), নামাল্যা, নিমুসক্যা।

প) পাহাড়িয়া, পাথর্‍্যা, পাড়িয়া / পেড়ে, পেছা (ঝুড়ি), পেখ্যা (তালপাতার টুপি)।

ফ) ফদফদিয়া, ফুরফুর্‍্যা, ফক্‌ফক্যা, ফ্যালফ্যালা, ফিরকা (পাতলা)।

ব) বিটকেল্যা, বাইন্যা, বাইস্যা, বালিয়্যা বিড়বিড়্যা, বাখুল্যা।

ভ) ভাদরিয়া, ভুঁইয়্যা, ভ্যাদভ্যাদা, ভদ্‌স্যা, ভিড়ক্যা, ভস্‌ভস্যা।

ম) মাদালিয়া>মাদল্যা, মাইয়্যা, ম্যাড়ম্যাড়্যা, ম্যামা মটমট্যা।

য) যামিনী>যামিন্যা।

র) রমরম্যা, রংচঙ্গা, রল্যা, রগ্যা, রঙ্গ্যা, রংরঙ্গ্যা।

ল) লাপত্যা, লহর‍্যা, লদলদ্যা, লেলা, লমলতা, ল্যাদা।

শ) শুটক্যা, শোঁটা (বেণী)।

ষ) ষেঁড়্যা (ষাঁড়ের মত)।

স) সন্ন্যা (সজিনা), সড়সড়্যা, সুড়সুড়্যা, সবুর‍্যা।

হ) হাঁড়িয়্যা, হড়বড়িয়্যা / হড়বড়্যা, হলহল্যা, হদ্‌কা।

ব্যক্তিনামে তুচ্ছার্থে 'ইয়া' প্রত্যয়—

কানিয়া / কানাইয়া, ক্ষুদিয়া, টুনিয়া, লখিয়া, মুনিয়া।

তুচ্ছার্থে ব্যক্তিনামে 'উ' প্রত্যয়—

কালু, খাঁদু, গজু, ঘেঁটু, চুনু, ঝাড়ু, ঝণ্টু, টুকু, তুলু, ডাকু, দুখু, নাড়ু, পুঁটু, ফুলু, ভুলু, মংলু, রুচু, লিলু, হাবু, হাঁসু।

ক্ষুদ্রার্থে—ইতুটুকু, ছুটুপারা, চুনুপারা।

আদরার্থে / অনুনয় অর্থে—খুকু, ছুটু, চুনু, মুনু, খুকু।

'উয়া'—জরুয়া (জ্বর+উয়া)—জরুয়া গা লিয়ে আজ নাইবা কাজে বেরুলে।

জালুয়া (জাল+উয়া)—জালুয়া জাল ফেলাতে যায়।

এরকম—টাকুয়া, হুলিয়া, ঘাসুয়া, ডাঙ্গুয়া (ডোঙ্গা)

'উলি'—খাটুলী (ছোট খাট), মাডুলী (গোবর মেড়ে গোল বৃত্ত) মাচুলী (মাচা, মঞ্চ), হাঁসুলী, বাসুলী।

'ক'—বটেক, হবেক, যাবেক, লিবেক, কিন্তুক।

কা, কি / কী—বড়>বড়কা, বড়কি ; ছোট>ছোটকা, ছুটকি ; মোটা>মুটকি ; শুট্‌কা>শুট্‌কি।

'কু'—মোটকু, ছোট্‌কু, পেটকু, শুটকু, শুকু।

'ছা'—(শাবক বা ক্ষুদ্রার্থে) বিটিছা, পাখছা, কুকুরছা, ছা, বিড়ালছা।

'টা', 'টে'—আঁশটে / আঁশটা, নেওটা / নেওটে, বোকাটে।

'ড়া'—চিমড়া, দামড়া, আগড়া, ফাবড়া, পিংড়া।

'ড়ি' 'উড়ি'—আঁত্‌ড়ি (অন্ত্র) ; গিদড়ি (ঘিলু), থুবড়ি (বয়স্ক), মাকড়ি (কানের রিং), বাঁকড়ি, হুমড়ি, কাঁকড়ি, আঁকড়ি।

'ড়ু'—চিমড়ু, খাড়ু, ঝাড়ু, নাড়ু।

'তি'—ভাচাতি।

'না'—ছানা, পনা, মাপনা, মাগনা, বায়না, রগন।।

'রা'—মট্‌রা, নড়রা, চাঁদরা, চপরা, ফপ্‌রা।
'ল'—দীঘল, পাঁকল, ঢাকল, চাকল, বল্কল।
'লা'—চক্‌লা (খোসা), সাঁঝলা (সন্ধ্যা), মাঝলা (মধ্য)।
'লি' / 'লী'—আগ্‌লি (অগ্র), মাঝলী (মধ্য), সামালি (সামলিয়ে)।
'সা'—(স্বাদ অর্থে)—চপ্‌সা (স্বাদহীন), পান্‌সা (জোলো স্বাদ)।

(৩) বিদেশী প্রত্যয়

'আন', 'ওয়ান'—গাড়োয়ান, দেওয়ান, দারোয়ান, পালোয়ান।
'কর', 'গর'—কারিকর / কারিগর, বাজিকর।
খানা—কারখানা, বৈঠকখানা, সরাইখানা।
দার—দোকানদার, দানাদার, দেনাদার, পাওনাদার।
বাজ—জাঁহাবাজ, ধাপ্পাবাজ, জুলুমবাজ, রকবাজ।

শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্ত শব্দ

অপরাপর অঞ্চলের মতো বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূম অঞ্চলের উপভাষায় শব্দদ্বৈতের গুরুত্ব ও উপযোগিতা যথেষ্ট রয়েছে। কারণ, এরূপ শব্দাবলী খুব সহজেই মানুষের মনের কথাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। শব্দদ্বৈতগুলিকে আমরা মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন (১) ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দদ্বৈত (২) সার্থক পূর্বপদযুক্ত শব্দদ্বৈত (৩) সার্থক উত্তরপদযুক্ত শব্দদ্বৈত (৪) উভয়পদই অর্থযুক্ত শব্দদ্বৈত (৫) ভাবব্যঞ্জক অনুকার শব্দদ্বৈত।

১। ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দদ্বৈত—

কট্‌কট্‌, কটর-কটর, কুটকুট, কলকল, খটখট, খুটখুট, খলখল, খকর খকর, খকখক, গবগব, গ্যাঁক, গ্যাঁক, গুঁইগুঁই, গোঁ গোঁ, গিরপির, গড়গড়, ঘেউ ঘেউ, ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, ঘড়ঘড়, ঘং ঘং, চক্‌চক, চ্যাঁ চ্যাঁ, চুক চুক, চিঁ চিঁ, চোঁ চোঁ, চব্‌চব্‌, ছক্‌ছক্‌, ছম্‌ছম্‌, ছাঁক্‌ছাঁক, ছল্‌ছল, ছপছপ, ছ্যাড়ছ্যাড়, ঝুর-ঝুর, ঝর-ঝর, ঝিম্‌-ঝিম্‌, ঝন ঝন, ঝাঁ ঝাঁ, ট্যাঁ ট্যাঁ, টক্‌টক্‌, টপ্‌টপ্‌, টবাংটবাং, টিপ্‌ টিপ্‌, ঠুক্‌ঠুক্‌, ঠংঠং, ঠুকুর ঠুকুর, ঠক্‌ঠক্‌, ঠ্যাঁ ঠ্যাঁ,

ডিমিক-ডিমিক, ডিম ডিম, ডিডিং ডিডিং, ড্যাডাং ড্যাডাং, ঢং ঢং, ঢক্‌ঢক্‌, ঢকাশ ঢকাশ, তড়তড়, তিড়িং তিড়িং, তড়াক তড়াক, তাথৈ তাথৈ, থপ্‌ থপ্‌, থপাস থপাস, থৈ থৈ, থুপুক থুপুক, দড়দড়, দমদম, দড়াম দড়াম, দ্রিমি দ্রিমি, দুম দুম, ধ্যাতাং ধ্যাতাং, ধমাস ধমাস, ধুম ধুম, ধূ ধূ, ধড় ধড়, পড় পড়, পড়াং পড়াং, পট-পট, পুটুস পুটুস, পং পং, ফরফর, ফটর ফটর, ফট ফট, ফটাস ফটাস, ফং ফং, ফড়ফড়, বক্‌বক্‌, বক্‌র বক্‌র, বদ্‌বদ, বিড়বিড়, ব্যাঁ ব্যাঁ, ভদভদ, ভকভক, ভ্যাঁ ভ্যাঁ, ভেউ ভেউ, ভড়ভড়, ভ্যাঁক ভ্যাঁক, মটমট, মুচমুচ, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যা ম্যা, রম্‌রম্‌, রিনিরিনি, রুনুরুনু, রি রি, সড়সড়, সরসর, সুড়ুক সুড়ুক, স্যাপস্যাপ, সাঁসাঁ, হড়হড়, হিড়হিড়, হদ্‌হদ, হিহি, হা হা হুপ্‌ হুপ্‌, হুড়হুড়, হেঁহেঁ।

২। সার্থক পূর্বপদযুক্ত শব্দদ্বৈত—

অতশত, আঁবিবুঁকি, কানা-ফানা, কাদা-টাদা, খাড়ি-খুড়ি, থালা-টালা, গাব-গুব্‌, গলা-টলা, ঘ্যাঁট-ঘ্যাঁট, ঘাঁটা-ঘুঁটি, চঁচ্‌-কঁক্‌, চা-টা, চিঁড়া-ফিঁড়া, ছোট-মোট, ছাব-ছুব, ছিরি-ফিরি, জড়-সড, জিতা-ফিতা, ঝট-মট, ঝাঁঝ-টাঁঝ, ঝাঁকড়-মাকড়, টক-ফক, টিলা-ফিলা, ঠেলা-টেলা, ডাং-ডুং, ডিংলা-টিংলা, ঢ্যাঙ্গ-ট্যাঙ্গ্যা, ঢং-ঢং, ত্যাবড়া-তুব্‌ড়ি, তালা-টালা, তেল-ফেল, তালি-ফালি, থাবড়া-থুবড়ি, দাতা-টাতা, দামড়া-টামড়া, ধুলা-টুলা, ধামসা-টামসা, নূতন-ফুতন, নারকল-টারকল, পুড়া-টুড়া, পাটা-ফাটা, ঝাড়া-টাড়া, ফাবড়া-টাবড়া, ফাঁদ-টাঁদ, ফল-টল, বুড়া-টুড়া বঁটি-টটি, বনান-টনান, ব্যাঁত-টাঁত, ভাঙ্গা-টাঙ্গা, ভাত-ফাত, ভুলা-টুলা, মুড়ি-ফুড়ি, মোটা-ফোটা, মাদুর-টাদুর, রং-টং, রিত্‌-ভিত্‌, রাত-টাত, লং-টং, লম্বা-টম্বা, লাল-টাল, ল্যাদা-ট্যাদা, সং-টং, সাদা-টাদা, শামুক-টামুক, শাক-ফাগ, ষাঁড়-টাঁড়, হাড়-ফাড়, হাঁড়ি ফাঁড়ি।

৩। সার্থক উত্তরপদযুক্ত শব্দদ্বৈত—

আলি-গলি, আঁচির-পাঁচির, আঁদাড়-পাঁদাড়, আলা-পালা।

৪। দু'টি সার্থক শব্দযুক্ত শব্দদ্বৈত—

অলি-গলি, আদু-ছাদু, (অন্ধ+ছন্দ), ইতি-উতি, ইধার-উধার, কোলে-কাঁখে, খেত-খামার, গাঁ-গঞ্জ, ঘাড়ে-গর্দানে, চ্যাল্যাচামুড্যা, ছা-পোনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, ঝাড়াপুঁছা, ট্যারাবাঁকা, ঠেকেঠুকে ডালপালা, খালেবিলে, ঢিলাঢালা, তেড়েতুড়ে, থমকে চমকে, দয়া দাক্ষিণ্য, ধুলাময়লা, নিতাই, গৌউর, পিঠা-পায়েস,

ফাঁকফোঁকর, বলাকওয়া, ভয়ভাবনা, মতিগতি, জাতজন্ম, রংতামাসা, নাদুস-নুদুস ল্যাবাহাবা, শিকড়বাকড়, শাকসব্জি, হেলাফেলা, হাসিমস্করা।

৫। ভাবব্যঞ্জক অনুকার শব্দদ্বৈত—

অজড় বজড়, অাঁকু পাঁকু, ইরিক বিরিক, উঠুক পুটুক, উরুলি ঝুরুলি, হ্যাকর প্যাকর, এবেড়া খেবড়া, গাবুর গুবুর, চিরিবিরি, ঝলংঝপর, ল্যাটর প্যাটর, ঝাপুর ঝুপুড়, টালবাটাল, ডাবকা ডুবকি, তিরি বিরি, তিড়িং বিড়িং, লটর পটর লদর পদর সাঁই সুঁই, হিহীড়ি পিহীড়ি, হেরি ফেরি।

ধাতু

সাধারণতঃ ব্যাকরণগত তদ্ভব, সিদ্ধ ও সাধিত ধাতু ছাড়া কিছু কিছু দেশী অথবা অজ্ঞাতমূল উপাদান নিয়ে প্রধানতঃ বাংলা ভাষার ধাতুকোষ গঠিত।

অস্ট্রিক ভাষাভাষীর প্রভাবে চলিত বাংলার তুলনায় এ অঞ্চলের উপভাষাতে দেশী ধাতুর পরিমাণ অনেক বেশী। এমনকি তদ্ভব মৌলিক ধাতুগুলিও অনেক সময় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে এবং স্বার্থিক প্রত্যয় গ্রহণ করে নূতন রূপ লাভ করেছে। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় আছে, 'চলিত বাংলায় চলে না এমন সব নূতন চেহারার ধাতুর সংখ্যা প্রায় ২০০টির কাছাকাছি।' ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধাতুগুলিকে ক্রমানুসারে যেভাবে সাজিয়েছেন সেই ক্রমানুসারে এখানে আমাদের আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে সাজাতে চেষ্টা করা হল। ক্রমগুলি হ'ল নিম্নরূপ—১) **সিদ্ধ ধাতু** ২) **সাধিত ধাতু** ৩) প্রত্যয়যুক্ত ধাতু।

সিদ্ধ ধাতু—তদ্ভব সিদ্ধধাতু—কাঁদ্ (ক্রন্দ), খা (খাদ্), জির (জৄ), ঝড় (ক্ষর্), দল (দুল্), ফিঁক (ক্ষিপ্), রু (রুহ=রোপণ করা)।

মূল ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নূতন ধাতুগঠন—

যেমন—সিঝ্ √সিধ্ +য্; ঘিন্√গ্রহ+ন।

উপসর্গযুক্ত ধাতু—

আজড় (আ—বর্জ=খালি করা), উচর (উৎ-চার=উচ্চারণ), উজল্ (উৎ +জ্বল্=উজ্জ্বল হওয়া), সঁটর (সম—তৃ=বুকে ভর দিয়ে চলা)।

দেশী অথবা অজ্ঞাতমূলক শব্দ—

টিপ্=চাপ দেওয়া, বিড়=পরীক্ষা / বেষ্টন করা।

সাধিত ধাতু—

ণিজন্ত ধাতু—মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' যুক্ত করে—

দোলা=দুল্+আ, খেদা=খেদ্+আ, শুষা=শুষ্+আ, দেখা=দেখ+আ।

উপসর্গযুক্ত—

নিকা=নি-কৃষ+আ।

নামধাতু—উথুলা=উথাল / উত্তাল, গবা=গর্ত, পুহা=প্রভাত, রিষা=ঈর্ষা, টং=তুঙ্গ।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু —কঁকা (কঁক্ কঁক্ শব্দ করা)।
গঁগা (গঁগ্ গঁক্ শব্দ করা)।
গাঁ গাঁ (গরু মহিষের ডাক)।
ম্যামা (ছাগলের ম্যা মা ডাক)
ভ্যাবা (ভ্যা ভ্যা ডাক ছাড়া),

অজ্ঞাতমূল ধাতু—

থিনা=থিতিয়ে যাওয়া, গিঁঠা=গ্রন্থিযুক্ত হওয়া, ঢুঁসা=ঢুঁ মারা, গুড়দা=পিছনে পিছনে দৌড়ানো।

'কৃ'-যোগে—

সাত করা (গুছিয়ে দেওয়া), গাপ করা (আত্মসাৎ করা)।

'হ' যোগে—

ঢং হওয়া, সাঁঙ্গা হওয়া, সং হওয়া, টং হওয়া।

একাধিক ধাতুর সংমিশ্রণে—

ধাঁস=দহ+ধ্বস।

নঞ্যর্থক শব্দের মিশ্রণে—লার=না পার লারবি=না পারবি।

প্রত্যয়যুক্ত ধাতু—

সিদ্ধ ধাতুতে নামধাতুতে এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নূতন ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে।

১) 'ক' প্রত্যয়

সিদ্ধ ধাতুতে—দল্-ক=দলক ; দলকে সোঁটা যাচ্ছ কোথা।

ফর্-ক=ফরক ; নূতন শাড়ী পরে খুব যে ফরক ফরক করছ।

ঝম্-ক=ঝমক ; ঝমক ঝমক পায়েল বাজে।

বল্-ক=বলক ; (উৎ-প্লব=ফুটানো) ; বলক করা দুধটা খরচ কর।

ভদ্-ক=ভদক ; একটানা জলে সব ভদক ভিজা হয়্যে গেইচে।

ণিজন্ত ধাতু গঠনে—

ডরকা=ডর্+কা=ভয় পাওয়া ; ঝট্কা=ঝট্+কা=শীঘ্র ;

ডুবকা=(প্রা. বুড্ড) ডুব+কা=ডুবে যাওয়া।

উট্কা=উৎ-স্থা=বাড়তি ; সর্কা=সর্কা=সর্+কা=পিচ্ছিল।

নামধাতুতে—

জমক>জমা ; আসরট ব্যাশ জমকাইছে।

ধসক>ধস্ ; দিয়ালটা জলে ধসকাই গেল।

ভিড়ক>ভিড়=(ভয়) ; গাড়ীর আওয়াজে গরুটা ভিড়কাই গেল।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে—

ফট্কা=ফট্ফট শব্দ করা। পট্কা=পটপট শব্দে ফাটা। কুহক=কুহু কুহু শব্দে ডাকা। থুপকা=থুপ থুপ করে শব্দ করা। ভুক্=ডাকা ; কুকুর ভুকে কাঁই কাঁই।

অজ্ঞাতমূলক ধাতুতে—

উসক্ (উৎকর্ষ ? উৎ-স্কন্দ্) ; বাতিটা উস্কে দাও।

হুদক্=(ব্যাকুল)=বঁধুর লাগি হুদকে উঠে মন।

লজকা=(আসন্ন)=ভাদু পরব লজকাইল, বাপের ঘরে বিটি আল্য।

লদকা=(লদ্=গায়ে গায়ে লেগে যাওয়া)=কাঁচাতে হাত দিও না লদ্‌কে যাবেক।

২) 'চ' প্রত্যয়—

ভেংচা=ভ্যাঙ্গানো ; গচ্চা=ক্ষতিপূরণ।

৩) 'প' প্রত্যয়—

তুড়্প=তুড়ি মেরে নৃত্য করা ;

সুড়্প—সুড় সুড় করে চলে যাওয়া বা খাওয়া।

৪) 'র' প্রত্যয়—

এঁচর>এঁচরা=অল্প অল্প করে মাটি খোঁড়া ; গাঁড়র=মূর্খ ; থড়র=অবিন্যস্ত ; ঠাহর=নিদিষ্ট করে দেখা ; পচর=খারাপ ; ভাঁওর=মিথ্যা ; হেঁশর=শ্বাসকষ্ট।

৫) 'ল' প্রত্যয়—

গেঁজল>গেঁজলা ; ঘাইল>জখম হওয়া ; ধকল>কষ্ট বা ধাক্কা ; চপল>দুষ্টু ; ফুসল>ফুসলানো ; হাসিল>complete, শেষ ; হামল=হামলানো বা ডাকা।

৬) 'স', 'শ' প্রত্যয়—

বালস=ঈষৎ জ্বরভাব ; বালস ছেলা ঝোঁক ত করবেই।

থেঁকশ=খেঁকিয়ে ওঠা ; সব কথাতেই খেঁকাশ না বলছি।

ঢুস্ (ঢুঁ মারা / তেড়ে আসা)=সাবধান ঢুঁসিই দিবে।

৭) 'ড়', 'ড়া' প্রত্যয়—

আঁদাড়-পাঁদাড় (পশ্চাৎ) ; জবড়, গিজড়, ছ্যাঁচড়, ঘ্যাচড়, হাবড়, ঘষড়।

অন্যান্য—

ভাগ (হিন্দী শব্দ, অর্থ তাড়ানো), ভাগাও সবাইকে।

বাত (" " " বার্তা / কথা) ; কি বলবি ? এ্যামন আজব বাত।

গির (" " " পড়ে যাওয়া) ; 'কচি কদম গিরি গেল।'

বন (" " " তৈরী কর) ; কানের দুলটা কবে বনাইলি ?

ফুট্ (" " " ভাঙা / ফুটা) ; কাপটা দিলি ত ফুটাইয়ে।

সমঝ (" " " সম-বুঝ) ; এবার একটু সমঝে চল।

দাব্ (" " " দশন করা) ; ই কলঙ্ক আর দাবতে হবেক নাই।

সাঁট্ (" " " অংলগ্ন হওয়া) ; দিয়াল সাঁটিয়ে সব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়া—

একাধিক ক্রিয়াযোগে গঠিত ক্রিয়াকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। মল্লভূমের উপভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অত্যধিক। প্রধানত: দা, গম্, উঠ্, বুল্, কর প্রভৃতি ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়।

'দা' (নিশ্চয়তা বোধে)—করাই দুব, ঘুঁরাই দিব, হাসাই দিলি, বনাই দে।

'গম্' (সম্পূর্ণতা বোধে)—চলি গেল, মরি গেলা, নিয়ে গেল, করেঁ্য গেলি, রেখে গেল।

'উঠ' (আকস্মিকতা বোধে)—খায়েঁ উঠল, চেঁচাই উঠেছে, মেমাই উঠল, বলি উঠে।

'বুল্', (অভ্যাস ও নিত্যত্ব বোধে)—নেচে বুলা, ঘুরে বুলা, বুলে বেলাও (বলে বেড়াও), বুলে বুলা (ঘুরে বেড়ানো)।

'কর' (করা অর্থে)—করা করাব, বলা করাও, আনা করাবি, বোস করান।

'মর' (মরণ অর্থে)—ঘুরে মর, বলে মর, করে মর, থায়েঁ্য মর, লিয়ে মর।

'লভ্' (নেওয়া অর্থে)—লিয়ে লিল, করেঁ্য লিল, খায়েঁ্য লিল, বলে লে।

গঠনানুসারে যৌগিক ক্রিয়াকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন— ক) সমাপিকা ও অসমাপিকা; খ) দুটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা; গ) নামপদ ও সমাপিকা ক্রিয়া।

ক) সমাপিকা ও অসমাপিকা—

উড়ে বুলা (পালিয়ে / ঘুরে বেড়ানো), ঘুরে বুলা (বেড়িয়ে বেড়ানো), ঘুরি যাওয়া (জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু হওয়া), বয়ে যাওয়া (নষ্ট হওয়া), জুড়ি দেওয়া (কর্মে নিযুক্ত করা), ফুটে যাওয়া (নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, বা ধ্বংস হওয়া)

খ) দুটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা—

করিদি গেল (করিল), বলি দি গেল (বলিল)।

গ) নামপদ ও সমাপিকা ক্রিয়া—

এই শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়া মুখ্যতঃ 'ইডিয়ম' বা 'প্রবচন' প্রধান। যেমন— আঠা-আড়া=লেগে থাকা, মন-উড়া=উদাসীন, মনে-লাগা=পছন্দ হওয়া, থির-কাটা=স্থির হওয়া, চুপ-মারা=নিঃস্তব্ধ হওয়া, গতর খাটা=শারীরিক পরিশ্রম করা, বাথান কাড়া=গালি দেওয়া।

কর্—অল্অল্ করা (উদ্দেশ্যহীনভাবে সব সময় ঘুরে বেড়ানো); আড়পাড় করা (অস্থির হওয়া); কাঁই-কুঁই করা (ইতস্তত: করা); থ্যান করা (দুর্ভাগ্যবশতঃ); গাপ্ করা (আত্মসাৎ করা); ঘাট করা (শ্রাদ্ধ করা / বাইরে মলত্যাগ করতে যাওয়া); ঘর করা (সংসার কর); জাম করা (জমা করা); ঝাঁঝ করা (রাগান্বিত হওয়া); ট্যাঁকা করা (রাগ করা / অহঙ্কার করা); ঢং করা (ন্যাকামি করা); তাল করা (সুযোগ খোঁজা), থ-করা (অবাক করা); পং করা (অঙ্কুরিত হওয়া); লাট করা (গাঁট বাঁধা) সং করা (ঠাট্টা করা); হাঁক করা (জোরে ডাকা)।

কাড়্ / কাঢ়্—রা-কাঢ়া; হাঁড়ি-কাড়া; বাপ-কাড়া।

খা—কিরা খাওয়া; খাপি খাওয়া; গাড্ডু খাওয়া।

গুচ্ / গুজ—দিন গুজরানো, বেলা গুজরানো।

প্রয়োগ—মাছ ধরা লয়, প্রেমচাতুরী বৃথায় বেলা গুজরালি।

চাল্—নজরচালা—পরের বিটির উপর নজর চালাস্ না।

কথা চালা—কথা চালাচালি করাই তো তুমার ব্যবসা।

ছাড়্—বন্ন ছাড়া (পাকা রং লাগা); গা ছাড়া (বড় হওয়া বা বয়ঃসন্ধি সময়); দম ছাড়া (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা)।

ঝাড়্—গা ঝাড়া (প্রস্তুত হওয়া, সংশয় দূর করে ওঠা); বাত্ ঝাড়া (বড় বড় কথা বলা); গরব ঝাড়া (অহঙ্কার দেখানো)।

প্রয়োগ—খুব ত গরব ঝাড়ছিস্ দেখত তুর ই গরব কতদিন থাকে।

থাক্—কথায় থাকা (সম্পর্কে থাকা), গায়ে থাকা (ঋণ করা)।

প্রয়োগ—তোমার এই টাকা কটা আমার গায়ে থাকল।

দা—গোঁজা দেওয়া (তালি দেওয়া); এ সংসারে গোঁজা দিয়ে দিয়েই তো জীবনটা গেল।

দাগা দেওয়া (আঘাত করা); কালি দেওয়া (অসম্মান করা বা কলঙ্ক লেপন করা); যেমন—কি করলি, ঘর মজালি মুয়ে দিলি কালি।

দেখ্—ঢং দেখান; চাঁড় দেখান; মু' দেখান।

ধর্—পেছু ধরা (অনুসরণ করা); ম্যাউ ধরা (উমেদারী করা); হাত ধরা (অনুগত থাকা); মন ধরা (ভাল লাগা)।

পড়্—ফুল পড়া (সন্তুষ্ট হওয়া); এ্যাতদিনে ফুল পড়ল ছেলা আমার বিয়াতে মত দিল। গতর পড়া (স্বাস্থ্যহানি হওয়া), মু-পড়া (বাক্‌শক্তিহীন হওয়া)।

পাত্—প্রেম পাতা; যেমন—প্রীতা বলে প্রেম পাতাতে বঁধুর সনে চিরকাল।

ফুল পাতা—অ, মা আমি ফুল পাতাব মাসীর বিটির সঙ্গে।

আড়ি পাতা—লোকের দুয়ারে দুয়ারে আড়ি পাতা তোর এক কাজ হয়েছে। তুলনীয়—'সভা পাতা'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বস্—পর বাসা;—এ্যাতে করে করি ঘর, তবু মুনস্যা বাসে পর।

অনুরূপ—ভয় বাসা, লাজ বাসা, ভিন বাসা।

বুল্—চাঁউরে বুলা (চরে বেড়ানো), ঘুরে বুলা।

ফাঁড়্—দাঁত ফাঁড়া, ব্যাত ফাড়া, হাঁ ফাড়া (অপেক্ষা করে থাকা)।

ভাঙ্—পাষাণ ভাঙ্গা (দাঁড়ি-পাল্লার ভারসাম্য করা); গরব ভাঙ্গা (অহংকার চূর্ণ করা), ভাঙ্গানি-ভাঙ্গা (ধাঁধার সমাধান করা), মন ভাঙ্গা, রাগ ভাঙ্গা, লাজ ভাঙ্গা।

মার্—ফুটানি মারা, চোখ মারা, ফাবড় মারা, উফাল্ মারা—কই মাছে উফাল মারে ধরা বড় জ্বালা। হেল মারা—জলে নাম, সিনান কর হেল মের না। অনুরূপ—হুনিয়া মারা, কুলকুলি মারা, থির মারা, ঝক্মারি, দম মারা, চাঁটি মারা।

মেল্—দোকান মেলা, ডালা মেলা।

লাগ্—কফ্ লাগা (ঠাণ্ডা লাগা); খিঁচ্ লাগা, গা লাগা, ছাপ্ লাগা, জাড় লাগা, জল লাগা, জাঁক লাগা, ঝাঁঝ লাগা, ঠেকা লাগা, তুক্ লাগা, নজর লাগা, ব্যাগড় লাগা, বেজ লাগা।

নাড়্ / লাড়্—হাত লাড়া (নাড়া); কুট লাড়া, মু লাড়া।

'হ'—খালাস্ হওয়া, গাপ্ হওয়া, ঘাট হওয়া, ডাগর হওয়া, বেজার হওয়া, দিশা হওয়া, লায়েক হওয়া।

হাঁক—গলা হাঁকা,—ঢের হইছ্যে আর গলা হাঁকরাতে হবেক নাই।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া

অ অঞ্চলে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয় 'বট' ক্রিয়াটি। এটি সংস্কৃত 'বৃৎ' ধাতুর রূপ থেকে উৎপন্ন। আদি-মধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই ক্রিয়াটির ব্যবহার রয়েছে। সাধারণতঃ বর্তমান কালেই এই ধাতু বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

উত্তম পুরুষ—বটি ; —আমি ইখানকার দিদিমণি বটি।

মধ্যম „ —বট, বটে ; তুমি ক্যা বট ?

—হ পাসাড়ি লোককে শুধাই উটি ক্যা বটে ?

প্রথম „ —বটে, বটিস্ ; —সে আচ্ছা লোক বটে ? তু ক্যা বটিস্ ?

নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া

প্রধান নাস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ 'নাই' সংস্কৃত 'নাসীৎ' (নাহি) থেকে জাত। এতদঞ্চলের উপভাষায় 'নাই' ক্রিয়াপদটি সমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন—আমি ভুলতে যে সই না পারি এ্যামন প্রেমের মাধুরী। কিংবা, এ্যাত করে বলে গেলম, তবু তুমি নাই গেলে।

'ন'+'ভূ' জাত 'নয়' ; ধ্বনি পরিবর্তনে 'লয়'। যেমন—

১) ভাল করে দেখে এলম বুড়া বর লয় গো দিদি।

২) দু'টা লয়, দশটা লয়, সবে এ্যাকটাই ত ছা।

নাস্ত্যর্থক 'নাই'-এর উত্তর স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় মহাপ্রাণিতরূপে ব্যবহৃত, যেমন—

যাবেক নাই, খাবেক নাই, বলবেক নাই।

যৌগিক ক্রিয়া

লারি, লারব=পারব না।

প্রয়োগ—আখুন আমি কুছুই লারব। ইটা আমি করতে লারি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় ই-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। যেমন চর্যাপদে—'বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। —'মন থির করি ধর মোর বোল।'—বাঁকুড়ার উপভাষাতেও কিন্তু ই-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। যেমন—আসি, বসি = আসিয়া, বসিয়া।

প্রয়োগ—আসি, বসি কথা কই। হাসি, খেলি, চলি ঐ।

অনুরূপ ক্রিয়া—কসি, খুঁচি, খুলি, খুঁড়ি, গলি, গিলি, গড়ি, ঘুরি, ঘাঁটি, ঘিরি, চাঁছি, চাখি, ছাঁকি, ছাড়ি, ছেঁচি, ছলি, জুড়ি, জাগি, জুতি, ঝারি, টাঙ্গি, টুকি, টুটি, টিপি, টানি, ঠুকি, ঠেলি, ডাকি, ডুবি, ঢাকি, ঢালি, ঢুকি, তুলি, তুষি, দিলি, দেখি, দুষি, ধাসি, ধরি, নাচি, নাড়ি, পড়ি, পরি, পুঁছি, পাড়ি, পাতি, পালি, ফাটি, ফুটি, ফুঁকি, ফিরি, বলি, বসি, বুঝি, বকি, বাছি, বিকি, ভাবি, ভিজি, ভালি (দেখি), মরি, মাড়ি, মুড়ি, যাচি, রচি, লড়ি, লিখি, লুটি, হাসি।

কয়েকটি প্রয়োগ নমুনা—

আমপাতা **চিরিচিরি** নৌকা বনাইব।
আখু (ইক্ষু) বিল **চষি চষি** রাঙামাটি বেরাইছ্যে।
আয় **ডুবি ডুবি** ধরি মাছ।
হাঁটু **গাড়ি** হু হু যায়।
মাটি **খুঁড়ি** গাড় করি।
কলসী **লিই** জলকে চলি।

সাঁওতালী গানে—শালবনে শালফুল **ফুটি** করি আলা হে।
আহা পরব **আলি** বাহা রে।

কয়েকটি আঞ্চলিক ধাতুতে—

আড়ি, আঁদড়ি, উলি, কাঁউচি, খাঁক্‌রি, খেঁকশি, গিজড়ি, গেঁজলি, গুড়দি, ঘিঁষি, ঘষড়ি, চিপলি, ছাঁদি, জবড়ি, জরকি, ঝাঁকরি, ঝাঁটি (ঝাঁট দিয়ে), টিপি, ঠহরি, ডুলি, ঢল্‌কি, থাসি, থুপি, দাদরি, দুচি, ধাসি, পাছুড়ি, পালি, ফিরকি, ফাঁদি, ভালি, ভিড়কি, ভুঁকি, ভদ্‌কি, মাগি (মাগিয়া>যাজ্ঞা করিয়া), রগড়ি, লাদি, লেদ্‌কি, সুঁগি, হুদকি, হেঁসুরি।

'আ'-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া আদি-মধ্য বাংলায় প্রচলিত ছিল। যেমন—'তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার।'

সাঁওতালী গীতে 'আ'-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে।

'দুকুড়ি দশ টাকা দিয়া বিয়া দিলাম শেষকালে।'

কিংবা 'ই মালা লদীজলে ভাসাআ দিব বনমালী।'

আবার, 'বিষ্টুপুরের রাজার বিটা দাঁড়াইআ (দাঁড়াআ) আছে গাছতলে।'

'এ্যা'>'ইয়ে'-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া—

দ্ব্যক্ষরীভবনের ফলে মধ্যস্বরের লোপ এবং দ্রুত উচ্চারণের সংকোচন প্রবণতার ফলে 'এ্যা' (ইয়ে)-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। যেমন—

করিয়েঁ্য>করেঁ্য—ছেলা বয়সে পিরিত **করেঁ্য** এখন মরি জ্বলনে।

ধরিয়েঁ্য>ধরেঁ্য—হাঁটু **ধরেঁ্য** বসবি, চাটু ধরেঁ্য রাঁধবি।

তুলিয়েঁ্য>তুল্যে—**তুল্যে** ধর বদনখানি, দেখি আমি নয়ন ভরি।

বুঝিয়েঁ্য>বুঝ্যে—**বুঝ্যে** লিলম তুমার, কেমন কর আমার যতন।

দেখিয়েঁ্য>দেখ্যে
বাঁটিয়েঁ্য>বাঁট্যে } ফুলকুমারী হলুদ **বাঁট্যে দেখ্যে হাস্যে** গাঁয়ের লোক।
হাসিয়েঁ্য>হাস্যে

মধ্যস্বর লুপ্ত হওয়ার ফলে এবং অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি না থাকার ফলে পূর্ববর্তী স্বরে কোন পরিবর্তন হয় না। নীচের রূপগুলি তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন—

আন্যে (আনিএ>আনীত, বাং আইন্যা>চলিতে এনে।)

বাক্য ঃ—শশা খায়েঁ্য কফ করিছে, ডাক্তার আনি বুক দেখাও।

আস্যে (আসিএ>আবিশিত বাং আইস্যে>চলিতে এসে।)

বাক্য ঃ—রাত দুপুরে জামাই আস্যে কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গাই দিল।

কাঁপ্যে (কাঁপিয়ে<কম্পিত>কাঁইপ্যা>কেঁপে।)

বাক্য ঃ—থাক্যে থাক্যে কাঁপ্যে উঠে আমার যাদুর লরম গা।

কাঁন্থে (কাঁদিয়ে<ক্রন্দিত>কাইন্দা>কেঁদে।)

বাক্য ঃ—তুমার লেগে দিনভর কাঁন্থে আমার অবুজ মন।

কাট্যে (কাটিএ<কট্টিঅ>কর্তিত / কাইট্যা>কেটে।)

বাক্য ঃ—বন কাট্যে শহর গড়।

কাড়্যে (কাড়িয়ে<কাড়টিঅ ? কর্ষিত>কেড়ে।)

বাক্য ঃ—মন দিয়ে মন কাড়্যে লিল এ্যামন মজার পীরিতি।

খায়েঁ্য (খাঁইয়ে<খাদিত>খাইয়া>খেয়ে।)

বাক্য ঃ—খায়েঁ্য দায়েঁ্য প্যাট ফুলায়ে বইস্যা থাকলি চলবেক।

গাঁথ্যে (গাঁথিয়ে<গ্রন্থিত>গেঁথে।)

বাক্য ঃ—বিনি সূতায় মালা গাঁথ্যে মন হ'ল্য বিবাগী।

গাঢ়্যে (গেঢ়ে / গর্ত করে / পুঁতে।)

বাক্য ঃ—মায়ের থানে খুঁটা গেঢ়ে বলি দুব তুর বাছাকে।

চাখ্যে (চাখিএ>চাইখ্যে>চেখে।)

বাক্য ঃ—চাখ্যে কিনবি ঠকবি নাই।

চাঁয়্যে / চাঁহ্যে (চাহিএ<চক্ষিত>চাইয়া>চেয়ে।)

বাক্য ঃ—তুমার পানে চাঁয়্যে চ্যাহ্যে পরাণ আমার বাঁচে না।

অথবা—পথের পানে চাঁহ্যে চাঁহ্যে চোখের জল শুকাই গেল।

ছাঁড়্যে (ছাড়িয়েঁ<ছড্ডিঅ>ছাইড়্যা>ছেড়ে।)

বাক্য ঃ—যাবার বেলায় রগল লিল বুনকে ছাড়েঁ্য যাব নাই।

জেন্যে (জানিয়েঁ<জানিত=জ্ঞাত>জানিয়া>জেনে।)

বাক্য ঃ—আগু পেছু জেন্যে, তবে দিবি কন্যে।

ঝাড়্যে (ঝাইড়্যা>ঝেড়ে।)

বাক্য ঃ—ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর ধূলা ঝাড়্যে কলে লে।

টান্যে (টানিয়া>টেনে।)

বাক্য ঃ—টান্যে-টুনে কত আর বাড়াবি!

ঠার্যে (ঠাহর করে।)

বাক্য ঃ—আঁখি ঠার্যে দাঁড়াই আছে কদমতলায় ক্যা?

ডাক্যে (ডাকিয়ে>ডাইক্যা>ডেকে।)

বাক্য ঃ—ঘরের থেকে ডাক্যে এনে অপমানটা করাব।

ঢাল্যে (ঢালিএ>ঢাইল্যা>ঢেলে।)

বাক্য ঃ—মাথাটা গরম হইছে দু ঘটি জল ঢাল্যে দে।

তাড়্যে (তাড়িএ>তাইড়্যা>তেড়ে।)

বাক্য ঃ—মাথা তাড়্যে সিঁথা কাটব তাথে ঝুরা (সিন্দুর) লাগাব।

থাক্যে (থাকিএ>থাইক্যা>থেকে।)

বাক্য ঃ—থাক্যে থাক্যে মনে পড়ে শ্বশুরঘরের গঞ্জনা।

পায়েঁ্য (প্রার্থিত=প্রাপ্ত>পেয়ে।)

বাক্য ঃ—দেখতে পায়েঁ্য দৌড়ে এলো কিনতে খুকু ফুলঝুরি।

পাক্যে (পাকিয়ে>পাইক্যা>পেকে।)

বাক্য ঃ—আম পাক্যে লাল হঁইছ্যে।

বাঁচ্যে (বাঁচিএ>বাঁইচ্যা>বেঁচে।)

বাক্য ঃ—বাঁচ্যে যদি থাকি আমি দেখাঁই তুব মরদ ক্যা।

বাছ্যে (বাছিএ>বাইছ্যা>বেছে।)

বাক্য ঃ—গাঁ-কে আল্য সরু শাঁখা বাছ্যে পর তুমু মা।

ভাঙ্গ্যে (ভাঙ্গিয়া>ভেঙ্গে।)

বাক্য ঃ—নাম বর্ষার কচি কদম ডাল ভাঙ্গ্যে পাড় না।

ভাব্যে (ভাবিএ>ভাইব্যা>ভেবে।)

বাক্য ঃ—কাড়া কিনলি হুচুকে ভাব্যে মর পেছুকে।

মাখ্যে (মাখিএ>মাইখ্যা>মেখে।)

বাক্য ঃ—মুয়েতে হিমানী মাখ্যে সং এর পারা সাজুস না।

যায়েঁ্য (যাইএ>গিয়ে।)

বাক্য ঃ—হাটকে যায়েঁ্য আনে তুব মনের মতন মনবাহারী (শাড়ী)।

যাচ্যে (যাচিয়া>যেচে।)

বাক্য ঃ—যাচ্যে যাব নাই, যাচ্যে খাব নাই।

রাখ্যে (রাখিয়েঁ<রক্ষিত>রাইখ্যা>রেখে।)

বাক্য ঃ—কচি ছেলা ঘরে রাখ্যে কাজকে আসি কপালদোষে।

রাঁধ্যে (রাঁধিএ>রাঁইন্ধে>রেঁধে।)

বাক্য ঃ—রাঁধ্যে দিলম সাত তরকারী তবু বলে রাঁধতে লারি।

লাচ্যে (নাচিয়া>নেচে / লেচে।)

বাক্য ঃ—গোউর আমার লাচ্যে লাচ্যে স্ববার মন ভুঁলাইছে।

লাড়্যে (নাড়িয়া>নেড়ে।)

বাক্য ঃ—হাত লাড়্যে কইছ কুথা (কথা)

হাতে তুমার লাড়ু কুথা (কোথায়)?

লাগ্যে (লাগিয়ে>লাইগ্যা>লেগে)।

বাক্য ঃ—প্যাটের লাগ্যেই ত খাটা। (পরিশ্রম, উপার্জন করা।)

সাজ্যে (সাজিএ>সাইজ্যা>সেজে)।

বাক্য ঃ—সাজ্যে গুজে রইলম বস্যে, ডুলি আল্য নাই যাব কিসে।

সার্যে (সারিএ>সাইর্যা>সেরে।)

বাক্য ঃ—কাজকর্ম সার্যে তবে একটু বিরাম পেলম।

হাস্যে (হাইস্যা>হেসে।)

বাক্য ঃ—চোর পালাল হাস্যে, বুড়ি মরে কাশ্যে।

এছাড়া 'আই'-অন্তক অসংখ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বাঁকুড়া-কেন্দ্রিক মল্লভূমির উপভাষা বা বাক্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভাল কইর‍্যা **বুঝাই সুঝাই ভুলাঁই ফুস্‌লাই পাঠাই** দে। অথবা ছেলাটাকে **উঠাই বসাই হাসাই কাঁদাই** আর আশ মিটে না।

অব্যয়

বিভক্তিসূচক অব্যয়—

'বই' (ভিন্ন / ছাড়া)

১) হে, ঈশ্বর তুমা **বই** আমার কেউ নাই।

২) 'ঘরে আছে ছোটু দেওর লাল ধুতি **বই** পরে না।'

'পারা' (মত / সদৃশ)

১) অমন যোগিনী **পারা** সেজেছ ক্যানে?

২) তুমার **পারা** আমার অত ক্ষ্যামতাই নাই।

সময়সূচক—টপ্ (শীঘ্র)—**টপ্** করে ডুব দিয়ে আয়।

খপ্ („)—**খপ্** কর্যে খায়েঁ্য লে।

সন্দেহবাচক—পাছে (পশ্চাৎ)—**পাছে** কুল যায় তাইত যাতে লারি।

সংযোগবাচক—ভি (তবুও)—জান হুব সে-**ভি** আচ্ছা, তবু মান হুব নাই।

অনুরোধ / প্রার্থনা—'ব'—১) দে না **ব** আলাটা এ্যাকটু দেখাঁইএ।

২) লে **ব** লে দুধটা খায়েঁ্য লে।

সম্মতিসূচক—হঁ, হিঁ, হুঁ—১) **হঁ হঁ** তুমি যখন বইলছ তখন যাত্যেই হবেক।

২) হিঁ তা বটে বৈকি ? ৩) হুঁ তা তো বটেই।

অসম্মতিসূচক—উহুঁ—উঁহুঁ উটা লয়।

ঘৃণাসূচক—ধ্যেৎ, ভ্যাট, দূরদূর, ছ্যা ছ্যা।

অনুমোদনজ্ঞাপক—বাঃ, বেশ বেশ, আচ্ছা।

বিস্ময়সূচক—ই বাব্বা, অ বাপ , তাই নাকি।

ভয়, যন্ত্রণা, কষ্টবাচক—উঃ, অ-বাপ, উঃ মারে, অ মাগো।

প্রশ্নবাচক—ক্যানে, তা-পারা, তাই-না-কিনি।

নির্দেশাত্মক—হ্যঁ-হ্যাখ, হালে।

সম্বোধনসূচক—অ, ও, ওহে, লো এ, গ, ব।

যেমন—অ—**অ, গা** আমার ভাত বাড়।

ওহে—**ওহে** মিন্‌সে যাচ্ছ কুথা ?

ও-লো—**ও-লো** গঙ্গাজল কবকে এলি ?

এ—**এ** বিয়ান ভাল ছিলে **ত** ?

হঁ-গ—**হঁ-গ** বাছা বুঝে চলবে।

এ্যা-ব—**এ্যা-ব,** উরা কি বলল্যেক র‍্যা ?

জীবজন্তু, পশুপাখী ইত্যাদির ক্ষেত্রে—চুচু, তুতু, আয় আয়।

সমাস

তৎসম শব্দের সমাস অপেক্ষা তদ্ভব শব্দযোগে গঠিত সমস্ত পদে (মল্লভূমী ভাষায়) সমাসের প্রয়োগ বেশী। সাধারণ নিয়মের মতই ছয় শ্রেণীর সমাসেই এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দভাণ্ডার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। **দ্বন্দ্ব সমাস**

ক) সাধারণ দ্বন্দ্ব **:—**অবরা-জবরা, (অবরা ও জবরা), অসার-বিসার ; উড়ন-পাড়ন ; কাঁটা-খঁচা ; খানা-ডবা ; খাড়ি-খঁচা ; খানা-ডংলা ; গনন-গাঁথন ; ঘা-ফুট ; ঘষন-মাজন ; চোর-ছ্যাঁচড় ; ছানা-পোনা ; জ্বালা-যন্ত্রণা ; ঝাড়-ফুঁক ; ঝাড়ন-পুছন ; ট্যালা-বাঁকা ; পচা-ধসা ; বাউ-বাতাস ; বাঁকা-চোরা ; রুখা-শুখা ; নদী-নালা ; লাগান-ভাজান ; হুঁশ-দিশা ; থল-কুল।

খ) অলুক দ্বন্দ্ব :—গায়ে-গতরে ; ছায়ে-মায়ে ; দরে-দামে ; পালে-পার্বণে ; বনে-বাদাড়ে ; মাড়ে-ভাতে ; রাঢ়ে-চুয়াড়ে ; রাঢ়ে-বঙ্গে ; হাতে-পায়ে।

গ) তৎসম্পর্কিত অর্থে :—কাঠ-কুটা ; জাড়ে-শীতে ; গুয়ে-গোবরে ; গাঁয়ে-গঞ্জে , গায়ে-গতরে ; জলে-কাদায় ; গুড়ে-চিনিতে ; চালে-ডালে ; দাওয়ায়-পিঁড়ায় ; পান-পুঁগি=পান বিড়ি (সাঁওতালী শব্দ)। 'পান-পুঁগি দিতে মন মলিন রহিল।'—সাঁওতালী গান।

ঘ) বিপরীতার্থে :—আপুন-পর, লাভ-লোকসান, ছানা-বুড়া, মোড়ে-ডাগরে, মেয়া-মরদ, বাপে-মায়ে, তল-উপরে, ভালয়-মন্দয়।

ঙ) সম্বন্ধবাচক :—বউ-বিটি, ননদ-ভাজ, জা-জিউলি, মাগ-ভাতার, কামিন-মুনিস, মালিক-চাকর।

চ) ক্রিয়াপদ সংযোগবাচক :—করা-ধরা, বিচা-কিনা, কাটা-ছিঁটা, গিলা-কুটা, ঘষা-মাজা, নাড়া-ঘাঁটা, লাচা-কুঁদা, রাঁধা-বাড়া, সিজা-ভিজা।

ছ) অন্যান্য :—হেদরা-ভেদরা, দহর-মহর, আড়িয়া-দেড়িয়া (অর্ধ+দ্বিঅর্ধ)।

২। **তৎপুরুষ সমাস**

ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :—মন-ভুলা, মন-খারাপ, হাত-লাড়া, বিটি-দান, ঘর-আসা।

খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ :—কাঁইচিকাটা, সনায় বাঁধা, ধুলামাখা, পুয়ালচাপা, বঁটিকাটা।

গ) চতুর্থী তৎপুরুষ :—ইন্দ্ তাঁইড় (ইন্দ্ পূজার জন্য মাঠ), ছামড়া-খুঁটা, ঠেক-কাঠ, ফুঁক-নালী, জবরা-কুঁড়, ননদ পেড়ী, পরব থান, বাসিয়াম বাটী।

ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ :—আগাগোড়া, গাছপড়া, আগুনভয়।

ঙ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ :—উহুর গাঢ়া, মাচানতলা, ছাঁচতল, আঘন-সাঁকরাইত, কানমুথা, দুয়ার গোড়া, বিহানবেলা।

চ) সপ্তমী তৎপুরুষ :—জলঝাঁপ, কমর গুঁজা, পেছু লাগা, মাছি বসা, হাত-তোলা, গা-সওয়া।

ছ) উপপদ তৎপুরুষ :—হাঁটু-জাঁকা (হাঁটু-জাঁকা বন্দুক / গাদা বন্দুক), পাড়াবেড়ুনি, ছিঁচ্ কাঁদুনে, নাড়ি-টেপা।

৩। **কর্মধারয় সমাস**

ক) সাধারণ কর্মধারয় সমাস :—আলবেলা (আলো আছে এমন বেলা), এঁকা-বেঁকা, টেকা-মিঠা, রাঢ়বকা, জামাইছা।

খ) উপমিত কর্মধারয় সমাস ঃ—ডিংলা-পেটা, কাঁক্ড়ী-মুড়া, বাঁদর-মুখা, কটাসচোখা, চিরুণদাঁতী।

৪। **দ্বিগু সমাস**

দু-মুয়ানী, তিন-পেড়ে, দো-পেছা, চার-কুড়ি।

৫। **বহুব্রীহি সমাস**

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—উদাম-ষাঁড়ী, এক ঠেঙ্গা, হাবলা-মুয়া, চেপটা-নাকী।

খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি—গতরখাকী, জনমরাঁড়ী, বকাচদা, বরদেখা, বেলাডুবা, কুঁকড়াডাকা, কোদাল-দাঁ, ভাই-ভাতারী, আঙাশ-বিঁধা, মানুষমারী, গরভাখাউকী, কনে মারা।

গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি ঃ—ঠারাঠারি, ভালাভালি, হাতাহাতি, রেষারেষি, লুফালুফি, জঁটাজঁটি, খাম্চা-খাম্চি।

ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি—উঁচকপালী, চিরুণদাঁতী, চাঁদবদনী, বিড়েলচোখী।

ঙ) নঞর্থক বহুব্রীহি—লিলাজ, লিধন্যা, লিভাতারী, বে-আক্কেল, লিখোঁজ।

৬। **অব্যয়ীভাব সমাস**

বিকাল নাগাদ, ফি-সাল, ফি-বছর, উপকথা, হাভাতে, যথেচ্ছা, রাতভর, মাসতক, আবাল্য, ভর-পেট, মাঠ-কে-মাঠ।

মল্লভূমী শব্দকোষ

[সংস্কৃত=সং, প্রাকৃত=প্রা, বাংলা=বাং, হিন্দী=হি., উড়িয়া=উ., সাঁওতালী=সাঁ., বিশেষ্য=বি., বিশেষণ=বিণ., ক্রিয়া=ক্রি., ক্রিয়া বিশেষণ=ক্রি., বিণ., সর্বনাম=স., তুলনা=তু., সমাপিকা=সম., অসমাপিকা=অসম.]

অ

অঁকা—বিণ. অর্থ—বোকা, মূর্খ।

প্রয়োগ—আচ্ছা অঁকা লোক বট ত হে, এক বললে আর এক কর।

অগা / অঘা—বিণ. অর্থ—বোকা, নির্বোধ ; সং<অজ্ঞ।

প্রয়োগ—অমন অগামার্কা ছেল্যা দ্বারা জীবনে কিছুই হবেক নাই। (অগামারা / অঘামারা—বিণ. বোকাটে, সং<অজ্ঞ+মার্কা, (mark) ? তু. ষণ্ডামার্কা, 'মারা' শব্দটি এই অঞ্চলে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ম্যাদামারা, ল্যাদামারা।)

অগড়-বগড়—ক্রি. বিণ. এদিক-সেদিক, বেয়াদপি।

প্রয়োগ—বেশী অগড়-বগড় করবি তো দু চড় কসাঁই দুব।

অঁচা—বিণ. খারাপ।

প্রয়োগ—পয়সা দিয়ে জিনিস কিনব অঁচা জিনিস লুব ক্যানে ?

অঁটারা, অঁটরানো—ক্রি. ঠেসে ঢুকানো, খুব বেশী খাওয়া।

প্রয়োগ—ভালমন্দ পেয়ে যা অঁটরাইছি, এখুন আর দুদিন না খালেও চলবেক।

অদা—বিণ. স্যাঁতস্যাঁতে ; damp ; সং<উদক।

প্রয়োগ—অদাভুঁয়ে ছা-টাকে শুয়াও না, কফ বসবেক।

অঁধন>ওদন। (নাসিক্যধ্বনির প্রভাব হেতু অঁধন।)—বি. ভাত।

প্রয়োগ—অঁধন লিয়ে আড়বিলাতক বস্তে তবু তুমার পাত্তা নাই।

অনাছাড়া—বিণ. গালি অর্থে ব্যবহৃত। অন্ন+ছাড়া=লক্ষ্মীছাড়া।

প্রয়োগ—অনাছাড়া মরদের আবার বিয়ার কত সখ দেখ না।

অনামুয়া—বিণ. গালি অর্থে ব্যবহৃত।

প্রয়োগ—অনামুয়া মিন্‌সে, তুর মরণ নাই, জীবনটা আমার জ্বালাই দিল গ।

অলা—বি.>ওলা ; 'গোলা' শব্দজাত। মিছরির সাদা টুকরো।

প্রয়োগ—গরমে এলি, টুকচু বোস, অলার জল করে আনি।

অলঅল্যা—ক্রি. বিণ. এলোমেলো। প্রয়োগ—তুর বড্ড অলঅল্যা স্বভাব।

অসার—বি. প্রস্থ; চওড়া; বস্ত্রের পরিসর। সং<প্রস্থ<প্রসার<অসার।

প্রয়োগ—কাপড়ের অসারটা বড় খাট।

অসটা / অসঠা—বি. নঞ্‌ (অ)+সহ্‌ ধাতু; সং অসহ+স্বার্থিক 'টা'। অর্থ—অসৎ, অসহ্য। তু. সাঁ. ওসট=অসত্য।

প্রয়োগ—কি অসটা মা, সবটাতেই তুর অসটা।

অড়কঁক—বিণ নির্বোধ, বোকা—অমন অড়কঁক লুককে লিয়ে কুথাও যাতে নাই।

অড়বঙ্গা—বিণ. নির্বোধ, বোকা—অমন অড়বঙ্গা লুককে লিয়ে কুথাও যাতে নাই।

আ

আঁইঠা—বিণ. এঁঠো ; leavings of a meal. সং<আম্রষ্ট।

—আঁইঠা হাতে বসে ক্যানে—ইবার হাত ধোও।

আঁইড় / আঁইড়া—বি. কোলের ছেলের আগের ছেলে।

—আঁইড়া-লাগা ছেলা, কাহিল ত হবেক।

আইল—বি. আল, পাড়। —জমিটার আইল পাড়ের তালগাছটাই জমির শেষ সীমা।

আঁইড়া—বিণ. এঁড়ে (পুং বাচক)—সং<অণ্ড+ইক=অণ্ডক।

—ইবারেও আঁইড়া বাছুর হইছে—জড় (বংশ) হ'ল্য নাই।

আঁউড়ি—বি. খড়ের আঁটি ; নূতন খড়। সং<অষ্টি।

—আঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর—চল্‌ তুযু তুর আপন ঘর।

আওয়ালি—বি. সংখ্যাবিশেষ, কাহন।

—এক আওয়ালি খড়ের দাম দুকুড়ি দশ টাকা।

আকাল—বি. দুঃসময়। সং—অকাল।

—গটা বছরটাই আকাল গেল।

আঁকুর—বি. অঙ্কুর।

—ষষ্ঠী পূজার আঁকুর ভিজাও গোঁ, তালাকুর গুলান কাট ত বিটা।

অাঁক—বি. অঙ্ক, দাগ, বেড়া।—১) বাছা আমার কত অাঁক শিখেছে।
২) কালির অাঁক কেড়ো না কলঙ্ক হবেক।
৩) ও বৌ, দুয়ারের অাঁকটা টেনে দিয়ে এসো।

অাঁকাড়—ক্রি. জড়ানো।—ছেলাটাকে অাঁকাড় করে ধর—নয়তো পড়ে যাবেক।

আকল—বি. হাতে পায়ে কড়া পড়া। অজ্ঞাতমূল।
—জল তুল্যে তুল্যে হাতদুটায় আকল পড়ে গেল গ।

আখড়া—বি. আড্ডাখানা; সং<অক্ষবাট, অর্থাৎ পাশা খেলার জায়গা। বর্ত্তমানে আসর।
—মনোহরের মচ্ছবে আখড়াগুলা সাধু ও বাউলেই জমিয়ে রাখে।

আগাড়—ক্রি. গরুর গাড়ীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামনে জোয়ালের উপর উঠে বসা।
—আগাড় না কল্লে গাড়ীট উল্টে যাবেক।

আগনা—বি. অঙ্গন, আঙ্গিনা, উঠান।—আগ্‌নার মাঝখানেই ছাঁদনাতলা হোক।

আগড়া—বি. চালবিহীন ধান।—ধান কই গো, সবই যে আগড়া।

আগলান—ক্রি. নামধাতু; সামলানো; সং<অর্গলয়তি=দৃঢ়রূপেণ সংঘটয়তি।
—দামাল ছা, আগলান দায়।

আগটান—ক্রি. কারো খাওয়ার আগেই চলে যাওয়া।
—অমন আগটান করে নাই বা গেলে—গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

আগুড়—বি. খিল; সং<অর্গল।—রাত হইছ্যে ঘরের আগুড়টা টেনে দাও।

আগুন-জুমড়া—বি. অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড। গালি অর্থে ব্যবহৃত।
—ত্যা ধাঁস্তে দে আগুন-জুমড়া বুড়ার পুড়া মু-টাতে।

আগাম ঢাল—বি. আগামী বর্ষার সম্ভাবনা; প্রবল বর্ষণ। (আগাম+ধারা)
—আগাম ঢাল দেখ্যে মনে হচ্ছে ই-বছর চাষ ভালই হবেক।

আচ্‌কা, আচ্‌কাঁই—অব্য. হঠাৎ, অকস্মাৎ। সং আ+চমৎকৃত।
—কুন খবর না দিয়েঁ অাঁচ্‌কাই চলে এলম।

অাঁচল-খাড়ি—বি. অাঁচলে বাঁধা চাবি।
—ঘরের বৌ ঘরে আচই মা, তুমার অাঁচল-খাড়ি তুমিই লাও।

আজাড়া, আজড়ানো—ক্রি. খালি করা, ছেড়ে ফেলা। (অ-জটিত=বা জটিত নয়)

অাঁজির-বি. পেয়ারা। সং<অঞ্জীর=fig or ficus carica. ডুমুরজাতীয় ফল। কিন্তু এ অঞ্চলে এক শ্রেণীর ছোট পেয়ারাকে বলে অাঁজির।

—'এ্যাই হনুমান—আঁজির খাবি, দাঁত গিজুড়ে মরে যাবি।'

আঞ্জি, আঁজি—বি. চালুনি। মূল অজ্ঞাত, সং<অঞ্জলি থেকেও হতে পারে।

—আঁজি ট লিয়ে আয় ত, ময়দাট ছেলে লিই।

আঁজলা—বি. যুক্ত কর। সং<অঞ্জলি।

—আঁজলা ভরে ফুল এনেছি তুব তুমার চরণে।

আঝুড়া—বিণ. অমসৃণ।

—বদ্‌মাসী করেছ তো পিঠে পড়বে আঝুড়া বাঁশ।

আটা—বি. হি. আটা। গোধূমচূর্ণ। ময়দাবিশেষ।

—আগে লোক দেখ, তারপর আটায় জল দাও।

আটপেরা—বিণ, নিত্যব্যবহার্য।

—আটপেরা কাপড়টা ছেড়ে তোলাট পরে এসো।

আঁটি—বিণ. গুচ্ছ। —গরুটাকে এক আঁটি খড় দাও তো বাছা।

আটান, আটন—বি. সিংহাসন। (আটা+অন)

—সামনের পূন্নিমাতে সত্যনারাণের আটন তুব।

আটু-পাটু—ক্রি. বিণ. অস্থির।

—তুমার লেগে মনটা আমার করছে আটু পাটু।

অটা, আটা—বি. শিকারের জন্য পাতা ও কাঠ দিয়ে তৈরী ছোট ঘর।

—সর্দার, আজ বেশ মেঘচ্ছা করেছে অটা বাঁধব নাকি ?

আঠা—বি দেশী √অট্ থেকে উৎপন্ন। জোড়া দেবার উপকরণ।

—'পিরিতি এমনি আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না।'

আঁঠি—বি. শক্ত অংশ। সং অস্থি>প্রা. অন্‌ঠি>বাং. আঁঠি।

—কি আমই এনেছ, শাঁস বলতে ত কিছুই নাই আঁঠিই সার।

আঁত্‌ড়ি—বি. নাড়ীভুঁড়ি।

—গাড়ির তলায় পড়ে ছাগলটা একেবারে আঁতড়িগালা হয়ে গেল।

আদ্দা—অব্য. একেবারে।

—আদ্দা মিছে কথাটা বলিস না মাইরি।

আদাৎ—বি. যার সব দাঁত বেয়োয়নি।

—কিচ্ছু জানে না একবারে আদাৎ গরু।

আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে—ক্রি. বিণ. আনাচে-কানাচে।

—তিতা কাল্লারে আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ধইরেছ্যে।

আদুড়া—বিণ. অর্ধাংশ। —আদুড়া বস্তাটা থেকে চাল বার কর।

আদ-পেঁদড়া—বিণ অর্ধাংশ।

—ভারী লাগছে ত আদ-পেঁদড়া করে লাও।

আঁদ—বি. জোত, গরুকে চাষের যে দড়ায় বাঁধা হয়।

—যা ত বাপ, খপ করে আঁদ দড়িটা লিয়ে আয়।

আন্‌খা, আন্‌খাই—ক্রি. বিণ. অজানিত, মিথ্যা, অনর্থ।

—আন্‌খাই বললেই হল আমি মেরেছি।

—তু আন্‌খাই বকে মরছিস্ কেউ শুনবার নাই।

আঁপটান—সম. ক্রি. পিছন থেকে জাপটে ধরা। সং<আপ্নোতি।

—অমন জুয়ান লোকটাকে আঁপটানে ফেলাই দিল, মরদ বটে।

আপনা-পর—অব্য. আপন এবং পর।

—আহা, কি উদার মন দেখেছ কোন আপনা-পর নাই।

আবট—বিণ. মোটাসোটা। অকর্ষিত। সং<অবট।

—ইটা আবট জমি বটে।

আমলান—অসম. ক্রি. নামধাতু। সং<অম্লায়তে। টকে যাওয়া।

—জাঁদা আমট খাঁয়্যে দাঁতগুলান আমলে গেল মাইরি।

আরসা—বি. সং<অরস ; রসশূন্য বড়াজাতীয় পিষ্টক।

—ভাদু পরবের পেসাদই হ'ল আরসা আর লাড়ু।

আলতি—বি. কচু।

—ক্যা কুথাকার ক্যা গটা দুই আলতি ভাতে দে।

আলান—বি. চলে যাওয়া অর্থে, কিংবা মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থে।
সং<আকুলয়ন / ইলন।

—মিষ্টি খায়েঁ্য ব্যাতট আলান হয়েঁ্য গেইচে।

আলুনি / আলোনা—বিণ. সং অ-লবণ। নুনহীন। Saltless.

—এ্যামন রাঁধলে বৌ সব তরকারীগুলানই আলুনি।

আস্কা—বি. একধরণের পিঠা।

—সরুচুক্‌লি থেকে আস্‌কা পিঠা খাতে আমার ভাল লাগে।

আলা—বি. আলো, light.

—রেতের বিলা ঘাটে যাচ্ছ, হাতে আলাটা লিয়ে যাও।

—আলা হাতে কুথা যাচ্ছ বিয়ান ?

আলা-মারা—ক্রি. ক্লান্ত হওয়া। সং<আকুল।

—সেই সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে আলা-মারা হয়েঁ্য গেলম।

আড়—বিণ. সং<অর্ধ>প্রা. অড্ঢ>বাং আড়।

অর্থ—ঈষৎ বাঁকা।—আড় নয়নে ভালাভালি
ভাবছ আমি বুঝতে লারি।

আড়—বি. পাড়।—মাঠের আড়ে আমাদের সেই বাবলা গাছটা আছে ত?

আড়া—সকর্ম. ক্রি. পেতে দেওয়া, আটকিয়ে আসা।

—লদীতে ঘুনীআড়া লিয়েই ছেলাই ছেলাই মারামারি।

আড়া—বি. সং<আঢ়ক। শস্য মাপিবার পাত্র।

—'পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান।' কবিকঙ্কণ।

আড়ি—বি. ১) আ (ই)+ড়=ধানজমির সীমা। সং<আলি>আড়ি।

আড়ি—ক্রি. ২) আড়্+ই=অন্তরাল, অবস্থান, আড়িপাতা।

আড়ি—বিণ ৩) আড়্+ই=মনোমালিন্য, বিদ্বেষ।

আড়কোলা—আড়ষ্টভাবে কোলের উপর তুলে নেওয়া।

—নিজের থেকে আসবে নাই ত আড়কোলা করে তুলে নিয়ে আয়।

আড়বেলা—বি. বিকাল বেলা। সং<অর্দ্ধ>অড্ঢ>আড়।

—আড়বেলাতে জলকে যাবি, শ্যামের বাঁশী শুনতে পাবি।

আড়বংগা—বিণ. আড়=অর্ধ+বোংগা=দেবতা। অর্ধদেবতা, অর্থাৎ অবুঝ।

—আচ্ছা আড়বোংগা লোক বটে যাহোক বুঝালে বুঝে না।

আংরা—বি. জলন্ত কয়লা বা কাঠের টুক্‌রো। সং<অঙ্গারক।

—'আগুন খাবি ত আংরা হাগবি'।

আড়ে-খাড়ে—বিণ. বেতালে / বেসুরে।

—ধমকালে ভাই আড়ে-খাড়ে ধাম্‌সা বাজাই দুব।

ই

ই—সর্ব এই।

ইচ্‌লা / ইচ্‌লি—বি. সং<ইঞ্চাক। চিংড়িমাছ।

—ইচ্‌লা মাছের টক্ দিয়েঁ্য একথালা ভাত খায়েঁ্য দিল।

ইঁচ্‌রা—সম, ক্রি. সং<আ √চট=আঁচড়>আঁচড়ান>ইচরান>ইঁচরা।

অর্থ—অঙ্গুলি সঞ্চালন করা, বা খুঁচিয়ে দেওয়া।

—উনানটা ইঁচ্‌রিয়ে দেখ ত আগুন আছে কি-না।

ইঁজোল-পিঁজোল—বি. সং<ইন্ধন=প্রজ্বালন, পোড়ান।

—ইঁজোলে-পিঁজোলে বুড়াবুড়ির পঁদটা পুড়া রে।'

(দীপান্বিতা উৎসবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাটকাঠিতে আগুন লাগিয়ে উক্ত ছড়া বলতে বলতে কালী মন্দিরে প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি কৃষি উৎসবের অঙ্গবিশেষ। ধানের পোকা মারবার জন্য এই নিয়মোৎসব)।

ইদ্দিন—সর্ব. আজকাল—These days ;

—ইদ্দিন আর সিদ্দিন নাই গ সব কুছুই মার্গ।

ই বাগে—সর্ব. এদিকে।—শুনছ, ই-বাগে একবার এসো ত।

ইতিউতি—বিণ. এদিক-ওদিক।

—ইতিউতি ভালল্যে কি হবেক নাগর এখন আসে নাই।

ইঠিন্-সেঠিন—সর্বন. এখানে-সেখানে।—'মাথা খুঁড়লেও কুঁয়ায় নাইক জল,
ইঠিন-সেঠিন—অচল জলের কল।'

ইশন—'বিণ. খুব বড়।

উ

উ—সর্ব. ওই, সে ; you.

উগ্গুপাড়া—ক্রি. উঁকি মারা।

—আলাটা আন তো বৌ, দেখি ক্যা উগ্গু পাড়ল।

উগ্রান—অস. ক্রি. উৎ√গৃ=বমি করা।

—খাচ্ছ খাও উগরাও না।

উইমেকা—বি. উইঢিপি।—ঘরের ভিতর কি বড উইমেকাটা হইছে দেখ।

উচ্‌কা/উচ্‌কানো—ক্রি. উৎসাহ দেওয়া। উস্‌কা>উচ্‌কা।

—সঙ্গে লিয়ে যাব বলে বেশত উচ্‌কাই দিলে—ইবার সামলাও।

উছড়া/উছুড়া—ক্রি. বমি করা। সং<উচ্ছল>উহ্বল, কিংবা সং<উৎ√ছর্দ>
প্রা. উচ্ছড্ড>বাং উছল/উছড়।

—যা খাওয়ালে সব উছুড়ে দিলেক।

উঠান—বি. অঙ্গন, আঙ্গিনা, উচ্চভূমি।

—সন্ধ্যার মজলিসটা উঠানেই বসুক।

উঁকা—বিণ. গোঁয়ার, বদরাগী। সং<উক্ষা (ষাঁড়)>প্রা. উংখা>বাং উকা।
(ষাঁড়ের মত একরোখা)

—উ বড় উঁকা লোক বটেক, উয়াকে লিয়ে পারা যাবেক নাই।
উড়াকল—বি. এরোপ্লেন।—কি যুগ এলো লো কলিকালে, মানুষ উড়ে উড়াকলে।
উড়বার—ক্রি. পরিধান করবার।—গায়ে উড়বার মতন একটা জামাও নাই দিদি।
উড়ুনি—বি. চাদর, ওড়না।—বাইরে বেরোচ্ছ উড়ুনিটা গায়ে দাও।
উৎলান/উথলান—অসম. ক্রি. উপচে পড়া। সং<উত্তলন।
—দুধটা উথলে গেইচে নামি-ই রাখ।
উদ্মা—বিণ. ফালতু. অযথা। সং<উদ্দাম।
—কাজ নাই, কম্ম নাই, উদ্মা ঘুরে বেড়ালেই হবেক।
উ-দিন—বি. গতকাল।
—উ-দিন মিটিং এ সবাই আল্য তুমি আল্যে নাই ক্যানে?
উপ্‌কা/উপ্‌রি—বিণ. বাড়তি।—আগলটাই সামলাতে লারচি আবার উপ্‌কা?
কিংবা, বিয়া করি বৌ পালি, উপরি পাওনা বুঝি শালীটা?
উব্‌-জলন্ত—ক্রি. বিন. অত্যন্ত উষ্ণ।—উব্‌-জলন্ত ভাতকটা কুনো রকমে গিলে লিয়ে উ বের‍ঁাই গেল।
উবু—বিণ. উঁচু।—অমন উবু হয়েঁ্য বস্তে কি করছ?
উর্‌মাল—বি. রুমাল। বর্ণবিপর্যয়।
—টেরি বাগিয়ে উরমাল হাতে যাচ্ছ কুথায় নটবর?
উরুলি-ঝুরুলি—বিণ. এদিক-সেদিক।
—উরুলি-ঝুরুলি বহুত ঝিঙা জালি পড়েছে।
উলখী/উল্কি—বি. সং<উৎ+√লিখ্‌+ই=উল্লিখি। Taboo.
—তু কি সাঁওতাল? যে হাতে গলায় উল্‌খি আঁকাবি?
উলান—ক্রি. পরিষ্কার করা।
—ছেলার মা হইছ গু উলাতে ঘিন্না করলে চলবেক ক্যানে?
উস্থর-পুস্থর করা—যৌ. ক্রি. উস্‌খুস্‌ করা।
—কি লো বিম্‌লি, বাপের ঘর যাবার লেগে মনটা বুঝি উস্থর-পুস্থর করছ্যে?
উজাই যাওয়া—স. ক্রি. পার হওয়া, অতিক্রম করা।
—ভরা নদী—উজাই যাওয়া যাবেক নাই

এ

একল্যা সেঁড়্যা—বিণ. (একল+সাণ্ড); যে একাকী থাকতে ভালবাসে।
—একল্যা সেঁড়্যা নিজের সুখটায় বুঝে, মা-বাপ, ভাই-বুন ক্যা কার?

এক খেপ—অব্যয়। একবার।

—নারদের নিমন্তন্ন, এক খেপ উঠতে না উঠতেই আর এক খেপ বসবার জন্য ঠেলাঠেলি।

একাশ/একাশী—সংযোগ ক্রি. একপাশ হওয়া।

=একপার্শ্বী>একপাশী>একআশী>একাশী।

—একাশী করে শুইয়ে শুইয়ে ছেলেটার ছাতিটা সরু করে দিলে মা।

এগ্‌না—বি. উঠান। সং<অঙ্গন>এগ্‌ন।

—এগ্‌নায় দাঁড়াই দাঁড়াই কুথা চল্যেই চলে যাচ্ছ ঘরবাগে আসবে নাই।

এলকুনো—ক্রি. ভ্যাঙ্গানো, ভেংচানো।

১) উটা কাদের ছা বটে রে, এলকুয়ে চল্যে গেল।

২) থাম, দাঁড়া তুর এলকুনো বার কচ্চি।

এলে গণ্ডুগুলে—ক্রি. বিণ. গায়ে পড়ে ঝগড়া করা।

—তুমার মতন এলে গণ্ডুগুলে নোক দেখি নাই বাপু, হুঁ করতেই গণ্ডুগুল।

এ্যালপু—বিণ. অল্প, একটু।

—অ মা, এ্যালপু খাতে দিবে গ।

এলানো—ক্রি. নষ্ট হওয়া, এলিয়ে যাওয়া।

১) রেতের বিলায় ভাতগুলায় জল দিস্ নাই এলিই গেইচে।

২) পটের বিবির মতন গা এলিয়ে পড়ে না থেকে গা-টা তুল।

ও

ওল—বি. মূলজ খাদ্যবস্তু।—ভাদরের রেঁধে রাখায় ওল বড়া করতেই হয়। (রেঁধে রাখা=রান্না করে রাখা বাসী অন্নব্যঞ্জন। ভাদ্রমাসের মনসা বা বিশ্বকর্মা পূজায় বাসীরান্না খাওয়ার অনুষ্ঠান এ অঞ্চলের একটি লোক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ।)

ওলা—বি. মিছরির ডেলা।—নুনুটাকে একটু ওলার জল খাইয়ে দাও।

ওঁচা—বিণ. বাজে, খারাপ।—যতসব ওঁচামার্কা লোকের সঙ্গে মিশে মিশে তুমার বারোটা বেজেছে।

ক

কুইয়া—ক্রি. বারবার লোভীর মতো চাওয়া।

কাঁই—ক্রি. চেঁচান।—'কুকুর করে কাঁই, বাউরীর বিয়া নাই।'

কাঁই বীচ—বি. তেঁতুল বীজ।

কাঁই কটারী—বি. কেন্নো।
কঁকা—বিণ. বোবা।—(বোবারা অনেক সময় কঁক্ কঁক্ করে কথা বলবার চেষ্টা করে, তারই অনুকার ধ্বনিতে এই শব্দ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।)
কুক্ড়া—বি. মোরগ।
কুক্ড়ী—বি. মুরগী।
কেঁক্লাস—বি. গিরগিটি। <কৃক্লাস—ফেউ। Chameleon.>
কঁকান—ধ্বন্যাত্মক ধাতু। √কঁক=ধ্বনি করা বা শব্দ করা। অর্থাৎ গুমরে গুমরে কাঁদা।
কুঁক্ড়ানো—ক্রি. বেঁকে যাওয়া। (সং কুঞ্চন)
কাঁকাল>কাঁকা (ই) ল—বি. কোমর। কাঁকালি<কাঁকাইল<কাঁকা'ল]।
কাক্তী—বি. ছোট জাতের কচ্ছপ।
কাঁখ—বি. মূল শব্দ কক্ষতল বা কোল।—কাঁখে ছেলাটা বসাই লে।
কেগা/কেয়া—বি. কাক।—কেগাটা তাড়া রে, পাতে মু দিয়ে দিবেক।
কঁচড়—বি. ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ (কোচং রাতি ইতি কোচড়ঃ)।
—কঁচড় ভর্যে শাগ তুলছি, রাঁধবি লরম কর্যে।
কঁচড়া—বি. মহুয়া ফল।—বহুত দিন বাদে কঁচড়া ভাজা খেলম।
কচলান—সম. ক্রি. ধৌত করা।—জল কচ্লানো কাপড়টাই দাও।
কচুকাটা—কেটে নির্মূল করে দেওয়া।
কাছাড়—ক্রি. পড়ে যাওয়া।—বুড়া বয়সে কাছাড় খাওয়া—দরদ ত লাগবেই।
কাছিম—বি. কচ্ছপ।—কাশ্যপ গোত্র তাই কাছিম খাওয়া নিষেধ।
কুঁজো/কুঁজা—১) কুব্জ হওয়া বা বেঁকে যাওয়া। ২) জল ঠাণ্ডা রাখার মাটির পাত্র]।
কটা—বিণ. ফর্সা।—'কটা মন চটা, কালোর মন ভালো।'
কাটান—ক্রি. কেটে দেওয়া বা প্রতিরোধ করা।
—জাত সাপে কেটেছে, কাটান দেওয়া অত সহজ লয়।
কুটি/কুটা—বি. ১) খণ্ডাংশ। ২) ক্রি. কাটা, কর্তন করা।
১) খড়কুটা, ঘাসপাতা যগাড় কর তারপর আগুন ধরাবি।
২) 'ডিংলা কুটতে লারে বৌড়ি, মাছ কুটতে দৌড়াদৌড়ি।'
কুঠা—বি. কুষ্ঠ ব্যাধি; কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি।
১) পরের মেরে খা কুঠা হবি।

২) কুঠা লকের এঁঠা সাক্ষাৎ বিষের মরণ।

কেঠো—বিণ. কাষ্ঠবৎ ; কাষ্ঠনির্মিত।—কেঠো লোকের দেঁতো হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়।

কোঠা/কঠা—বি. মাটির তৈরি দ্বিতলবিশিষ্ট গৃহ ; মাটির দোতলা বাড়ি।

কেটো>কেঠো—বি. কৌটা।—লক্ষ্মীর সিঁদুর কেটোয় টাকাটা তুলে রাখ।

কুটুম—বি. আত্মীয়।

কাইট/কাট—বি.<কিট্ট=ক্লেদ।—কড়ায়ে ত্যাল কই গ, শুদু যে কাট (কাইট)।

কঁটরা—বি. মাটির ছোট বাটি।—কুমোর ঘরে ২০০ কঁটরা আর ২০০ গেলাস অর্ডার দিলেই হবেক।

কঁ্যাট কঁ্যাট—ধ্বন্যাত্মক ধাতু ; তীক্ষ্নভাবে।—আজকাল অত সহ্যের যুগ নয়, শাশুড়ি বললে আমিও কঁ্যাট কঁ্যাট করে শুনিয়ে দুব।

ক্যাটক্যাট—বিণ, চড়া, উগ্র।—শাড়িটার কি ক্যাটক্যাটে রং।

কেতার্থ, কেতাত্ত করা—যৌ. ক্রি. সং কৃতার্থ ; ধন্য করে দেওয়া।—মাসে মাসে ২০০ করে টাকা দিয়ে আমাকে একেবারে কেতাত্ত করে দিয়েছ।

কৎকের—কত দামের।

কাতুকুতু—যৌ. ক্রি. অঙ্গুলি সঞ্চালনে সুড়সুড়ি দেওয়া।

কাঁথ—বি. দেওয়াল বা প্রাচীর।

কদু—বি. লাউ (সব্জীবিশেষ)।

কুদ্‌রা—বি. ভূত (আদিবাসী দেবী)।

কুঁদা—ক্রি. সং কূর্দন ; লাফান।

কুঁদকুন্দা—বিণ, সুস্বাস্থ্য।—মামা ঘরে খায়েঁ্য খায়েঁ্য আচ্ছা কুঁদকুঁদাটি হয়েঁছ্য।

কানি—বি. ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা।

কানি—বিণ. একচক্ষুহীন নারী, গালি অর্থে। মনসাকে বলা হয় চ্যাংমুড়ি কানি।

—'যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি
সে হাতেতে না পূজিব চ্যাংমুড়ি কানি।' —চণ্ডীমঙ্গল।

কানকুয়া—বি. ১) কানের ময়লা। ২) মাছের কানাশি।

কামিন—বি. (কাম+ইন্)—পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করে যে মহিলা।

কামানো—ক্রি. অশৌচের পর ক্ষৌরকর্ম করা>ক্ষৌরকর্ম করা।

কামিত্যা—বি. দেবদাসী বা দেবতার সেবিকা।

কফ—বি. ঠাণ্ডালাগা, সর্দি।—শশা খায়েঁ্য কফ করেছ্যে।

কবুল করা—যৌ. ক্রি. স্বীকার করা।—সত্যি কথাটা যতক্ষণ না কবুলছ্য ততক্ষণ ছাড়া পাচ্ছ নাই।

কলঙ্গা—বি. জিনিসপত্র রাখবার জন্য দেওয়ালের তাকবিশেষ।

কাল্লা—বি. করলা>কাল্‌লা—একধরণের তেতো সব্জী।

—তিতা কাল্লারে উরুলি-ঝুরুলি ধর্‍্যেছ্যে।

কালা—বিণ. ১) ঠাণ্ডা, ২) কৃষ্ণবর্ণ।

কুলুপ—বি. চাবি।

কুল্‌হি—বি. কাঁচা রাস্তা।

কুল আঁঠি—বি. পায়ের আকল।

কুলকুলি—বিণ. আনন্দধ্বনি।

কিস্‌কিস্‌—বিণ. তেজ বা রাগ।

১) কাউকে কিছু বলতে পারছ না শুধু শুধু ছেলাটার উপর কিস্‌কিস্‌ করছ।

২) আচ্ছা কিস্‌কিসে ছেলে বটে বাবা।

৩) ওকে একদম ঘাঁটিও না, দেখছ না রাগে কিস্‌কিস্‌ করছে।

কেঁড়ুলি—বি. মাসকলাই। এক জাতীয় ডাল।

—আলুপস্ত, ডিংলার ঝাল;
ভাতে মাখবে কেঁড়ুলির ডাল।

কড়কড়া—বি. শক্ত মুড়ি। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যা চিবানোর সময় কড়কড় শব্দ হয়। তু. সং কড়ঙ্গর।

১) কাড়া—বি. মহিষ।—'বুড়া কাড়া লিয়ে জামাই
সিধার দিকে গেল সিঁধাই।'

২) কাড়া—ক্রি. শুরু করা, প্রচলন করা বা ব্যবহার করা।

—সংক্রান্তিতেই নতুন হাঁড়িটা কাড়বে।

৩) কাড়া—ক্রি. পরিষ্কার করা।—হেঁশেল কাড়া থেকে শুরু করে গুয়াল কাড়া পর্য্যন্ত সকাল থেকে তো কাজের অন্ত নাই।

৪) কাড়া—ক্রি. বলা। যেমন—বা কাড়া, বাপ কাড়া (গালি অর্থে)।

কঁড়চ—বি. ট্যাঁক। ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ।

কুড়মী—বি. জাতিবিশেষ।

কুড়া—বি. গরুর খাদ্য। ধানের খোসার মিহি গুঁড়া।
কুঁড়্যা—বিণ. অলস।
কাঁড়—বি. তীর।
কুয়া—বি. কূপ ; ২) কুয়া—বি. কোষ ; যেমন—কাঁঠাল কুয়া, লেবু কুয়া।

খ

খঁকা<খোকা—বি. বেটা ছেলে। খুঁকী—বি. মেয়ে ছেলে।
খেঁকী—বিণ. রাগী, মেজাজী।
খেঁকান—ক্রি. বকুনি দেওয়া, মেজাজ দেখান।
খঁকরান—স. ক্রি. চাঁছা বা খুঁটিয়ে তুলে নেওয়া।
—বাটিট খঁকরে চাঁছিট খাঁয়্যে লে।
খখলা—বিণ. যে-সব শিশু বুকে পিঠে সমান। যেমন—খখলা ছা।
খখর—বি. গাছের গুঁড়িতে পাখীর বাসা।
খখরা—বিণ. ফাঁকা, নষ্ট।
খঁচ—বি. তীক্ষ্ণ শলাকা, চঁচ।
খেঁচ, খঁচা—বিণ. রাগী, বদ্‌বেজাজী।
খাঁচি—বি. ছোট ঝুড়ি।
খঁজ—বি. গাছের গর্ত।
খঁটা, খোটা—বি. যূপকাষ্ঠ। খোঁটা দেওয়া—ক্রি. বিদ্রূপ করা।
খুঁটা, খুঁটি—বি. কাষ্ঠদণ্ড।
খাটলা—বি. গরুর গাড়ির ছইয়ের উপরের বেড়া।
খিটখিটে—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রাগী।
খাট্‌কা—বি. শ্মশান।
খুঁত—বি. বিকৃত। খত্তাল—বি. মন্দিরা। সং<কত্তাল=করতাল।
খুঁতখুঁতে—বিণ. সংশয়াচ্ছন্ন।
খেত—বি. ক্ষেত্র>খেত।
খঁদড়—বি. কোটর। সং কন্দর।
খঁদা—বি. পাখীর বাসা।
খাঁদা—বিণ. চেপ্টা।
খ্যান—অব্যয়। সময়। ক্ষণ>খ্যান।
খানি—বি. অংশ (মধ্যাংশ)।—মাছের মুড়ো নেবে না খানি নেবে?

খাপ—বি. ঢাকনা।
খ্যাপা—বি. পাগল।
খাপি—বিণ. মোটা, শুরু।
খপরি—বি. মাথার খুলি।<খর্পর।
খাপরি—বি. মাটির বড় গামলা।
খুপরি—বি. ছোট্ট ঘর।
খেপি—বি. পাগলি।
খাপ খাওয়ান—ক্রি. মানিয়ে নেওয়া।
খপ্—অব্যয়। দ্রুত, সত্বর।
খাপি খাওয়া—ক্রি. ভিরমি খাওয়া।
খেপে খেপে—ক্রি. বিণ. থেমে থেমে।
খ্যামটা—বি. একপ্রকার নাচ।
খমস্তা—বিণ. স্বার্থপর।
খামার—বি. বসতবাড়ির সংলগ্ন গোলাবাড়ি।
খামচা—বি. মুষ্টি, মুঠো।
খরা—বিণ. উত্তপ্ত, গ্রীষ্ম।
খরখর—শব্দদ্বৈত। তাড়াতাড়ি।
খর—বিণ. তীক্ষ্ণ।
খুরা—বি. পায়া (পা)।
খুরি—বি. বড় পাত্র।
খেরো—বি. লাল মোটা বস্ত্র, শালু।
খরখস্তা—বিণ. কর্কশ।
খলা—বি. মাটির পাত্র বা মাটির কড়াই।
খিলি—বি. মোড়ক<খুঙ্গি<খণ্ড।
খলাম—বি. হাঁড়িভাঙা (কল্লাল)।
খেলো—বিণ. নিম্নমানের।
খোলতায়—বিণ. উজ্জ্বল, সুন্দর।
খালা—বি. পাতার তৈরি বাটি।
খালুই—বি. বাঁশের তৈরি মাছ ধরার পাত্র।
খস্‌খস্তা—বি. কর্কশ, অমসৃণ।

খসর খসর—শব্দদ্বৈত। খস্ খস্ শব্দ।

খড়—বি. ধানের শুক্‌নো গাছ।

খেঁড়ো—বি. লাউজাতীয় ফল। (শব্জী)

১) খাড়া—বি. ডাঁটা। ২) খাঁড়া—বি, খড়গ ৩) খাড়া—সোজা।

১) খুঁড়া—ক্রি. খনন করা। ২) খুড়া—বি. কাকা<খুল্লতাত। ৩) খুঁড়া—নজর লাগা।

খুড়ি—বি. কাকীমা।

খোয়াড়—বি. ভ্রাম্যমাণ পশুদের কারাগার।<কোটর। হি. খড়হর। গ্রাম বাং—খোঁড়ল, খোঁদল।

থুয়া—বি. আখের ছিবড়া।

গ

গাঁইগুঁই—ক্রি বিণ. ইতস্ততঃ।

গঁক্ গঁক্—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রাগে একেবারে গঁক্ গঁক্ করছে।

গঁগান—ক্রি চিৎকার করা।

গুগলি—বি. শামুক।

গা গুরা—ক্রি. শীত করা।—ঠাণ্ডা বাতাসটায় গা গুরাচ্ছে।

গচ্চা—বিণ. ক্ষতি।

গজাল—বি. পেরেক।

গজগজ—ক্রি. বিণ.—কলহ। আপনমনে বকা।

গেঁজাড়ে—বিণ. ঘনভাবে।—একটা রাত বই ত নয়, গেঁজাড়ে শুয়ে পড়।

গঁজা—বি. ঠেকা। Support.

গাজন—বি. মেলা। একসঙ্গে মিলিত হওয়ার উৎসব।

গজড়—বিণ. ঝামেলা।—কাজটায় আচ্ছা গজড় লেগেছে বটে!

গজান—ক্রি. জন্মান।

গেঁজে—বি. কোমরে পয়সা রাখার জাল বা বাঁশের নল।

গিজড়া—অ. ক্রি. দাঁত বের করা বা হাসা।<গর্জতি।—'বাঁদরি কলা খাবি দাঁত গিজুড়ে মরে যাবি।'

গটা—বিণ. সমগ্র। Total.

গাঁট—বি. মোট, বোঝা।

গাঁঠ—বি. আকল, শক্ত বন্ধন।

গুঁতান—ক্রি. খোঁচা দিয়ে মারা।

গতি—ক্রি. উদ্ধার।

গতর—বি. শরীর, স্বাস্থ্য।

গৎ—বি. তাল, সুবিধা।

গাদ—বি. নোংরা। (তেল বা গুড়ের তলাকার নোংরা)

গিদার—বি. গর্ব, অহংকার।

গদাম—ক্রি. বিণ. জোরে আঘাত করা।

গোদা/গদা—বিণ. মোটা।

গাদাল—বি. ভীড়।

গাঁদাল—বি. একধরণের ভেষজ লতা।

গদগদ—বর্ণদ্বিত্ব। ঘন, পরিপূর্ণ।—তু যে দেখছি ভাবে গদগদ হয়েঁ্য যাচ্ছুস্।

গাদা—বিণ. প্রচুর।

গাদাগাদি—বিণ. ঠেসাঠেসি।

গিদি/গিদ্‌রি—বি. ঘিলু।

গঁদল—বি. শিশুকে দুধ খাওয়ানোর ঝিনুক। Infant's feeding spoon.

গাদর—বিণ. ডাঁসা—ভাদর মাসের গাদর আঙ্গির তরাই খাঁয়ে ফুরালি।

গেদে গেদে—ক্রি. বিণ. অতিরিক্তভাবে। ঘাঁটাঘাঁটি করে। তু. বাং গাদ অথবা গাদা=প্রচুর, রাশিকৃত। তেলেগু প্রত্যয়—গড্ড; কন্নড—গড্ডে=গাদা, তাল, তেলা, কিনারা; (দ্র. O. D. B. L. By S. K. Chatterjee, p. 66), হি. গড্ড মড্ড।

গাধড়া—বিণ. নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধজাত ছানা। বৎস প্রসবের ২১দিন পর্যন্ত গাভীর দুগ্ধকে ছানা করলে গাধড়া/গাদড়া তৈরি হয়।

গাঁধি—বি. অত্যধিক গরমবশত পুকুরে মাছ মরে যাওয়ার রোগবিশেষ।

গনগন্যা—বিণ. খুব বেশী, অত্যধিক।—উনুনটায় এখনও গনগন্যা আগুন রইছ্যে।

গুণিন—ওঝা; যে গুণ করতে পারে।

গণৎ—বি. জ্যোতিষী; যে গণনা করতে পারে।

গন্নাকাটা/গণ্ডাকাটা—বিণ. জন্ম থেকে উপরের ঠোঁট কাটা।

গুপ্‌চুপ্—বি. ফুচ্‌কা।

গুঁপান—ক্রি. কনুই দিয়ে আঘাত করা।

গুঁপা—ক্রি. আঘাত। (বিশেষতঃ পায়ের তলার আঘাতকে গুঁপা খাওয়া বলে।)

গোবদা—বিণ. হৃষ্টপুষ্ট ; স্বাস্থ্যবান।

গুবগুবি—বি. একতারা (একধরণের বাদ্যযন্ত্র)।

গাবদাঘাঁটা—বি. খিচুড়ির মতো মিশ্রিত বস্তু।

গাবান—স. ক্রি. রঞ্জিত করা ; গাব (কেঁদ গাছ) শব্দ থেকে নামধাতুতে পরিণত।

গব/গাব—১) বি. গর্ত করে কড়ি দিয়ে খেলা।

গুমান—বি. অহংকার।

গুমাড়—বিণ. গরম।

গুমা/গমক—বি. গন্ধ।—গমটা রোদে দাও গো বর্ষায় গুমে গেইচে।

গর‍্যা—বি. ১) ঘড়া ; সং ঘটিকা। ২) গরা—বিণ. ফর্সা।

১) গর‍্যাটা বার কর জলকে যাব। ২) একে বৌয়ের গরা গা তাই হয়েছে বেটার মা।

গুলগুলা—বি. চুলকানি।

গোড়া—বি. শুরু, আরম্ভ, প্রথম।—ঘটনাটা গোড়া থেকে শোনা যাক।

গোড়্যা—বি. ছোট পুকুর।—খপ্ করে গোড়্যাটায় একটা ডুবে এসো।

গাঢ়—বিণ. ঘন, গভীর। যথা—গাঢ় রং, গাঢ় ঘুম ইত্যাদি।

গাড়—বি. গর্ত।—বর্ষায় গাঢ়ে জল ঢুকলেই সাপের দৌরাত্ম্য বাড়বে।

গঁড়—বি. ঢেঁকির গর্ত ; গড়—দুর্গ।

গড় করা—ক্রি. ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা।

গেঁড়া—বিণ. বেঁটে।

গেঁড়ি—বি. শামুক, গুগলি।

গুড়্যা, গুড়ে—বিণ. মিষ্ট (গুড়ের মতো মিষ্ট)।

গুড়গুড়্যা—বি. ছোটখাট।

গাঢ়/গাড়াগাড়ি—বিণ. কঠিন।

গস্‌গসে/গুস্‌গুসা—অল্প অল্প।—গুস্‌গুসা জর।

গয়ের—বি. কফ।

গুয়াল—বি. গোহাল, গোগৃহ।

গায়েন—বি. গান।

গোঁয়ার>গুঁয়ে—বিণ. একরোখা।

ঘ

ঘা—বি. ক্ষত। ঘা—ক্রি. আঘাত।

ঘাই—ক্রি. আঘাত। ঘুঘি—বি. বাঁশের কঞ্চির তৈরি মাছ ধরার পাত্র।

ঘাঙর—বি. রবিশস্য। রমা শুঁটি।

ঘেঁচড়—বিণ. একগুঁয়ে। বেয়াদপ।

ঘেঁচু - বি. শূন্য, কিছু নয়।

ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচাং—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

ঘেঁচ/ঘেঁচু—বি. ঘন। ঘ্যাঁচা—বিণ. সংলগ্ন, ঘনিষ্ঠ।

ঘিঁচি কড়ি—বি. ছোট্ট কড়ি।

ঘাঁটা—বি. গরুর খাদ্য। বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণ।

ঘাট—বি. পুকুরের রাস্তা। ২) ঘাট—বিণ. দোষ।

ঘাট বসা—ক্রি. বাইরে পায়খানা যাওয়া।

ঘেঁটু—বি. একধরণের বনজ ফুল। ২) ঘেঁটু—খোস-পাঁজরার দেবতা।

ঘাঁটকান—ক্রি. খেপিয়ে দেওয়া, রাগিয়ে দেওয়া, ঘোলা করা।<ঘণ্ট।

ঘুণ্যা—বি. এক শ্রেণীর জাল।<ঘূর্ণ।

ঘাপচি মেরে—ক্রি. চুপিসারে, আত্মগোপন করে।

চ

চাঁই—বি. খণ্ডাংশ। নেতা বা প্রধান ; ring leader.

চাঁই-চোর—বি. প্রধান চোর। গালি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চুঁই চুঁই—ক্রি. বিণ. চুঁয়ে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া।

—ক্ষিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে।

চিঁ চিঁ—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অস্পষ্ট আওয়াজ, ক্ষীণ শব্দ।

চোঁ চোঁ—ক্রি বিণ. একটানা।—চোঁ চোঁ করে খেয়ে নাও তো সোনা।

চকা—বি. খোসা<ত্বক, তু. তণ্ডুল>চাউল ;

—শাঁসটি খাও চকাটি ফেলে দাও।

চকলা—বি. খোসা।

চাক মাদুলি—বিণ. খুব বড় বা হৃষ্টপুষ্ট।

চুকা—বি. মাটির তেলানো পাত্র। তু. হি. চুক্কড়। ভো. চুক্কা।

চুকলি কাটা—ক্রি. পরনিন্দা করা।

চেঁকা—বিণ. টক।—আমটা খুব চেঁকা।

চুকা—ক্রি. শেষ হওয়া, সমাপ্ত। চকুটা—ক্রি. মাখা, থাসা, চট্‌কানো।

চখা—অ. ক্রি. ভয়ে অবাক হয়ে যাওয়া ; <চকিত।

—আমি কি বাঘ, না ভাল্লুক যে আমাকে দেখে চর্খাই গেলে।

চঙ্গা/চঙ্—বি. লম্বা-ফাঁপা বস্তু ; ২) চঙ—বিণ. রসিকতা। চুঙ্গী—বি. funnel

চ্যাংদোলা—বি. আড়কোল।

চঁচ্—বি. তীক্ষ্ণ শলাকা ;

চঁচরা—বি. পাখীর ঠোঁট ; ২) চঁচ্রা—বিণ. বেয়াদপ, গালি অর্থে।

চুচ্কা—বি. স্তাবক, খোশামোদ।

চঁছ—বি. খোঁচা।

চাঁছি—বি. ঘনীভূত দুগ্ধ ; ১) সং তক্ষিত>প্রা. চঞ্চই>চাঁচই>বাং চাঁছি।

২) ছচ্ছিকা>চচ্ছিআ>চচ্ছিআ>চাছি, চাঁছি।

চাঁছা—ক্রি. পরিষ্কার করা।

চাটু—বি. চেটো বা চাপট আকৃতিবিশিষ্ট লৌহ বা অন্য ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ।

<চট্ট / চট্টু।

চটান—স. ক্রি. চোট দেওয়া, ছেদন করা। √চুট্, ছেদন।

চাটাই—বি. খেজুর পাতার তৈরি মাদুর।

চাঁটি—বি. বাহাদুরি, বাহ্যাড়ম্বর।

চটা, চটুই—বি. চড়াইপাখী। ২) চটা—বিণ. বিবর্ণ।

চুটি—বি. পাতার তৈরি বিড়ি। চট—বি. পাটের বস্তা।

চুটকি—বি. বেণী ; ক্ষুদ্র জিনিস ।

চিটা—বিণ. অপরিষ্কার, চটচটে। ২) চটা—ক্রি. আটকানো।

চিটা—বি. আটা, ২) চিট—ঘনিষ্ঠ।

চ্যাঠা—বি, চৈতন্য।—এত ঠকলি তবু তুর চ্যাঠা হ'ল্য নাই।

চদু—বিণ. নির্বোধ।

চাঁদু—বিণ. চন্দ্রতুল্য।

চাঁদলা>চেঁদো—টাকবিশিষ্ট। ২) চাঁদলা—বিণ. কপালে জন্মগত তিলকযুক্ত গরুকে বলা হয় চাঁদ্লা গরু।

চঁথা—বিণ. বাজে, ওঁছা। চোঁথা—বি. বাজে কাগজের টুক্রো।

চুনো/চুনু—বিণ. ছোট। যেমন—চুনোমাছ। চুনু ছেলা।

চ্যানকা—বিণ. রগরগে, চন্চনে।

চ্যানগা—বি. মুরগীর বাচ্চা।

চেপা, চেপী—বিণ. খ্যাদা, খেঁদী, flat-nosed.

২) পিষ্ট হওয়া।

চাপুটে ধরা—যৌ. ক্রি. জড়িয়ে টিপে ধরা। চিপ্‌।

চাপ্‌কা—বি. গরুর মুখের একপ্রকার ক্ষত, যা চাপ বেঁধে থাকে।

চাপড়া—বিণ. কিয়দংশ। কিছুটা।

—দিয়ালটায় দিলি ত একচাপড়া কালি বুলাঁই।

চুপ্‌ চুপ্‌—ক্রি. বিণ. আস্তে আস্তে।

চপ্‌সা—বিণ. বিস্বাদ।

চবড়া—বি. বড় ঝুড়ি।

চুবানো—ক্রি. ডুবিয়ে দেওয়া।

চাম—বি. চামড়া ; চর্ম।

চিমড়া—বিণ. অর্দ্ধশুষ্ক।>চিমড়ানো—নামধাতু (চর্ম+বৃত্ত)।

চামবাদুড়—বি. চামচিকে। Bat.

চুরচুরে—ক্রি. বিণ. ভগ্নপ্রায়।

চরাবাতি—বি. টর্চ। (<চর-বর্তি ; অটবর্চ>টর্চ)

চুলবুলা—বিণ. চঞ্চল।

চাল—বি. ধান্য-বীজ। ২) চাল—বি. খপ্পর, অনুকূলে, আয়ত্তে। ৩) চাল—বি. দান, ছলনা।

চেলা—বি. শিষ্য, অনুগত ব্যক্তি।

চিলচিল্লান—ধ্বন্যাত্মক ধাতু। যন্ত্রণায় তীব্র চিৎকার করা।

চিল্লান—ক্রি. চেঁচান।

চুয়া—বি. নদীর তীরে বালিতে গর্ত, যা থেকে পরিশ্রুত জল বের করা হয়।

চুয়ান—ক্রি. গড়িয়ে পড়া।

চড়চড়ি—বি. বিদ্যুৎ।

চাঁড়—বিণ. উৎসাহ, আগ্রহ।

চড়বড়ি—বিণ. তাড়াতাড়ি।

'ছ'

ছা—বি. ছেলে, শাবক। যেমন—বিটিছা, পাখছা, বিড়ালছা।

ছই—বি. আচ্ছাদন।

ছাওল—ক্রি. ছেলে হওয়া। ছাওলা মা=নবপ্রসূতি।

ছো, ছৌ—বিণ. ছদ্ম, মুখোশ।

ছো-নাচ—বি. ছদ্মনৃত্য, মুখোশনাচ।

ছক্—বি. পরিকল্পনা, plan.

ছকা—ক্রি. সাঁতলানো।

ছেঁক, ছ্যাঁক—বি. গরম উত্তপ্ত। ২) ছ্যাঁক্—ঝাল, (একধরণের রান্নাকরা তরকারি।)

ছাঁকা—ক্রি. পরিস্রুত করা, ভিজিয়ে তুলে নেওয়া।

ছ্যাঁকা দেওয়া—স. বিণ. তাপ দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া।

ছাঁকি, ছাঁকনি—বি, ছেঁকে তুলে নেবার জিনিস, ঝাঁঝরা।

ছাগ্‌লা-ছাগ্‌লি—বি. ছাগ-ছাগী।

ছুঁচ্‌ দেওয়া—ক্রি. গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করা (শুচি>ছুঁচ্‌)।

ছুঁচা, ছুঁছা—বিণ. বেয়াদপ, অবাধ্য।

ছিঁচা—ক্রি. থেঁৎলে দেওয়া, পিষ্ট করা।

ছাঁচ্‌ত্যাল—বি. সরিষার তৈল।

ছাঁচা, ছাঁচতল—বি. খড়ের চালের প্রান্তভাগের নিম্নতল।

ছুঁচ্‌রা—বিণ. লোভী, শয়তান। তু. ভোজ. ছেঁছর; বীরহোড় ছোঁচা, পূর্ববঙ্গ ছোঁচ। —'কেহ ছোঁচা, কেহ বোঁচা, কেহ বা সরল।'—কবিকঙ্কণ।

ছ্যাঁচড়—বি. বদনাম, নির্লজ্জ (গালি অর্থে)।

ছিট—বি. কাপড় ২) ছিট—বি. অপ্রকৃতিস্থতা। ছিটাল—বিণ. অপ্রকৃতিস্থ, পাগল।

ছিটান—ক্রি. ছড়িয়ে দেওয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করা।

ছিটকিন—বি. খিল, অর্গল।

ছুটু—বিণ. ক্ষুদ্র, ছোট। ছুটকি—বিণ. ছোট বৌ, ছোট মেয়ে।

ছুট্—ক্রি. দৌড়ান। ২) ছুট্—ভ্রষ্ট। যেমন—দলছুট হওয়া।

ছাতু—বি. শস্যচূর্ণ; গুঁড়ো। ২) ছাতু—বি. ছত্রাক। Mushroom.

ছেতরান—স. ক্রি. ছড়িয়ে পড়া। (<ছত্রীকরণ)।

ছতিচ্ছন্ন—ক্রি. বিণ. তছনছ করা। সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়া। (শতচ্ছিন্ন মতিচ্ছন্ন শব্দের অনুরূপ)।

ছেঁদা—বি. ছিদ্র. ফুটো।

ছিদেম—বি. ক্ষুদ্র মূল্য। সামান্য।

ছিদরি-বিদরি—ক্রি. বিণ. চৌচির হয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া।

ছানা—বি. বাচ্চা, শাবক। ২) ছানা—বি. দুগ্ধজাত দ্রব্য।

ছানি—বি. চক্ষুরোগ। ২) ছানি—বি. গোখাদ্য হিসাবে কাটা খড়।

ছাপ, ছাব—বি. ছবি, চিত্র, চিহ্ন Picture।

ছপকে পড়া—স. ক্রি. উছ্‌লে পড়া।

ছেপি—বিণ. ছোটখাট, ক্ষুদ্র।

ছিপি—বি. ঢাকনা।

ছিবড়া—বি. খোসা। ছাবকা—বিণ. ছবি দেওয়া, চিহ্নিত, চিত্রিত।

ছাভা—বি. মাটির মাঝারি হাঁড়ি।

ছামু—অব্য. নিকটে, সামনে।

ছ্যার—বিণ. পাত্‌লা। —ছ্যার গোবর=গরুর পাত্‌লা পায়খানা।

ছিরি—বিণ. শ্রী, সৌন্দর্য।

ছেলা—বি. সন্তান।

ছলকে পড়া—অ. ক্রি. উপচে পড়া।

ছেলাভুলা—বি. তেলেভাজা। (ছোট ছোট একটি করে তেলেভাজা হাতে দিয়ে ছেলে ভুলানো যায় বলে এর নাম ছেলেভুলা)।

ছিলিম—বিণ. অল্প, সামান্য।

ছঁয়াচ—বি. অশৌচ, অশুচি।

ছিয়াবিয়া—বিণ. উত্যক্ত, অস্থিরতা।

ছোঁড়া-ছুঁড়ি—বি. তরুণ-তরুণী। ২) ছোঁড়াছুঁড়ি—ক্রি. নিক্ষিপ্ত করা।

ছড়—বি. দণ্ড। যেমন—বেহালার ছড়। ২) ছড়—ক্রি. ছিটান। জলছড়।

ছড়মাড়ুলি—বি. গোবরজলের গোলাকৃতি প্রলেপ।

জ

জী, জিউ—বি. জীবন।

জাউয়া, জাওয়া—বি. শস্য উৎসবের একটি অঙ্গ। জাত+ক। (আদিবাসীদের 'করম' পর্ব উপলক্ষে পোঁতা কলাই ইত্যাদির অঙ্কুর আনয়ন উৎসব)।

জাঁকপুরু—বিণ. আড়ম্বরসহ।

জাগণ—ক্রি. জেগে থাকা, জাগরণ।

জাং—বি. জঙ্ঘা, জানু।

জাজ—বি. বিচার। Judgement. জিজ—বি. রাগ, জেদ।

জঁদা—বিণ. টক, অম্ল।

জান—বি. জীবন, অন্তর্যামী।—আমি কি জান বটি যে, কি হবেক না হবেক জানতে পারব।

জাংলান—স. ক্রি. বেত্রাঘাত করা। জাংলা—বি. ছোট ছোট লাঠি।

জাংড়া—বি. শারীরিক শক্তি।

জোনা—বি. জ্যোৎস্না। জোনাপোকা, জুনপুকা—বি. জোনাকি পোকা।

জোনার—বি. ভুট্টা।

জবরা—বি. জঞ্জাল (আবর্জনা>বর্জন, পরে বর্ণবিপর্যয়)।

জবর—বিণ. সাংঘাতিক, মজবুত, বলিষ্ঠ। (সাঁওতালী ভাষাতে বিরাট মজবুত কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝাতে এই শব্দটি বহুল ব্যবহার করে।)

জাবনা, জাভনা—বি. বিভিন্ন খাদ্যের মিশ্রণ। গোখাদ্যবিশেষ।

জামবাটি—বি. বড়ধরণের বাটি।

জামির—বি. টকলেবু। জাম-জুটকি—বিণ. যমজ ; twin।

জমক—বিণ. আড়ম্বর।

জুমড়া—বি. অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ; আধপোড়া কাঠ।

জরকা—বি. নরম মাটি। জলুই—বি. পেরেক।

জুড়া—বিণ. ঠাণ্ডা, ছায়া। জাড়—বিণ. ঠাণ্ডা ; <জাড্য।

জোড়—বিণ. দুই, উভয়। ২) জোড়—বিণ. ছোট।

জিয়ন্ত—বিণ. জীবন্ত।

জঁট—বি. জটিল ; জটা।

ঝ

ঝক্‌মারী—ক্রি. বিণ. জ্বালাতন ; ভুল করা।

ঝুঁকা—ক্রি. নুয়ে যাওয়া,

ঝোক—বিণ. আবদার, নেশা।

ঝাঁজ—বিণ. তেজ। ২) ঝাঁজ—বি. কাঁসর।

ঝাজা—বি. বড় ঝুড়ি। ঝুজকা—বি. ভোর বেলা।

ঝিঁঝিঁ পোকা—বি. একধরণের পোকা যারা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে।

ঝাঝি—বি. জালি।

ঝাট দেওয়া—ক্রি. পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা—বি. ঝাড়ন ; যার দ্বারা ধুলাবালি পরিষ্কার করা হয়।

ঝট্—ক্রি. বিণ. তাড়াতাড়ি।

ঝান্থ, ঝুনা, ঝুনো—বিণ. পরিপক্ক, সম্পূর্ণ শুষ্ক। শক্ত।

ঝিন্ ঝিন্, ঝিন্ ধরা—ক্রি.—একঠেনে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে হাতে-পায়ে ঝিন্ ধরে গেল।

ঝন্‌কা—বিণ. রাগী (চাষের গরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

ঝাপটা—বি. একধরণের অলংকার যা মাথায় পরে।

ঝাপটা—ক্রি. আঘাত।

ঝাঁপান—বি. মনসা পূজা উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়।

ঝপ্—ক্রি. বিণ. তাড়াতাড়ি।

ঝপাং—ক্রি. বিণ. অকস্মাৎ। সশব্দে।

ঝুপ,ঝুপা—বিণ. হৃষ্টপুষ্ট।

ঝোঁপ—বি. ছোট ছোট জঙ্গল।

ঝুমা—অ. ক্রি. ঝিমানো ; নিস্তেজ হওয়া। হি. ঝুমতা।

ঝুমুর—বি. নূপুর।

ঝুম্‌ঝুমি—বি. একধরণের বাজনা (শিশুদের খেলনাবিশেষ)।

ঝুম্‌কো—বিণ. জমাট। যেমন—ঝুম্‌কো গাঁদা, কানঝুম্‌কো।

ঝুমুক—বি. স্তন।

ঝামটা—ক্রি. নাড়া। যেমন—মুখ ঝামটা দেওয়া।

ঝামরে যাওয়া—অ. ক্রি. মুষড়ে যাওয়া, ঝিমিয়ে পড়া।

ঝন্‌ঝাট, ঝঞ্ঝাট—বি. সমস্যা।

ঝুঁটি—বি. খোঁপা।

ঝাল—বি. একধরণের তরকারী ; ২) লঙ্কা।

ঝাংড়ি—বিণ. ঝাড়, জমাট, দলবদ্ধ।

ঝড়্যা—বি. প্রচণ্ড ঝড়। <ঝটিকা।

ঝুড়া—ক্রি. পরিষ্কার করা ; মসৃণ করা।

ঝুরা—বি. সিঁদুর।

ঝুরগুণ্ডা—বি. চোরকাঁটা।

ট

টুঁই—বি. শীর্ষদেশ, গাছের উপর ; ডগা<তুঙ্গ।

টিকর, টিকুর—বি. শুষ্ক উচ্চভূমি। <শিখর।

টুকি—বি. বাঁশের বোনা ছোট ঝুড়ি।

টকা—বি. চাল ধোওয়ার জন্য বাঁশের পাত্র।
টিকা—বি. কলকেতে তামাক সাজবার জন্য ব্যবহৃত কাঠ-কয়লার গুঁড়োর তৈরি বটিকা। ফোঁটা, তিলক।
টুক্‌হ্—ক্রি. বিণ. একটু, সামান্য।
টেকা, টিকা—স. ক্রি. স্থায়ী হওয়া। √টিক্, টেকতে।
টেকো—বিণ. চুলহীন ব্যক্তি।
টিকি—বি. কেশগুচ্ছ, শিখি।
ট্যাঁক্—বি. কোমরে সন্নিবেশিত বস্ত্রাংশ। ট্যাঁক—বিণ. রাগ।
ট্যাঁকা—স. ক্রি. আটকানো, স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখা।
টিক্‌রানো—স. ক্রি. টোকা মারা।
টকি—বি. সিনেমা, বায়োস্কোপ।
টোঁকা—বি. বাঁশের তৈরি লম্বা ধরণের ঝুড়ি, তালপাতার ছাতি।
টুঁটি—বি. গলা; < ত্রাটি। ট্যাঁটা—বি. বল্লম।
টাটি, টাঠি—বি. মাটির পাত্র।
টাঁট—বি. বেড়া। আচ্ছাদন।
ট্যাট্ ভাটরা—বি. শালুক ফুলের বীজকোষ।
টাঁঠী—বি. পদ্মের বীজকোষ।
টেনা—বি. বস্ত্রখণ্ড। পূ. বাং. তেনা।
টনক—ক্রি. বিণ. চৈতন্য।
টুনি—বিণ. ছোট, ক্ষুদ্র। টপ করে—ক্রি. বিণ. তাড়াতাড়ি, দ্রুত।
ট্যাঁপ—বি. শাড়ির আঁচল।
টিপ্—বিণ. নিশানা, লক্ষ্য।
টুপা—বি. ছোট ঝুড়ি। টিপ্‌রা—বিণ. ছোট, ক্ষুদ্র।
টপা—বিণ. ডাঁশা, পূর্ণ। যেমন—টপা কুল। ফোঁটা, বিন্দু।
ট্যামক—বিণ. গরব, অহংকার।
টিরটির—ক্রি. বিণ. টলমল করা।
টিরে ফক্কড়—বিণ. বাচাল, দুষ্টু।
টুরপা—বি. চোর গরুর গলায় বাঁধা কাষ্ঠখণ্ড।
ট্যারা—বিণ. তির্যক। বেঁকা।
টিরে—বিণ. স্বল্প, পাতলা, light। যেমন—টিরে গাঁদা, টিরে জবা ইত্যাদি।

টিয়ালি—ক্রি. উঁকি মারা।

টালান—অ.ক্রি. চড় মারা।

টং—বিণ. শীর্ষদেশ, চূড়া। যেমন—টংডাল।

টেংরি—বি. পা, পদ।<টঙ্ক, টঙ্গ। হি. টাঁগ ; ভোজ. টঙরী।

টসকা, টুস্‌কা—অ. ক্রি. উত্তেজিত হওয়া ; টোল পড়া, নষ্ট হওয়া।

টুসী—বিণ. সুন্দর। যেমন—ফুলটুসী। টাঁড়—বি. দালান।

ঠ

ঠাঁই—বি. স্থান, জায়গা। ঠাঁইনাড়া—স. ক্রি. স্থানচ্যুত হওয়া।

ঠাক্‌রুণ—বি. মা দুর্গা, দেবী। (ঠাকুর থেকে স্ত্রীলিঙ্গে ঠকুরাণী, পরে অন্ত্যস্বর লোপ।)

ঠেক পাওয়া—ক্রি. বাধা পাওয়া।

ঠ্যাকা—বি. সাহায্যকারী, support।

ঠিকে—বিণ. চুক্তিবদ্ধ ; contract।

ঠকা—ক্রি. প্রবঞ্চিত হওয়া।

ঠকর-মকর—অব্যয় কোনক্রমে।

ঠাঁট—বি. আড়ম্বর, চাকচিক্য।

ঠেঁটি—বিণ. ছোট, প্রস্থে খাট। ২) ঠেঁটি—বিণ. একগুঁয়ে।

ঠুঁটিয়ে—স.ক্রি. খুঁটির মতো একটানা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

ঠেঁটা—বিণ. বেয়াদপ, অবাধ্য।

ঠুঁটো, ঠুঁঠো—বিণ. হস্তহীন। কুষ্টরোগাক্রান্ত।

ঠুডুং—বি. চোর গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার মতো কাষ্ঠখণ্ড।

ঠিনে—অনুসর্গ. অব্যয়. কাছে<স্থানিক। বাং—ঠাঁই।

ঠানা—অ. ক্রি. তির্যক দৃষ্টিপাত করা।

ঠপা, ঠুপা—বি. ফোঁটা, বিন্দু।

ঠরকা—বি. বলদের গলায় কাঠের ঘণ্টা।

ঠরকা বাজা—যৌ. ক্রি. অকল্যাণ হওয়া। ক্ষতি হওয়া।

—'যার গয়না তারেই সাজে, অন্যলোকের ঠরকা বাজে'।

ঠেরকা—বি. কাঠের হাতা।

ঠিরা, ঠিরে—ক্রি. বিচ্ছুরিত হয়।

ঠ্যালা—ক্রি. ধাক্কা দেওয়া।

ঠিলি—বি. পিতলের ছোট ঘড়া, গাগরা, ঘটি।

ঠলঙ্গা—বি. ঠোঙা, মোড়ক।

ঠসক—বি. অহংকার।

ঠসক-ঠুস্বক—ক্রি. বিণ. গুরুগম্ভীর চাল।

ঠেস দেওয়া—স. ক্রি. আশ্রয় করা, ইঙ্গিত করা।

ঠিসান—ক্রি. ভয় দেখানো, স্মরণ করানো।

ঠেঁসান—স. ক্রি. ঠেক নেওয়া।

ঠেঙ্গা—বি. ছোট লাঠি।

ঠেঙ্গান—নামধাতু. ঠেঙ্গা বা লাঠি দিয়ে মারা।

ঠোঙ্গা—বি. মোড়ক।

ঠং—বি. কৌটা।

ড

ডাঁই, ডাইঙ—বি. স্তূপাকার। ডাইনি—বি. শয়তানী।

ডাক—ক্রি. আহ্বান। ২) ডাক—বি. শোলা। যেমন—ডাকের সাজ।

ডাকুর—বি. মাকড়সা। ডুক্‌চি—বি. ডেক্‌চি, গামলা।

ডগা—বি. অগ্রভাগ

ডগডগে—বিণ. সুপুষ্ট। ডুগডুগি—বি. একধরণের বাজনা।

ডগমগ—বিণ. পরিপূর্ণ।—আনন্দে ডগমগ।

ডিগর—বিণ. দুঃসাহসী, desperate.

ডাঁট—বিণ. শক্ত; <দণ্ড। ২) ডাঁট্—বোঁটা, বৃন্ত।

ডাঁটি—বি. বোঁটা, বৃন্ত।—পানের ডাঁটি।

ডান—বি. ডাইনি, ডাকিনী।

ডেঁপো—বিণ. ফাজিল।

ডাব—অব্যয়. কিয়দংশ। ডাব—বি. গর্ত।

ডাবা—বি. মাটির বা সিমেণ্টের গামলা।

ডাবু—বি. বড় চামচ।

ডোব, ডবা—বি. ছোট জলাশয়।

ড্যাবরা—বিণ. বৃহৎ, বড়। ডিবরি—বি. ছোট বাতি; lamp।

ডুবা—ক্রি. অস্তমিত হওয়া, নিঃশেষ হওয়া।

ডুভা—বি. ফেন খাবার বাটি। ভোজ. ডুভা।

ডেমুর—বি. ডুমুর।
ডরান—ক্রি. অ. ভয় পাওয়া।
ডেরখা—বি. লম্ফ বা ছোট বাতি রাখবার দণ্ড; lamp-stand।
ডঁরা—বি. কালো রঙের বড় পিঁপড়ে।
ডেলা—বি. পাথরের খণ্ড, মাটির খণ্ড।
ডিলান—ক্রি. ঢিল মারা। ডিবা—বি. কৌটা।
ডহর—বি. উঁচু জমি। ২) ডহর—বি. পশুর দল।
ডহরান—ক্রি. নামধাতু. গোমহিষকে তাড়না করে বা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।
ডাঁহা—ক্রি. বিণ. খাঁটি, একেবারে।
ডিঁয়া—বি. বড় পিঁপড়ে।
ডাং—বি. উচ্চ শুষ্কভূমি। ২) ডাং—বি. লাঠি।
ডিংলা—বি. কুমড়ো। ডংলা—বি. পাতার পাত্র, থালা।
ডুংরী—বি. পাথরের বড়ো টুকরো, ছোট পাহাড়।
ডাংরান—স. ক্রি. দণ্ড দ্বারা আঘাত করা।
ডাঁড়ি—বি. চুয়াখাল। ২) ডঁরি, ডাঁড়ি—বি. ছেদ।
ডেঙ্গর—বি. উকুন।
ডেঙ্গা—বিণ. সন্তানহীন।

ঢ

ঢাঁই—বিণ. বড়; জোর আওয়াজ।
ঢাঁইচাল্লা—ক্রি. বিণ. চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া।
ঢুঁই—বিণ. অল্প শব্দ।
ঢুকা—ক্রি. প্রবেশ করা।
ঢাকন—বি. ঢাকনা, আচ্ছাদন, চাদর।
ঢক ঢক—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়. একনাগাড়ে।
ঢনঢন করা—যৌ. অ. ক্রি. অন্বেষণ করা।
ঢুঁনা—ক্রি. খোঁজা।
ঢিপরা—বিণ. মোটা, স্বাস্থ্যবান।
ঢ্যাপা—বিণ. স্থূল।
ঢপাস—ক্রি. সশব্দে।
ঢিপ করে—ক্রি. নুয়ে।

ঢেমন—বিণ. বদমাস। নির্লজ্জ।
ঢিমা—বিণ. ধীর ; slow।
ঢাড়স—বি. সাহসে বুক বাঁধা ; (<দাঢ্য+সাহস)।
ঢঁড়র—বি. বড় ছিদ্র (<কন্দর)।
ঢঁড়া—বি. এক শ্রেণীর সাপ। ২) ঢঁড়া—অ. ক্রি. পাতলা পায়খানা।
ঢুঁড়া—ক্রি. খোঁজা
ঢেড়রা—বি. প্রচার।
ঢুয়া রং—বি. একটি বিশেষ অঙ্গের গান।
ঢং—বি. তামাশা।
ঢুসান—ক্রি. গুঁতান। আঘাত দেওয়া। ঢেস্‌না—বি. ইঙ্গিত।
ঢু-মারা—ক্রি. খোঁজ নেওয়া।
ঢোল—বি. বাজনা, পত্রাধার (letter box)।
ঢেঁশান—ক্রি. বিণ. খোঁটা দেওয়া।
ঢেঁড়া পিটান—স. ক্রি. ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা।

ত

তা—বিণ. একটি।
তাওয়া—বি. চাটু, তেলানো পাত্র। তক্—অব্যয়. পর্যন্ত।
তাক্—বি. shelf ; জিনিসপত্র রাখবার জন্য জায়গা।
তাক্ করা—স. ক্রি. লক্ষ্য করা। তকতকা—বিণ. খুব উজ্জ্বল।
তাগদ—বিণ. ক্ষমতা, শক্তি। তাগড়া—বিণ. শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান।
তাগা—বি. বাহুবন্ধন ; armlet।
তাগাদা দেওয়া— স. ক্রি. তাড়া দেওয়া।
তাগিদ—বি. ইচ্ছা।
তাজিয়া—বি. মসজিদের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ; model। (মহরম উপলক্ষে মুসলমানেরা এই তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে)।
তেজ বেলা—বি. দুপুর বেলা। মধ্যাহ্ন সময়।
তাতা—বিণ. গরম, উষ্ণ।
তাতান—ক্রি. গরম করা, রাগিয়ে দেওয়া।
তিত-বিরক্ত—বিণ. অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।
তত্ত্ব-তলাশ—বি. খোঁজ-খবর, আদান-প্রদান।

তন—বি. মনঃসংযোগ।

তপা, তুপা—স. ক্রি. পুঁতে দেওয়া। <প্রোথিত। পরে বর্ণবিপর্যয় হয়েছে।

তাপি দেওয়া—স. ক্রি. তালি দেওয়া, জোড়া দেওয়া।

তাবিজ—বি. তক্তি, বাহুবন্ধন। ত্যাবড়া—বিণ. বাঁকা।

তামুক—বি. তামাক, তামাকু।

তর সওয়া—স. ক্রি. ধৈর্য ধরা।

তরিবৎ—ক্রি. বিণ. সুস্থিরভাবে; ভাল করে; ধারা; রীতি।

তরফসানী—বি. একপেশে; পক্ষপাতদুষ্ট; partiality।

তেরিকাটা, তেরিবাগান—স.ক্রি. সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো।

তারামাচা—বি. উঁচু জায়গায় বসার স্থান। (তারকা+মঞ্চ)।

তালি—বি. জোড়, সংযোগ।

তালবীচ্—বি. তালশাঁস।

তেলান—নামধাতু. স্তাবকতা করা।

তেলানি—বি. একধরণের ঢালু পাত্র।

তুলা—ক্রি. উত্তোলন করা।

তলানি—বি. অবশেষ।

তালাই—বি. খেজুরপাতার তৈরি চাটাই।

তড়তড়া—ধ্বন্যাত্মক ধাতু. ছড়ানো।

তড়বড়া—বিণ. চঞ্চল।

তড়পানো—নামধাতু. চিৎকার, চেঁচামেচি করা।

তড়কানো—নামধাতু. চমকে ওঠা।

তুড়কু—অব্যয়. সামান্য, একটুখানি।

তাড়ি—বি. বোঝা; তালরসের মদ।

তেঁহর—সর্ব. তাঁর।—রাজা ম'লে করব শোক, আমরা তেঁহর আপন লোক।

তেড়সা—বিণ. অবুঝ।

তং করা—স. ক্রি. বিরক্ত করা।

থ

থু, থোয়া—ক্রি. রাখা, স্থাপন করা।

থকা—বিণ. সমষ্টিবদ্ধ; ২) থঁকা—স. ক্রি. পরিশ্রান্ত হওয়া।

থাক—বিণ. ভাগ, অংশ, সারিবদ্ধ।

থ্যাকালে নেওয়া—স.ক্রি. পিষ্ট করা, থেঁতো করা।
থ্যাঁতা—বিণ. নির্লজ্জ। থুতি—ক্রি. মুখনাড়া।
থতনা. থথনা—বি. চিবুক। ২) ক্রি. চিবুক নেড়ে ঝগড়া করা।
থেঁতলা—বিণ. চ্যাপ্টা; পিষ্ট।
থিতান—ক্রি. নামধাতু. বসতে দেওয়া, স্থির হওয়া। (<স্থিত)।
থান—বিণ. বড়, বৃহৎ। যেমন—থান ইঁট। ২) বি. পাড়হীন ধুতি।
থাপা—স. ক্রি. স্থাপন করা। <স্থাপন।
থাপুথুপু—ক্রি. বিণ. এক পা দু পা করে চলা, থপথপ করে চলা।
থপাস, থ্যাপস—ক্রি. বিণ. একসঙ্গে অনেকটা।
থবা—বিণ. থোকা; সমষ্টিবদ্ধ।
থুবড়া—বিণ. অবিবাহিত (<স্থবির)।
থাম—বি. স্তম্ভ।
থম মারা—স. ক্রি. চুপচাপ (<স্তম্ভ)।
থিরান—স. ক্রি. নামধাতু. স্থির হতে দেওয়া; (<স্থির)।
থল—বি. স্থল, জায়গা।
থুস্থুসা—বিণ. আলগা, অশক্ত।
থাসা—ক্রি. চটকানো।—বাপের বুন পিসি ভাত কাপড়ে পুষি,
মায়ের বুন মাসি কাদায় ফেলে থাসি।
থাস্তেথুস্তে—ক্রি. বিণ. ঠেসে, পরিপূর্ণভাবে, জোর করে।
—যে আল্য চযে সে রইল বস্তে, আর লাড়াকাটায় খায় থাস্তেথুস্তে।
থড়বড়্যা—বিণ. অসংযত। এলোমেলো।

দ

দ—বি. নদীর জলে ঘূর্ণী।
দাই—বি. ধাত্রী।
দাও রাখা—অ. ক্রি. মান বজায় রাখা।
দাঁও মারা—অ. ক্রি. দান মারা, লাভবান হওয়া।
দঁকে পড়া—অ. ক্রি. অসুবিধায় পড়া।
দঁক্—বি. পঙ্ক, পাঁক। দক্তা—বি. তামাক।
দিক্-মাড়ান—অ. ক্রি. নির্দিষ্ট এলাকায় আসা।
দাগী—বিণ. দাগ লাগা, খুঁত হয়ে যাওয়া।

দাগা—ক্রি. আঘাত দেওয়া।

দেদার—ক্রি. বিণ. প্রচুর, বিস্তর।

দদড়ান—ক্রি. চুলকান, ঘর্ষণ করা।

দন—বি. গরুর খাবার পাত্র।

দান—বি. উপহার সামগ্রী ; ২) চাল।—একদান খেলব।

দাপট—বি. প্রতিপত্তি, ক্ষমতা।

দাপান—ক্রি. লাফানো। দপ্‌দপান—নামধাতু. জ্বালা-যন্ত্রণা করা।

দাফিং করা—যৌ. ক্রি. খাঁজ কেটে নেওয়া।

দাবড়া—বি. একটি বৃহৎ মুষ্টি। দব—বি. শাসন।

দোবড়—বিণ. দ্বিগুণ (<দ্বিবার) ; ভোজ. দোবর।

দু ভাগ হওয়া—স. ক্রি. প্রসব করা।

দুমা—স. ক্রি. পিটান, মারা।—একবার বাগে পেলে উকে এ্যামন দুমান দুমার যে বাপের নাম ভুঁলাই দুব।

দুমড়ান—স. ক্রি. মচ্‌কানো, ভাঁজ করা।

দমে—বিণ. প্রচুর, অনেক। দমতক—ক্রি. বিণ. খুব বেশী।

দামড়া—বিণ. বয়স্ক। যেমন—দামড়া বাছুর।

দর-দালান—বি. পাকাবাড়ি।

দেরখা—বি. কাঠের প্রদীপদানি।

দালান—বি. পাকাবাড়ি। দল—বি. শ্যাওলা।

দিশা—বি. চৈতন্য।

দশন—বি. তেল দেবার পাত্র।—'তেলের ভাঁড়ে তেল নাইক দশন মারে ঘা।'

দড়া—বি. মোটা দড়ি।

দড়কচা—বিণ. অসিদ্ধ ; <দরকাঁচা।

ধ

ধাই—বি. ধাত্রী।

ধাঁই করে—আচমকা, হঠাৎ।

ধাঁই ধুপ—ক্রি. বিণ. বহুকষ্টে, দৌড়াদৌড়ি করে।

ধকল—বি. কষ্ট, পরিশ্রম। ধঁকা—বি. ধাপ্পা, ছলনা।

ধুকুধুকু—বি. একধরণের গ্রাম্য খেলা।

ধুঁকো—বিণ. মুমূর্ষু ব্যক্তি। (ধুক্ ধুক্ করে যে)

ধাঙড়—বি. হরিজন।

ধুচুনি—বি. ধুনুচি।

ধাত আসা—স. ক্রি. সম্বিৎ ফিরে পাওয়া।

ধাতান—নামধাতু. শাসানো। ধাধান—স. ক্রি. জ্বালাতন করা।

ধুনা—স. ক্রি. ভীষণভাবে মারা (√ধূ-ধুনাতি) ও দিদি, গরুটা বাঁধ ধুন্যে দিবেক বে।

ধাপান—স. ক্রি. ঝাপটা মারা।

ধব—বিণ. সাদা, (<ধবল) পরিষ্কার।

ধবঝিঙা—বি. রামঝিঙা, ঢেঁড়শ। (এ অঞ্চলে ঢেঁড়শকে রামঝিঙা বলে, কিন্তু যে মেয়ের স্বামী বা শ্বশুর ইত্যাদির নাম রাম সে ঢেঁড়শকে রামঝিঙা না বলে ধবঝিঙা বলে।)

ধ্বজা—বি. বৃক্ষের অথবা শাখার অগ্রভাগ। পতাকা।

ধ্যাবড়া—বিণ. মোটা, স্থূলকায়।

ধুমড়া—বিণ. বয়স্ক, বড়।

ধুমসা—বিণ. স্থূলকায়।

ধুমধুম্যা—বিণ. মোটাসোটা। ধামসা—বি. সাঁওতালদের বাজনা।

ধরণ—বি. গ্রীষ্মকাল ; কাঠামো, structure।

ধরান—ক্রি. অগ্নিসংযোগ করা।—উনান ধরানো, বিড়ি ধরানো।

ধরাট—বি. বাধা। ধারি—বি. সীমান্তবর্তী অংশ।

ধলো—বিণ. ফর্সা, পরিষ্কার।

ধসকা—বি. ডাঙ্গা ; ২) ধসকা—বিণ. ফ্যাস্‌ফ্যাসে।

ধসকানো—স. ক্রি. নষ্ট করা, ফেলে দেওয়া।

ধাসা—স. ক্রি. মাখা, মথিত করা।

ধাংড়া—বিণ. বড়, পরিণতবয়স্ক।

ধাংড়ি—বিণ. ঐ স্ত্রীলিঙ্গ।

ধঞ্জ—বি. দিগ্বিজয়।

ন

নাই—বি. নাভি।

নাই-কাটকি—বি. নাভি কাটে যে স্ত্রী অর্থাৎ ধাত্রী>ধাই।

ন্যাওটা—বি. ভক্ত, আসক্ত।

নাকাল হওয়া—স. ক্রি. অধৈর্য হয়ে পড়া, অস্থির হওয়া।

নিকি, নিখি—বি. উকুনের ডিম।

নিকান—স. ক্রি. পরিষ্কার করা।

নাক-খাড়ি—বি. নাকের গহনা, নাকছাবি।

নিকিরি—বি. নিম্নমনা, হীন।

নিখাউকি—বিণ. আহারহীন, অল্প খায় যে।

নিচ্চই—ক্রি. বিণ. সত্যই, নিশ্চয়।

নুচা—ক্রি. মালিশ করা।

ন্যাটা—বিণ. যে বাম হাত দিয়ে বেশী কাজ করে।

নাটাই—বি. লাটাই। ২) নাটাই-ষষ্ঠী—বি. লোক-উৎসব।

ন্যাতাড়—অব্যয়. একত্রে, একসঙ্গে।

নাদ—বি. ভুঁড়ি ; শব্দ।

নাদী—বি. বিষ্ঠা।

নুহু—বিণ. ছোট। নেনা—বি. শক্তি।—তুর একটুও নেনা নাই।

নিপিতে—বি. গালিবিশেষ ; যার কোন কিছুতে বিরক্তি/রুচি নেই।

নবুদ—বি. প্রমাণ। <অনুবুধ=যাতে মানুষ বুঝতে পারে।

নাম—বিণ. নীচু, ঢালু। নামবাগ—বিণ. নীচুদিকে।

নামাল খাটা—স. ক্রি. নীচুজমির দেশে বা জলাভূমির দেশে ভাতের বিনিময়ে মজুরি খাটতে যাওয়া।

নেজা—বি. লেজ।

নারাজ—নঞ. অব্যয়. রাজী নয়। অনিচ্ছুক।

নালা, নালী—বি. ছোট নর্দমা, কাঁচা ড্রেন।

নলী—বি. গর্ত। নুলো—বি. হস্তহীন ব্যক্তি।

নবান—বি. নবান্ন ; নূতন ধানের উৎসব।

নেহুঁড়ে—ক্রি. বিণ. নীচু হয়ে, ঝুঁকে।

নেড়হে নিয়ে—ক্রি. নুইয়ে, নুয়ে।

ন্যাড়া বাঁধা—স. ক্রি. ডোরা বাঁধা, আস্তানা গাড়া।

ন্যাংটা—বিণ. উলঙ্গ। ২) ন্যাংটা—বি. অশ্লীল।

ন্যাঙট—বি. কৌপীন।

নেংটি—বি. কৌপীন।

নেঙ্গুস—বি. বিষাক্ত কীট।

প

পাঁইফল—বি. পানিফল।

পাই—বি. এক সের পরিমাপের ধান-চাল মাপার পাত্র।

পাইখ –বি. পাখী। পাঁইশা–বি. ধূসর, ছাই ছাই রং।

পাঁইছি—ক্রি. পেয়েছি।

প্যাকাটি—বি. পাটকাঠি ; অত্যন্ত রোগা।

পাখ—বি. পাখী।

পাখালা—স. ক্রি. ধোয়া (<প্রক্ষালয়তি)।

পখুর—বি. পুকুর, জলাশয়।

পগার পার—যৌ. ক্রি. একেবারে পার হয়ে যাওয়া।

পাগা—বি গরু, ছাগল বাঁধবার দড়ি বা শিকল।

পাঘা—বি. পাটের দড়ি।

পঙ্—বি. অঙ্কুর।

পচার-পাড়া—বি. নিষিদ্ধ পাড়া, বেশ্যাপাড়া।

পচাল পাড়া—স. ক্রি. গালি দেওয়া।

পচুই—বি. এক শ্রেণীর দেশী মদ।

পুচি, পুচকি—বিণ. খুব ছোট।

পিচকান—ক্রি. সরে বা পিছলে বেরিয়ে আসা।

পেছান—বি. পশ্চাদ্ভাগ।

পেছা—বি. বড় ঝুড়ি।

পিছলা—বিণ. পিচ্ছিল।

পাছুড়া, পাছড়ান –স. ক্রি. ঝাড়া, পরিষ্কার করা।

পেছা-ভারী—বিণ. অহংকারী।

পাজা—ক্রি. ধার দেওয়া।

পিঁজা—স. ক্রি. সূক্ষ্মভাবে ছাড়ানো।

পাঁজা—স. ক্রি. ধার দেওয়া. শানানো।

পাটা—বি. চেরাই কাঠ ; সাহস।

পাটালি—বি. গুড়জাত চতুষ্কোণ মিষ্টি ; চতুষ্কোণ স্থান।

পটানো—স. ক্রি. বশে আনা।

পটকা—বি. মাছের পেটের ভেতরের একটি অংশ।

পটকানি—বি. শুচিবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোক।

পঁটা—বি. মাছের তেল। ২) পঁটা—বি. সিক্‌নি।

প্যাটরা—বিণ. ছোট, ক্ষুদ্র।

পুঁটু—বিণ. ছোট।

পট্‌কা—বিণ. রোগা, শীর্ণ।

পুট্‌কা—বিণ. ভঙ্গুর, ক্ষীণজীবী।

প্যাট—বি. পেট।

পঁটলা—বি. মোড়ক।

পট্‌পট্‌, পট্‌পট্যা—ক্রি. বিণ. তাড়াতাড়ি।

প্যাট-হওয়া—স. ক্রি. গর্ভবতী হওয়া।

পাঁঠা—বি. ছাগল। ২) পাঁঠা—বিণ. বোকা।

পাত্—বি. পত্র, পাতা।

পতর—বি. লোহা বা টিনের হাল্কা পাত্।

পাত্তর—বি. পাত্র। পাত্‌লা—বিণ. রোগা, কৃশ।

পোথুল—বি. পুতুল।

পাথরা—বি. পাথরের তৈরি বড় বাটি।

পেথম—বিণ. প্রথম। পেথা—বি. বাঁশের ছোট ঝুড়ি।

পেঁদা—বি. মিথ্যা।

পেঁদরামি করা—যৌ. ক্রি. মিথ্যা ঢং করা, আদিখ্যেতা দেখানো।

পাঁদাড়—অব্যয়. পিছনে, পশ্চাদ্দিকে।

পিঁধাড়—বি. বারান্দা।

পানা—বি. রস ; শ্যাওলা, দল।

পান্না—বি. উপবাস করার পর ফলার গ্রহণ।

পিঁফা—বি. পেঁপে।

পরব—বি. পর্ব, উৎসব।

পিরাণ—বি. জামা।

পেরাণ—বি. প্রাণ, জীবন।

পারা—অব্যয়. (< প্রায়) ; মতো ; সদৃশ।

পুরুষ—বি. স্বামী।

পালই—বি. খড়ের গাদা।
পলই—বি. মাছ ধরার funnel type বাঁশের তৈরি ফাঁদ।
পিলা—বি. প্লীহা, যকৃৎ।
পিলু—বিণ. ভীতু।
পালান—বি. দুধের থলি।—গরুটার পালান দেখেই বুঝা যায় কতটা দুধ দিবেক।
প্যেলা—বি. ঠেকা।
পাঁশ—বি. ছাই, ঘুঁটে, কয়লা ইত্যাদির ভস্মাবশেষ।
পস্বাব—বি. প্রস্বাব<পেচ্ছাব।
পসরান—স. ক্রি. ঢুকিয়ে দেওয়া।
পাসরান—স. ক্রি. ভুল, বিস্মৃত হওয়া। (<অপস্মরতি)।
পুহান—স. ক্রি কাটিয়ে যাওয়া। উদ্‌যাপন করা।
পুহা/পুয়া—বি. ছোট চারাগাছ।
পুঁয়াল—বি. পচা খড় (<পলাল)।
পিয়াল—বি. একধরণের বুনো ফল।
পুয়া—বি. চারাগাছ।
পায়া—বি. মাটির মাঝারি কলস ; পা, খুর।
পঁয়তারা—বি. প্রস্তুতি, pose করা। (<পদান্তর)।
পয়রা—বি. পায়রা, কবুতর।
পুয়াতি—বি. গর্ভবতী।
পাড়ন—স. ক্রি. বাগে পাওয়া, আয়ত্তে আনা।
পাড়ন—বি. মেঝে।
পড়চনা—বি. রুটি বেলার জন্য খুচ্‌রো ময়দা।
পড়চা—বি. ওজন সমান করার জন্য মাপ ; balance।
পাষাণ ভাঙ্গা—স. ক্রি. দুদিকের দাঁড়ি পাল্লা সমান করার জন্য মাপ ঠিক করা।
পুড়া—বি. চালের গোলা।
পাঁড়—বিণ. প্রধান, চাঁই, ভয়ঙ্কর।
পেড়ে দেওয়া—স. ক্রি. একেবারে কুপোকাৎ করে ফেলা।
পাড়াপাড়ি—বি. কুস্তি।
পীঁড়া—বি. কাষ্ঠাসন।
পীঁড়া—বি. বারান্দা।

পাঁড়কা—বি. মাঝারি বয়সের মহিষ।

পাঁড়কি—বি. ঘুঘু (<পারাবতক)।

পাড়ন—বি. পাতন।

পং—বি. অঙ্কুর (<পুংস্)

পুঙ্গি—বি. পাতার খিলি (অনেকটা টুঙ্গির মতো) ; funnel।

পোঙ্গা-পুঙ্গি—বি. বাচ্চাকাচ্চা।

ফ

ফকর-ফকর করা—স. ক্রি. অনর্গল বক্ বক্ করা।

ফুঁখ দেওয়া—স. ক্রি. ফুঁ দেওয়া।

ফুঁকা—ক্রি. টানা, সেবন করা। যেমন—বিড়ি ফুঁকা, গাঁজা ফুঁকা।

ফুঁকা—ক্রি. ফুঁ দেওয়া। যেমন—শিঙ্গা ফুঁকা, শাঁখ ফুঁকা।

ফুঁক্‌নল—বি. উনুনে ফুঁ দেওয়ার জন্য নল বা চোঙ্গা।

ফিকা—ক্রি. ছুঁড়ে দেওয়া। ২) ফিকা—বিণ. বর্ণহীন, অস্পষ্ট।

ফ্যাক্‌ড়া—বি. বাধা, বিপত্তি।

ফাগ—বি. আবীর। ফগলা—বিণ. দন্তহীন।

ফ্যাচাং—বি. ঝামেলা।

ফুচি—বিণ. ছোট।

ফুচ্‌ফাচ্—ক্রি. বিণ. এদিক ওদিক।

ফ্যাচ্‌ফ্যাচানি—স. ক্রি. খোঁটা দেওয়া।

ফিচ্‌কানো—স. ক্রি. অতর্কিতে পালিয়ে যাওয়া।

ফচকে—বিণ. ফাজলামি করে যে।

ফাটা—বিণ. চিড় ধরা। ২) ফাটা—স. ক্রি. হালকা করে ফেনানো।

ফুটা—বিণ. ছিদ্রবিশিষ্ট, ভাঙা।

ফুটানি—বিণ. বাহাড়ম্বর।

ফুট-কলাই—বি. একধরণের কলাই। (বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ঘেঁটু পূজার সময় দুয়ারে দুয়ারে চাল ও পয়সা চেয়ে তাই দিয়ে ফুটকলাই ও জিলাপী কিনে খাওয়ার রীতি আছে। এটা ভিক্ষা নয় ; লোক-উৎসবের একটা অঙ্গ ; তাই সাধারণ বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলে —'আলুর মালুর চাল দাও গো
না দিবে তো খোস নাও গো।')

ফটাফট—ক্রি. বিণ. যখন তখন।

ফ্যাট্ফ্যাটা—বিণ. অতিরিক্ত।

ফ্যাত্তা—বিণ. ভাঁজ, কুঁচি। যেমন—কাপড়া ডু ফ্যাত্তা কর; নয়ত কাপড়টা ফ্যাত্তা দিয়ে পর।

ফাদা—বিণ. ফাঁকা, খোলা, উন্মুক্ত।

ফদ্‌কান—স. ক্রি. বক্‌বক্ করা।

ফদর ফঁ—ক্রি. বিণ. সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত।

ফদর ফদর করা—স. ক্রি. অনর্গল বকে যাওয়া।

ফুহ্‌, ফুদি—বিণ. খুব ছোট, ক্ষুদে।

ফাত্‌না, ফাদ্‌না—বি. মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত ময়ুর পালকের টুক্‌রো।

ফেঁপো—বিণ. অন্তঃসারশূন্য।

ফপরদালালি—বি. দুরভিসন্ধি।

ফোঁপর—বি. গর্ত, শাঁস, তাল-ফোঁপরা।

ফোঁপ্‌রা, ফোঁপরা—বিণ. ফাঁপা।

ফাবড়া—বি. ছোট লাঠি, ঢিল। (<পর্ব)।

ফাবড়ানো—স. ক্রি. ছোঁড়া।

ফবদা—বিণ. মিথ্যুক।

ফেরকা—বিণ. পাতলা। কুঁচি দেওয়া, সৌখিনভাবে।

ফুরকুনা—বি. ছোট ছোট ফোলা অংশ।

ফারচা—বিণ. ফর্সা, পরিষ্কার। ফরা—বিণ. ফাঁকা, শূন্য।

ফিরফিরি—বি. ঘূর্ণন। বাচ্চাদের খেলনা।

ফুলা—বিণ. স্তাবকতাপ্রিয়। তোষামোদপ্রিয়।

ফুলম্ ত্যাল—বি. সুগন্ধী তৈল।

ফুলুন, ফুলম্—বিণ. ফুলবিশিষ্ট। ফুলম্ পাড় শাড়ি।

ফুসকানো—স. ক্রি. উত্তেজিত করা।

ফাড়া—ক্রি. চেরা, দু'ফাঁক করা, দু'খান করে চেরা।

ফুড়কি—বিণ. খুব ছোট। ক্ষুদ্র।

ফড়কা—অ. ক্রি. ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া।

ফড়—বি. ছিদ্র; (<স্ফোট)।

ফড়ফড়ানি—বিণ. অতিরিক্ত তৎপরতা; over smart।

ব

বাইরি—বি. বাউরি। বাইক—বি. সাইকেল।
বাইরে বুলা—ক্রি. পায়খানা যাওয়া।
বাইরে বসা—ক্রি. পায়খানা যাওয়া।
বইরি—বি. শত্রু (<বৈরী)।
বাঁউড়ি—বি. মকরস্নানের পূর্বদিনের উৎসব।
বাওলান—ক্রি. নামধাতু. মতিভ্রংশ, জরাগ্রস্ত ; (<বাতুল)।
বিকা—ক্রি. বিক্রী করা। বঁক্—বি. বোঁটা (<বৃন্তক)।
বিকলান—অ. ক্রি. ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করা ; (<ব্যাকুলন)।
বিকুলি করা—স. ক্রি. ব্যাকুল হওয়া, মিনতি করা।
বুকা—বিণ. বোকা, মূর্খ।
বক্তিমা—বি. বক্তৃতা। বাকল—বি. ছাল।
বাখান—বি. গালি, খারাপ কথা।
বাখান দেওয়া, বাখান কাড়া—স. ক্রি. গালি দেওয়া, কটুকথা বলা।
বাখুল—বি. একান্নবর্তী পরিবার। অঙ্গন, উঠানবাড়ি।
বাখারি—বি. ছোট ছুরিকা।
বাগাল—বি. রাখাল, গো-চারক।
বাগান—স. ক্রি. গুছিয়ে রাখা, পরিষ্কার করা।
বাগে—অব্যয়. দিকে।
বাগে পাওয়া—স, ক্রি. আয়ত্তে পাওয়া।
বগি থালা—বি. কাংস্যনির্মিত অল্প কানাউঁচু থালা।
বগা—বি. বকের মতো।
বিগলান—স. ক্রি. চেঁচামেচি করা।
বেগার খাটা—স. ক্রি. বিনা পারিশ্রমিক কাজ করা।
বিগড়ান—স. ক্রি. অবাধ্য হওয়া, বখে যাওয়া।
বাঘরাই—বি. বনদেবতা।
বাঘুড়ুৎ—বি. অপদেবতা, ভূতবিশেষ।
বোঙা, বঙা—বি. সাঁওতালদের দেবতা।
বঁচ—বি. একধরণের আঠাযুক্ত ছোট ফল।
বুচা—বিণ. ন্যাড়া, ভোঁতা।

বীচ—বি. বীজ।
বাচাল—বিণ. বেশী কথা বলে যে ব্যক্তি ; talkative.
বাছুর—বি. গরুর বাচ্চা।
বাঁজা—বি. বন্ধ্যা, সন্তানহীনা।
বজড়—বি. ধাক্কা, (<বজ্র)। উৎক্ষেপণ করা।
বোঝা—বিণ. ভার, মোট।
বাটা—বি. পান রাখার পাত্র।
বিটল—বিণ. ভণ্ড, (<বিট্+অল)।
বটকা—বিণ. বিদ্‌ঘুটে, বদ, খারাপ।
বটি—অব্যয়. নিশ্চয়। বিটি—বি. কন্যা, মেয়ে।
বুটিন—বি. বঁটি। বেটা—বি. পুত্র, ছেলে।
বঁটা—বি. বৃন্ত, ডাঁটি।
বঁঠিন—বি. বঁটি। (<বর্ন্তিকা)।
বেঠিক—ক্রি. বিণ. অপর্যাপ্ত।
বেঢপ—বিণ. বিসদৃশ, ঢিলেঢালা।
বেঁত, বঁ্যাত—বি. মুখ, মুখগহ্বর। (≮বক্ত্র)।
বিত্তাপ—বি. অহংকার। তেজ।
বাতা—বি. চেরা বাঁশ।
বতর—বি. সুবিধা। আবহাওয়া। ধান রোপণ করবার সময়।
বাত্তান—স. ক্রি. জমে থাকা।
বাথান—বি. গরুর খাবার জন্য বড় পাত্র।
বুদি—বি. দোকানে বা ক্ষেতে দড়ির টুকরোয় যে আগুন জালিয়ে রাখা হয় তাকে বুদি বলে।
বিঁদ—বি. ছোট ছিদ্র। (<বিন্দু)।
বদা—বিণ. বিস্বাদ, tasteless.
বাজা—বি. শস্যক্ষেত্র।
বোঁদে—বি. বড় বড় বিন্দুর মতো রসজাত মিষ্টি।
বধা—স. ক্রি. অস্থির করে মারা। (<বন্ধ)।
বোধন—বি. আবাহন।
বুন—বি. ভগ্নী ; বুনুই—বি. ভগ্নীপতি।

বিনানি—বি. বেণী।

বনান—ক্রি. কাটা। কর্তন করা।

বাপা—বি. বৎস, বাছা।

বাবু—বি. ছেলে, বৎস। ববা—বিণ. মূক।

ব্যাভার—বি. ব্যবহার, আচরণ।

বোমা—বি. বোমার মতো আকৃতিবিশিষ্ট তেলেভাজা।

বরাত—বি. ভাগ্য। বরা—বি. শূকর, বরাহ।

বুলা—অ. ক্রি. বেড়ান, ঘুরে আসা।

বেলা হওয়া—যৌ. ক্রি. সময় হওয়া।

বিলাল—বি. বিড়াল। বিলম—অব্যয়. দেরী।

বালস—বিণ. খুব ছোট ছেলে। (<বাল-সদৃশ)।

বালসান—ক্রি. নামধাতু। শিশুরোগবিশেষ। রিকেট।

বালকি—বিণ. ভারী, মোটাসোটা, স্থূল।

বেলগ—বিণ. পৃথক, আলাদা, ভিন্ন।

বিয়ান—স. ক্রি. প্রসব করা। ২) বিয়ান—বি. বৈবাহিকা।

বুঢ়াসিন—বি. ভাসুর।

বিয়া, বিহা—বি, বিবাহ।

বাসিয়াম<ব্যাসাম—বি. প্রাতঃরাশ (বাসি ভাত)

বাসাম বেলা—বি. দুপুরবেলা।

বাসান—স. ক্রি. গন্ধ করা।

বেসাতি—বি. তরকারী (রান্না তরকারী) ২) বেসাতি—ক্রি. দেরী করা।

বিষান—স. ক্রি. নামধাতু. বিষাক্ত করা।

বিষড়া—বিণ. যা সেদ্ধ হয় না।

বাস—বিণ. গন্ধ। বাস-করম—স. ক্রি. শ্রাদ্ধের পরের দিনের ক্রিয়াকর্ম।

বাহ্যা—বি পায়খানা।

বাড়ন—বি. ঝাঁটা। (<বর্ধনী)।

বাড়া—স. ক্রি. বাহির করা।

বাড়ুই—বি. ঘরামি।

বড় রোগ—বি. কুষ্ঠ ব্যাধি। বড়-ঠাকুর—বি. শনিদেবতা।

বড়ি—বি. ছোট ছোট বটিকা।

বেড়—বিণ. পরিসীমা, ঘের।

বেড়ি—বি. বলয়।

বড়াং—বিণ. অহংকার, গর্ব।

বিড়া—স. ক্রি. পরীক্ষা করা। ২) বিঁড়া—খড়ের রিং।

ভ

ভেই—বি. ভাই, ভ্রাতা।

ভুঁই—বি. মাটি, মেঝে।

ভুঁইকুড়া—বি. কুক্কুট, মুরগী।

ভাঁওতা—বি. প্রবঞ্চনা, ঠকান।

ভাঁওরি করা—যৌ. ক্রি. ফেরি করা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রয় করা।

ভ্যাক—বি. চেহারা, শ্রী।

ভুক, ভকা—বিণ. ক্ষুধার্ত ; (বুভুক্ষিত) হি. ভুখা।

ভুঁকা—স. ক্রি. বিদ্ধ হওয়া, গেঁথে যাওয়া।

ভেকান—স. ক্রি. চিৎকার করা।

ভাকাঁই যাওয়া—যৌ. ক্রি. অবাক হওয়া (<ভ্যাবাচ্যাকা)।

ভেঁকু—বি. বোঁটা, বৃন্ত।

ভক্তা—বি. গাজনপূজার সেবক।

ভকভকান—ধ্বন্যাত্মক ধাতু, ভক্ ভক্ শব্দ করা।

ভ্যাকা—বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন।

ভখ—বি. ক্ষুধা ; ভখে মরা—ক্ষুধায় মারা যাওয়া।

ভুখেল—বিণ. বৃহৎ, বড়।

ভুগা—স. ক্রি. ভোগ করা।

ভোঁগরা—বিণ. দু'ধার খোলা (<ভঙ্গ)।

ভাগা দেওয়া—স. ক্রি. নির্দিষ্ট অংশে ভাগ দেওয়া।

ভেঙ্গুড়—বিণ. বিকলাঙ্গ।

ভাচা—বি. ধান সিদ্ধ করে চাল করা।

ভাচাতি—বি. বিণ. যারা অন্যের বাড়িতে ধানের বিনিময়ে চাল করে পারিশ্রমিক নেয়।

ভুচুং—ক্রি. বিণ. হঠাৎ, আচম্বিত।

ভাজি—ক্রি. ভাজা।

ভাজ—বি. ভাইয়ের স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ।
ভাজান—স. ক্রি. কানে তোলা।
ভজান—স. ক্রি. মীমাংসা করা।
ভুজ্না—বি. অন্নপ্রাশন।
ভ্যাট—অব্যয়. ছিঃ। ২) ভ্যাট—বি. শালুকফুলের শক্ত বীচি।
ভঁট্রা—বিণ. স্থূল, মোটা।
ভেঁটরা—বিণ. নির্লজ্জ, বেহায়া।
ভট্কা—বিণ. বেঢপ, disfigure।
ভোঁতা—বিণ. ধারহীন, তীক্ষ্ণতালুপ্ত। ২) ভঁতা—স. ক্রি. ভরাট করা।
ভূঁতি—বি. নাড়িভুঁড়ি, কাঁঠালের ভিতরের অসার দ্রব্যাদি।
ভাতুয়া—বি. ভাতের বিনিময়ে শ্রম।
ভাতুয়ান—ক্রি. নামধাতু. নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে থাকা। ভাত খাওয়া।
ভূতমুড়ি—বি. আউশধান।
ভিতর কুনা—বিণ. কূপমণ্ডুকতা।
ভিতর বুজা—বিণ. অন্তর্মুখী।
ভঁতান—স. ক্রি. কর্ষণ করা।
ভাতার—বি. স্বামী।
ভিতরি—বিণ. ভিতরের, মধ্যবর্তী।
ভাদর—বি. ভাদ্র মাস।
ভ্যাদভ্যাদা—বিণ. গলিত।
ভদকা—বি. একধরণের পচা মদ।
ভঁদা—বিণ. বোকা, মূর্খ।
ভঁদড়—বি. একশ্রেণীর প্রাণী।
ভাদু—বি. লৌকিক দেবী।
ভদরভং—বিণ. বেঠিক, দিশাহীন।
ভানা—ক্রি. পেষণ করা। যেমন—ধান ভানা।
ভ্যাপসা—বিণ. গুমোট।
ভাপরা, ভাবরা—বি. ভাপযুক্ত তেলেভাজা।
ভাপান—স. ক্রি. বাষ্পে সেদ্ধ করা, steam boil।
ভ্যাবলা—বিণ. সাদাসিদে, ক্যাবলা, বোকা।

ভবক—বি. সুগন্ধ।

ভ্যাবান—ক্রি. ডাকা, চিৎকার করা।

ভবদর্শন—বি. মৃত্যু। বিশ্বদর্শন।

ভিরমি খাওয়া—স. ক্রি. দিশা হারান, অচৈতন্য হওয়া।

ভরাট—বিণ. পরিপূর্ণ।

ভালা—স. ক্রি. দেখা, তাকানো। (<√ভল্, চুরাদি—ভালয়তি)।

ভেলকান—অ. ক্রি. ভেংচানো, ব্যঙ্গ করা।

ভুলুক—বি. ছিদ্র।

ভুলকা—অ. ক্রি. উঁকি মারা, গোপনে দেখা।

ভেলি-গুড়—বি. শক্ত জমাট বাঁধা গুড়। তেলা গুড়।

ভ্যালা—বি. ছোট নৌকা। একধরণের ভেষজ বীজ।

ভেল্কিবাজী—বিণ. মজা করা।

ভুলকা—বিণ. যার পেটে কথা থাকে না। পেট-আলগা।

ভষম করা—যৌ. ক্রি. হজম করা। (<ভস্ম)।

ভুঁসকুড়া—বিণ. অলস, কুঁড়ে। ভুসকুমড়া—বিণ. অপদার্থ।

ভুসকুক্ড়া—বি. মুরগী।

ভসংভঁস্—বিণ. অগোছালো।

ভিড়কান—অ. ক্রি. ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া। ভিড়কে যাওয়া।

ভড়ং—বি. বাহ্যাড়ম্বর।

ভেড়কা—বিণ. খারাপ চেহারা।

ভাঁড়—বি. ধাপ্পাবাজ। ছোট মাটির ঘট।

ভঁড়রা—বি. পদ্মটাঠী। পদ্মফুলের বীজাধার। <ভাণ্ড।

ম

মই—বি. কাঠের সিঁড়ি। যা প্রয়োজনমতো এদিক-ওদিক করা যায়।

মাইতর—বিণ. মেজ, মধ্যম।

মওকা-পাওয়া—স. ক্রি. সুযোগ পাওয়া। মওলা—বিণ. অল্প ভিজা, মিয়ানো।

মু—বি. মুখ বা বকুনি।

মুক করা—স. ক্রি. বকুনি দেওয়া।

মকমকান—অ. ক্রি. ভাবনাশূন্য হয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়ানো।

মুখ্যা<মুখা—বি. প্রধান।

মুখিয়া, মুখিন—বি. প্রধান-মুখ্য।
মাগা—ক্রি. চাওয়া। ভিক্ষা করা।
মাগনা—ক্রি. বিণ. বিনা পয়সার।
মগরা—বি. জল যাওয়ার জন্য পোড়ামাটির পাইপ। কোঠাবাড়ি।
মাগ—বি. স্ত্রী। মাগী—বি. পরস্ত্রী।
মাগন—বি. চাওয়ার, চাইবার, প্রত্যাশার।—মাগনের দিন। মাগনের সময়। তিথি।
মেচ—বি. মাছের ডিম।
মেচা—বি. বাঁশনির্মিত বসবার উঁচু আসন; arm-chair।
২) মেচা—বি. বেসনের পুর দেওয়া মিষ্টি। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে এই মেচা সন্দেশ বিখ্যাত।
মেচুড়ি—বি. পুঁইফল।
মচ—বি. গোঁফ।
মচকান—ক্রি. বাঁকানো, তুমড়ানো।
মাচুলী—বি. ছোট খাটিয়া।
মাচান—বি. মাচা দেওয়া জায়গা।
মেচিস্—বি. দেশলাই।
মাছি-আঁধরা—বি. গোধূলিবেলার অন্ধকার।
মাছিমারা ডাক্তার—বি. ম্যালেরিয়া, কলেরার ডাক্তার।
মাছিমারা বিদ্যে—বি. তুচ্ছ বা সামান্য ডাক্তারি।
মঁজ, মাজা—বি. মধ্যভাগ। মিজিক মিজিক—ক্রি. বিণ. মিটমাট।
মেজকি—বি. মেজবৌ। দ্বিতীয়া স্ত্রী।
মেঝান—বি. মেজবৌ। দ্বিতীয়া স্ত্রী।
মাজুরি—বি. মাদুর।
মেঝান—বি. সাঁওতাল স্ত্রী-শ্রমিক। স্ত্রী-সাঁওতাল।
মাঞ্জ—বিণ. মধ্যবর্তী। গাছের ভেতরের অংশ।
মিটান—স. ক্রি. পরিশোধ করা।
মটুক—বি. মুকুট।
মুঠ-আনা—বি. একটি বিশেষ শস্য-উৎসব।
মুত—বি. প্রস্রাব।

মিতিন—বি. বন্ধু, সাঙ্গাৎ। মথ্‌রা—বি. চাউলবিহীন ধান (আগড়া)।

মোথলি—বি. মোট, বোঝা।

মুথা ঘাস—বি. একধরণের ভেষজ ঘাস।

মদ্দা—বি. পুরুষ, বীর। ২) মোদ্দা—অব্যয়. মোট। যেমন—মদ্দা কথা।

মাদী—বি. স্ত্রী।

মাদানা—বি. (মহা+দানা) লৌকিক অপদেবতা।

মাদার—বি. আতা, নোনাফল।

মুদা-ধরা—স. ক্রি. দেয়াসী কর্তৃক তুক্‌-তাক বা ধর্মাচার।

মন্থুনি—বি. কর্ত্রী, controler।

মিনি—বি. ছোট মেয়ে।

মেনেক, ম্যানেক—অব্যয়. কথার মাত্রাবিশেষ।

ম্যামান—স. ক্রি. মা, মা করে ডাকা। ছাগলের ডাক।

মাম্‌ড়ি, মামুড়ি—শুক্‌নো খোসা। (ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেলে যে শুকনো ছাল ওঠে তাকে মাম্‌ড়ি ওঠা বলে)।

মরদ—বি. পুরুষ।

মেরম—বি. ছাগল বা ভেড়া। (মেষ+ভেড়=মেড়<মেরম।)

মাল—বি. জিনিস, দ্রব্য। মলা—ক্রি. মোচড় দেওয়া।

মূলন, মুলুন—বি. পদ্মগাছের মূল। <মৃণাল।

মালাইচাকি—হাঁটুর হাড়। মোল—বি. মহুয়া ফল।

মশা—বি. মেসোমশায়। ২) মশা—বি. কীট।

মশান—বি. শ্মশান।

মৌসী, মাসি—বি. মাসীমা।

মাস—বি. মাংস।

মাড়—বি. ফেন।

মাড়া—স. ক্রি. পেষণ করা। ২) মাড়া—অব্যয়. কথার কথা। মায়ের শপথ। যথা—দূর মাড়া, আমি কি তাই বললাম।

মাড়ি—বি. শাস।—তালমাড়ি। ২) ক্রি. মাড়াই করা। ৩) মাড়ি—বি. দাঁতের গোড়ার মাংস।

মুড়া—বি. মুণ্ড, মস্তক। ২) মুড়া—বি. মোড়ল, প্রধান।

ম্যাড়ম্যাড়ি—বি. শুক্‌নো পিঁচুটি।

মাড়া জুড়া—যৌ. ক্রি. খড় মাড়া দেওয়া।
মুড়ান—ক্রি. নামধাতু. সমূলে বিনষ্ট করা।
মুড়কাটা—বি. গালিবিশেষ।
মোড়—বি. বাঁক।
মোড় ভঙ্গা—বি. ভ্রষ্টলগ্ন। (<মুকুটভ্রষ্ট)।
মেড়, ম্যাড়—বি. প্রতিমার কাঠামো ; structure।
মেয়া—বি. স্ত্রী।
মায়ি—বি. মা।

য

যঁক দেওয়া—যৌ. ক্রি. যক্ষ করা।
যাঁক দেওয়া—যৌ. ক্রি. চাপ দেওয়া।
যগ্‌গি, যগ্যি—বি. যজ্ঞ।
যাচা—ক্রি. স্বেচ্ছায় পাওয়া।
যাঁতাল-পরব—বি. লৌকিক উৎসব।
যুভা দেওয়া—যৌ. ক্রি. গুঁজে দেওয়া, ভরে দেওয়া।
যাম-জুটকি—বিণ. যমজ ; twin।
যমের অরুচি—বি. গালি অর্থে ব্যবহৃত। মৃত্যুও যেখানে আসে না।
যম-দুয়ার—বি. মৃত্যু।
যবুথুবু—বিণ. জড়সড়।

র

রা—বি. শব্দ, কথা। রাই—বি. সরিষা।
রক—বি. বারান্দা।
রকা—বিণ. কাঁচা, টাটকা, raw। ২) বি. কাগজের টুক্‌রো, slip।
রকত—বি, রক্ত।
রোক—বি. ইচ্ছা, রুচি। (√রুচ্‌+ঘঞ=রোক);
রা-কাড়া—যৌ. ক্রি. কথা বলা (রব>রা)।
রাখাল—বি. বাগাল।
রুখু—বিণ. রুক্ষ। শুষ্ক।
রগড়—বি. মজা, কৌতুক।
রগরগা—বিণ. উত্তেজক।

রগড়ান—ক্রি. ঘষা।

রগে রগে—বি. শব্দদ্বিত্ব. গোড়ায় গোড়ায়।

রাগে রাগে—ক্রি. বিণ. তেজের সঙ্গে।

রুগড়ী—বি. মোরাম; stone chips।

রগা—বি. কুষ্ঠব্যাধি।

রুচা—স. ক্রি. ভাল লাগা, রুচি হওয়া।

রচ্‌রচান—অ. ক্রি. মচ্‌মচ্‌ করা।

রাজট—বি. আলোচনা।

রুজু—অব্যয়. সম্মুখ, সামনে।

রটা—ক্রি. রটনা হওয়া, ছড়িয়ে পড়া।

রীত্‌—বি. রীতি।

রেতের বিলা—বি. রাত্রিকাল।

র‍্যাঁদা—বি. ছিদ্র করার যন্ত্র।

রঁদ্‌—বি. বেড়া।

রুপু—বি. টিয়াপাখী। রুপিতন—বি. রুইতন।

রফা—বি. শর্ত।

রবাট—বি. রবার, rubber। রবরবা—বিণ. জমজমাট।

রাম—বি. শ্রেষ্ঠ। প্রথম। গণনার সময় '১' না বলে বলে রাম '২' ইত্যাদি।

রামঝিঙা—বি. ঢেঁড়স।

রলা—বি. খুঁটি।

রুলি—বি. বালা, চুড়ি।

রিলিং—বি. রেলিং।

র‍্যালগাড়ী—বি. রেলগাড়ী, train।

রিস্‌—বি. ঈর্ষা।

রসা—বি. রান্নাঘর (<রসবতী)। হি. রসোই। ২) রসা—বিণ. রসাল।

রেসা—বি. অংশীদার।

রসে রসে—ক্রি. বিণ. জমিয়ে জমিয়ে, রসপূর্ণ করে।

রুষা—বিণ. রাগান্বিত হওয়া।

রহমে রহমে—ক্রি. বিণ. ভালয় ভালয়। tactfulness.

রাঢ়—বি. একটি বিশেষ ভূমিঅঞ্চল। রাঢ়বঙ্গ।

রড়া—বি. মারের চোটে গায়ে দাগ হয়ে যাওয়া।

রাঁড়ি—বি. বিধবা।

রুয়া—স. ক্রি. রোপণ করা।

রুঁয়া,রোঁয়া—বি. লোম (<রোম)।

রং—বি. মজা, তামাশা।

রাং—বি. মেটে।

রেঙ্গা—বিণ. ফাজিল, চ্যাংড়া।

রাঙ্গের টাক—বি. আদুরে গোপাল।

রং লাগা—স. ক্রি. রোমান্স হওয়া, আনন্দিত হওয়া।

রাং-ঝাল—বি. টিন, কাঁসা ইত্যাদি জোড়া লাগাবার ধাতু।

রঙ্গিণী—বি. প্রেমিকা ; তুচ্ছার্থে—নষ্ট মেয়েমানুষ।

ল

ল—বিণ. চতুর্থ। যেমন—ল' বৌ=চতুর্থ নম্বরের বৌ।

লা—বি. নৌকা।

লাই দেওয়া—স. ক্রি. প্রশ্রয় দেওয়া।

লাই— বি. নাভি। ল্যাওটা—বিণ. আসক্ত, বশীভূত।

লক, লুক—বি. লোক, ব্যক্তি।

লক্‌লকে—বিণ. তাজা, সতেজ।

লাকারা—স. ক্রি. পেট ভরে খাওয়া।—লাকারা খাঁয়েছিস্ ত।

লুক্ চুকানি—বি. লুকোচুরি।

ল্যাক্‌প্যাকে—বিণ. নরম।

লখী—বি. লক্ষ্মী।

লেগে—অব্যয়. জন্য। লগে—অনুসর্গ, নিকটে।

লেগা—স. ক্রি. নিয়ে যওয়া (√ নী+√ গম)।

লগা—বি. আঁকর্ষি>আঁক্‌শি।

লগম, লং—বি. লবঙ্গ।

লগম লতিকা—বি. লবঙ্গ ফুটানো মিষ্টি।

লাগান—ক্রি. রোপণ করা।

লাগান—ক্রি. একজনের কথা অন্যজনকে বলা।

লাগাম—বি. সীমা, সংযম।

লাগ—বি. উৎসবের উপহার। লিঘ্যাত—অব্যয়. নিশ্চয়।
লাচ—বি. নাচ, নৃত্য।
লেচি—বি. লেই, মণ্ড। ল্যার-প্যাচা—বিণ. কাঁচা, অপক্ক।
লাছদুয়ার—বি. খিড়কি দরজা। লচ্ছার—বি. ছারপোকা।
লেট্‌লেটা—বিণ. আঠাআঠা ভাব।
লাটিম—বি. লাট্টু।
লেটা, লেঠা—বিণ. ডান হাতের থেকে বাম হাতে কাজ করতে যে দক্ষ।
লটর-পটর, লুটুর-পুটুর—বিণ. ম্রিয়মাণ, ঝিমানো।
লটলট—বি. গোলমাল, এলোমেলো।
লট বহর—বিণ. প্রচুর জিনিস। total things.
লেঠেল—বি. লাটিয়াল।
লতা—বি. সর্প। (রাত্রিবেলা অনেকে সাপ না বলে, বলেন লতা)
লাতা—বি. ন্যাতা।
লাতি—বি. নাতি। লাতিন—বি. নাতিনী।
লতুন—বিণ. নূতন।
লেতাড়—ক্রি. ঠোকাঠোকি, ছোঁয়াছুঁয়ি ; পারস্পরিক সংযোগ।
লেতাড়ে লেগা—যৌ. ক্রি. তেড়ে নিয়ে যাওয়া। (√নী+√তড়)।
লাদ—বি. বিষ্ঠা। লাজা—বি. অনেকটা, প্রচুর।
ল্যাদা—বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন ; unsmart।
লদী—বি. নদী।
ল্যাদাড়ি—বি. গুটি গুটি বিষ্ঠা।
লেদকা—বিণ. বাঁকা।
লাদমা—বি. মুগুর।
লদর-পদর—বিণ. স্থূলভাব।
লোধা—বি. আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিবিশেষ।
লিধন—বি. নির্ধন।
লেপটান—স. ক্রি. জড়িয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া।
ল্যাপসি ঘাঁটা—বি. মিশ্রণজাত খাদ্য।
লেপা—ক্রি. মাখানো, প্রলেপ দেওয়া।
লিপি—বি. ভাগ্য, লেখা।

লাপতে—বি. নাপিত। লিপিতা—বি. বেহায়া।

লুফা—ক্রি. ধরে নেওয়া ; catch।

ল্যাবা—বিণ. বোকা। লাবদা—বি, লাঠি।

লবর-চবর—বি. মাখামাখি। আমোদ-প্রমোদ।

লবাত—বি. পাটালিজাতীয় মিষ্টি। (<নববাত)

লবান—বি. নবান্ন। নূতন অন্নের উৎসব।

লবং—বি. লবঙ্গ।

লবজ্যা—বিণ. খোলামেলা।

লবজান—অ. ক্রি. গেঁজানো, জমানো। (<লপ্‌+জ=লব্ধ)

লেবরা—বিণ. লোভী। তু. সাঁ. লেবরা=অতিলোভী।

লুভ করা—স. ক্রি. লোভ করা। লিমুসক্যা—বিণ. নিতান্ত নিরীহ। (ব্যঙ্গার্থে)।

লিরণ—বি. মাঘ মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত বর্ষাহীন সময়।

লারব—ক্রি. পারব না।

লরম—বিণ. নরম, কোমল।

লেলা—বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন ; unsmart।

ললা—বি. লোভ, খাবার আকাঙ্ক্ষা। (<নলা)।

ললকান—স. ক্রি. লোভ দেখানো।

লুলুহা—বি. হাতের চেটো।

লেলকা—ক্রি. লেলিয়ে দেওয়া।

লেলে—অব্যয়. কুকুরকে ডাকার শব্দ।

লেলাং ধেসাং—বিণ. এলোমেলো, অবিন্যস্ত।

লোল—বিণ. আলগা, ঢিলা।

লালমা—বিণ. লালচে, লাল আভাযুক্ত।

লুলি—বি. গলার মধ্যকার নল, কণ্ঠনলী।

লুলা—বি. হাতের কব্‌জি।

লসকান—বিণ. ক্ষতি, লোকসান।

লেসুয়া—বি. একধরণের আঠাযুক্ত ফল।

লিষ্ঠা—বিণ. নিষ্ঠা।

লিশুড়্যো—ক্রি. বিণ. দাঁত বের করে। (<নিঃসৃত।)

লিস্ফোট—স্পষ্ট। (<নিঃ+স্ফুট)

লিশ্চিন্ত—অব্যয়. নিশ্চিন্ত। উদ্বেগহীনভাবে।

লেশা—বি. নেশা ; habit।

লুহা—বি. লোহা। লিহাড়্যা—বিণ. অস্থিহীন। (<নিঃ+হড্ড)।

লহর‍্যা—বিণ. কৌতুকপ্রিয় ; fun loving (<লহরী)।

লড়া—বি. নোড়া, মশলা বাঁটার জন্য পাথরের টুক্‌রো।

২) লড়া—ক্রি. নড়া, আন্দোলিত হওয়া।

৩) লড়া—বি. হাতে আখা অর্থাৎ বাহুর সংযোগস্থল।

লড়বড়্যা—বিণ. অকেজো।

লাড়া কাটা—বি. নিম্নশ্রেণীর মজুর।

লাড়—বি. বিধবা। ২) লাড়—বি. নাড়ী।

লাড়-কাটা-মাগী—বি. নাড়ী কাটে যে মহিলা অর্থাৎ ধাত্রী>ধাই।

ল্যাড়া—বিণ. ন্যাড়া, চুলবিহীন।

লুড়কি—বিণ. ছোট, ক্ষুদ্র।

লাড়ু—বি. মিঠাই।

লাড়ির টান—প্রাণের সংযোগ।

লয়—অব্যয়. নয়।

লিয়ালদড়ি—বি. বাবুই দড়ি।

লিয়াই—বি. ঝগড়া।

লুয়া—বি. লোহা।

ল্যাং—বি. ঠ্যাং, পা।

ল্যাংট—বিণ. উলঙ্গ।

ল্যাংড়া—বিণ. খোঁড়া।

ল্যাংড়ান—স. ক্রি. খোঁড়ানো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা।

শ, ষ, স

শাঁক—বি. শঙ্খ। শাগ—বি. শাক।

শাপা—বি. অভিশাপ।

শিশা, শিশে—বি. শিশি।

শুঁয়া—বি. শুঁয়ো পোকা, রোম।

শুঁড়াবে আসা—যৌ. ক্রি. তাড়া করে আসা ; (<শুণ্ড)।

শালকি—বি. ঠোঁটের ঘা।

শেখি, শেগি—বি. তেজ। (মুসলমান চার জাতির মধ্যে 'শেখ' প্রধান ও প্রথম জাতি। তাদের স্বভাব=শেখি)

ষাঁড়ারু—বি. মোষের বাচ্চা; (<ষাণ্ডরূপ)।

সুই—বি. সূচ।

সইর করা—ক্রি. সমান করা, level।

সিক—বি. লোহার গারদ।

সিকা—বি. দড়ির ঝুলি।

সকড়ি—বিণ. এঁটো (সংক্রমিকা)।

সুকসমুদা—অকারণ।

সাকিন—বি. ঠিকানা।

সগ্‌গ—বি. স্বর্গ

সং—বি. যাত্রা, আংশিক নাটক।

সাঙ্গা—বি. অবৈধ বিবাহ।

সিজা—ক্রি. সেদ্ধ।

সিজান—বি. সরস্বতী পূজার পরের দিনের অনুষ্ঠিত পর্ববিশেষ। এ দিন প্রথানুযায়ী কতকগুলি জিনিস গোটা গোটা বাসি সেদ্ধ খাওয়া হয়। একে সিজান পরব বলে। (সিদ্ধ+অন)।

সিমিজ—বি. সেমিজ। বয়স্কাদের maxi।

সেজকি—বি. সেজ বৌ।

সটকা লাগা—স. ক্রি. বিষম খাওয়া।

সটকান—যৌ. ক্রি. সরিয়ে নেওয়া।

সটকে যাওয়া—যৌ. ক্রি. ছিটকে বেরিয়ে আসা।

সটান—সোজা, বরাবর।

সোঁটা—বি. বেণী।

সুঁটি, শুঁটি—বিণ. বেণীর মতো লম্বা আকৃতি।

সঁটরান—যৌ. ক্রি. টেনে চলা।

সতর—বি. সতর্কতা।

সুতিয়া—বি. ছোট পাহাড়ী নদী।

সাত-সতের—বিণ. অনেক কিছু, এটা সেটা।

সঁতা—বি. আর্দ্র, ভিজে ভিজে।

২) সঁতা—বি, ন্যূনতা পূরণ।
সাতসুন্দি—অনেক ভিতরে।
সোত জমি—বি. জলাভূমি।
সাঁতলান—ক্রি. তেল, ফোড়ন ইত্যাদি দিয়ে ছকা।
সৎ-ছা—বি. সতীনপুত্র।
সাদ—বি. স্বাদ, taste।
সিঁদুরা—বিণ. সিঁদুরের মতো লাল।
সুদান—ক্রি. জিজ্ঞেস করা।
সাদন্ন—বি. গর্ভবতীকে তার ইচ্ছানুযায়ী অন্নভক্ষণ উৎসব।
সিধা—বিণ. সোজা। ঋজু।
সিঁধান—অ. ক্রি. নামধাতু. ঢোকা, প্রবেশ করা।
সানা—ক্রি. চটকান, মাখা।
সানকি—বি. তেলানো পাত্র।
সত্না—বি. সজিনা।
সিন্নি—বি. সত্যনারায়ণ এবং সত্যপীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ (আটা, কলা, দুধ, ফল ইত্যাদির মিশ্রণ)।
সান—বি. জ্ঞান। (<সংজ্ঞা)।
সানকাড়া—যৌ. ক্রি. ঘোমটা টানা। ছাদন আকৃষ্ট করা।
সিপি—বি. ঢাকনা।
সিপটি—বি. ছোট লাঠি।
সিপ্‌টান—ক্রি. আঘাত করা।
সাদা-সাপটা—বিণ. সাধারণ, সাদামাটা।
সাঁপটান—স. ক্রি. তাড়াতাড়ি খাওয়া। (সর্প+বর্ত, দ্র. O.D.B.L, p. 684)
সাপুটা—ক্রি. জড় করা, জড়িয়ে ধরা।
সঁপ্‌রা—বি. লঙ্কা।
সাপুড়া—বি. যে সাপ নাচায়।
সাফা—বিণ. পরিষ্কার।
সাবুন—বি. সাবান।
সব্‌জা—বিণ. সবুজ।
সাবু—বি. সাগু।

সুমুদা—বি. যারা নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির করতে আসে।

সেমুই যাওয়া—স. ক্রি. প্রবেশ করা, ঢোকা।

সুম্‌সাম—ক্রি. মিটিয়ে নেওয়া।

সম্বরা—বি. ফোড়ন।

সরা—বি. মাটির পাত্র।

সরকা—বি. রশি, দড়ি। সায়ার সরকা, প্যান্টের সরকা ইত্যাদি।

সরাক, শরাক—বি. এই অঞ্চলের জৈনধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। এরা ঘোর নিরামিষাশী।

সিরা—বি. রস। যেমন—চিনির সিরা।

সেরহা—বি. সেরের এক-চতুর্থাংশ।

সুরকি—বি. ইটের গুড়ি। ইট চূর্ণ।

শীল, সিল—বি. পাথর।

সোলা বিণ. হাল্কা।

সোল জমি—বি জলাভূমি, উর্বর জমি।

সইতে যাওয়া বা সয়তে যাওয়া—ক্রি. আনা। যেমন—জল সয়তে যাওয়া।

সহা, সয়া—স. ক্রি, সহ্য করা।

সুয়াদ—বি. স্বাদ।

সুয়াং—বি. মেজাজ, (<স্বয়ং)।

সাড়া—বি. শব্দ।

সাড়—বি. চৈতন্য, জ্ঞান।

সাঁড়া—বি. পুরুষ, পুংলিঙ্গ।

সাঁড়ি—বি. স্ত্রী, স্ত্রীলিঙ্গ।

সড়প—বি. সড়ক (বর্ণ বিপর্যস), রাস্তা।

সাঙ্গা—বি. উপবিবাহ :

সাঙ্গাৎ—বি. বন্ধু, সুহৃদ।

হ

হঁ—অব্যয়. হ্যাঁ, yes। হঁইছে—ক্রি. হয়েছে।

হাই—সর্ব. এই। হুই—সর্ব. ওখানে।

হক্—বিণ. খাঁটি, সত্যি।

হাঁকা—ক্রি. ডাকা।

হাঁকান—স. ক্রি. অস্বীকার করা।

হকচকান—অ. ক্রি. অবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়া।

হাঁক্রান—অ. ক্রি. গর্জন করা। (>হুঙ্কার)।

হাঁকু-পাকু—বিণ. অস্থিরতা।

হিক্কা ওঠা—স. ক্রি. হেঁচকি ওঠা।

হুক্কা হুয়া—বি. শেয়ালের ডাক।

হুঁকা—বি. তামাক সেবন করার জন্য নারকেল মালার তৈরি জিনিস। হুঁকো।

হাঁকড়-কামড়—বিণ. আকুলি-ব্যাকুলি। অস্থিরতা।

হাগা—বি. পায়খানা।

হিঁচ্‌কা—ক্রি. টান মারা। হুঁচুক—বি. উত্তেজনা, খেয়াল।

হেঁচড়ান—ক্রি. টেনে নিয়ে যাওয়া।

হচং হচং—ধ্বন্যাত্মক ধাতু। বিণ. ছন্দহীনভাবে।

হাজা—বি একধরণের ক্ষত। বেশী জল ঘাঁটলে হাতে-পায়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে হাজা বলে।

হেজাক বাতি—বি. গ্যাস বাতি, day-light।

হজমি বড়ি—বি. পরিপাক বটিকা।

হুজুত—বি. ঝামেলা।

হেঁটমুড়া—বিণ. নতমস্তক।

হিটকা—অ. ক্রি. আটকে যাওয়া।

হেঁটরান—স. ক্রি. অনুরোধ করা।

হ্যাট-হ্যাট—ধ্বন্যাত্মক ধাতু। ক্রি. গরু তাড়াবার শব্দ।

হেতার—বি. হাতের কাজ করবার যন্ত্রপাতি।

হত্তুকী—বি. হরিতকি।

হত্তা দেওয়া—স. ক্রি. ধর্ণা দেওয়া।

হোথম—ক্রি. হতাম।

হাথী—বি. হাতি।

হিদয়—বি. হৃদয়, প্রাণ, জীবন।

হুদকে ওঠা—স. ক্রি. চঞ্চল হওয়া, চমকে ওঠা।

হেদিয়ে যাওয়া—যৌ. ক্রি. নেতিয়ে পড়া, ঝিমানো।

হদহঁদাই—ক্রি. বিণ. প্রবলভাবে।

হদকদা—বিণ. বাচাল।

হাধন্যা—বি. নির্ধন। ধনহীন।

হাপা—বি. ঝামেলা, সমস্যা।

হাঁপাল—বিণ. মোটাসোটা।

হামালা—ক্রি. ডাকা। গাভী ও গোবৎস পরস্পরকে কাছে পাওয়ার জন্য যে ডাক ছাড়ে তাকে হামালা বলে।

হামেশা—অব্যয়. অনবরত। প্রায় সময়ই।

হিলা—অ. ক্রি. দোলা, দুলে যাওয়া (√হিল)।

হেল মারা—ক্রি. ছোঁয়া, ছুঁয়ে দেওয়া।

হেল দোল—ক্রি. বিণ. ভ্রূক্ষেপ, নড়াচড়া। (√হিল্+√দুল্)।

হেলান—যৌ. ক্রি. নুয়ে যাওয়া, নোয়ানো। বাঁকা।

হুলহুলি—বিণ. ফাঁকা, শূন্য।

হাল—বিণ. অবস্থা। ২) হাল—বি. চাষ।

হুল—বি. পাথর ; ২) হুল—বি. শুঁড়।

হুলকা—বিণ. হুজুগে।

হুলুধ্বনি—বি. উলুধ্বনি।

হল্দা—বিণ. হলুদ বর্ণের।

হেংলা—বিণ. লোভী।

হিঁসকুটুলে—বিণ. হিংসুক।

হিঁসুরা—অনুকার শব্দ। হাঁফান। (<হিঁ সুরাতি ইতি হিঁসুরা)।

হিঁসকা—বি. অভ্যাস।

হাঁসুয়া—বি. দা, কাস্তে।

হাঁসা—বিণ. সাদা।

হাঁসকল—বি. ছিটকিনি, খিল।

হেঁসপেসান—অ. ক্রি. হাঁপিয়ে যাওয়া।

হড়কান—যৌ. ক্রি. সরিয়ে নেওয়া, ফুসলিয়ে নিয়ে নেওয়া।

হড়কা—বিণ. পিচ্ছিল।

হড়হড়া—বিণ. পিচ্ছিল।

হড়পা—বি. বন্যা, হঠাৎ বন্যা আসা।

হড়হড়ান—বিণ, ঢালু, গড়ান।

হুড়কো—বি. খিল, ছিটকিনি। কাষ্ঠনির্মিত অর্গল (√হুড+অক্)।
হুড়া—বি. গুঁতো।
হুড়ান—অ. ক্রি. ভুলিয়ে নেওয়া।
পুড়কুষ্ঠা—বিণ. বিবেচনাশূন্য। rash, hasty।
হুড়মুড়া—বি. সমগ্র জায়গা, একসঙ্গে।
হুড়াভাগ—বি. সমানভাগে বণ্টন করে দেওয়া ভাগ।
হোড়—বিণ. বেপরোয়া, দুঃসাহসী।
হাঁড়িয়া—বি. পচা মদ্য বিশেষ।
হড়গজ—বি. বিশৃঙ্খলা. কারসাজি।
হড়বড়্যা—বিণ. চঞ্চল, ছটফটে।
হাড়গিলা—বিণ. অত্যন্ত রোগা।
হিড়—বিণ. সারি, শ্রেণী।
হাড়-জুড়ানো—স. ক্রি. নিশ্চিন্ত হওয়া।

আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশের নাম।

১। বাঁকুড়ায় **কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ঃ**

(i) **লাঙল**—'লাঙল', বা 'লাঙ্গল' শব্দটি শুধুমাত্র বাঁকুড়ায় নয়, ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। সিলর্ভ্যা লেভি বহু অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে 'লাঙল' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ কাম্বোডিয়ার ক্মের, আসামের খাসিয়া এবং সুমাত্রার বাটক উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

লাঙলের বিভিন্ন অংশের নাম :—(১) ত্রিকুন মোটা কাঠ। (২) তীরের মত বাট বা ইশ্। (৩) একটি মোটা ও মজবুত কাঠ। (৪) বোঁটার কাঠ বা খিল (৫) লাঙলের পিছনে ইশের মাথায় ছোট খিল (৬) লম্বা ১ হাত হাইল পাটি লোহার নাম ফলা (৭) পাশুনি, (৮) আলান (৯) আঙরো (১০) ১টি জোয়াল ২ পাশে দুটি গরু কিংবা মহিষ।

(ii) **দুনী**—জলসেচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লৌহ বা লৌহপাত নির্মিত লম্বা নৌকার মতো পাত্রবিশেষ।

(১) একা-দুনী স্থাপন করার জন্য বাঁশদণ্ড।

(২) জাঁতাল—যূপকাষ্ঠের আকৃতিবিশিষ্ট গাছের ডাল। দুনী চালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

২। **আখ পেষাই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম ঃ**
(i) মাকু, (ii) মাদল, (iii) কাতুড়ি (iv) আড়ানি (v) গড়ল। গড়ল হ'ল চক্রাকার বৃত্তে পেষণযন্ত্রের মূল দণ্ড, যা ক্রমাগত আবর্তিত হয়।

৩। **গরুর গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম ঃ—**
(সংগ্রহ—রবিলোচন বাউরি, করকটা, বাঁকুড়া)

(১) গোল কাঠের পাই।
(২) ২টি মোল আড়া (২ × ৩)=৬টি আড়া
(৩) ৬টি পুয়া বা পুঁটে দিয়ে গোলাকার বৃত্ত।
(৪) চাকের ঘেরাকে আটক করবার কাঠ।
(৫) ২টা চাকের হাইল পাটি।
(৬) পাইকে গোল ঘেরায় আটা করবার কব্জা বা বন্দ।
(৭) চাকের ছিদ্রের মাঝে লোহা, নাম—উলা।
(৮) চাকের মাঝে চাককে ঘোরাবার জন্য যন্ত্র, নাম—লেগা।
(৯) চাকা দুটিকে আটক করবার জন্য লাগে—মুড়া বা ধুরো।
(১০) চাকা দুটি টানার জন্য ৭½ হাত লম্বা বাঁশ, নাম—উদল।
(১১) বাঁশ দুটিকে জোড়ার জন্য কাঠ যার নাম—কুমড়া বা কুমড়ে।
(১২) ২টি উদলকে হালে গাঁথার জন্য লাগে বেগা। ৫টি কিংবা ৮টি বেগা দরকার।
(১৩) উদল দুটিকে একজায়গায় জুড়বার জন্য ব্যবহৃত হয়—জিবা।
(১৪) জিবার গড়ায় জুয়াল বাঁধা হয়।
(১৫) চাকাকে আঁট করবার জন্য ব্যবহৃত হয় যে গুঁজি তার নাম আলুন।
(১৬) জুয়াল হ'ল গরু বা মহিষ জোতার কাঠ।
(১৭) চাকার নীচে ঠেক দেওয়ার কাঠকে বলা হয়—অট।
(১৮) গরু বাঁধবার দড়িকে বলে—পাগা।
(১৯) বলদের গলার কাঠের ঘণ্টাকে বলে—ঠরকা।
(২০) গাড়িতে বসার আচ্ছাদিত স্থানের নাম—ছই।
(২১) ছই-এর উপর যে বেড়া দেওয়া হয় তার নাম—খাটলা।
(২২) জুয়াল বাঁধা হয় যে দড়ি দিয়ে তাকে বলে—আন্দ।
(২৩) পিছনের ভার ঠেকা দেওয়া হয় যে কাঠ দিয়ে তার নাম—পিছাড়ি।
(২৪) উপরের বা সামনের ভার সামলাবার যন্ত্র—টুঁড়ি।

(২৫) দুটি বলদ কিংবা মহিষ দিয়ে গাড়ি টানা হয়।

৪। **তাঁতের বিভিন্ন অংশের নাম :**

(সংগ্রহ—মিলন গুঁই, সোনামুখী, বাঁকুড়া)

১) বারণরাজ—(কাঠের তৈরি, যাতে সূতা গুটানো থাকে)

২) কোলনরাজ—(কাঠের তৈরি, যাতে কাপড় গুটানো থাকে)

৩) টানা—(সূতা)

৪) মাকু—(কাঠের তৈরি)

৫) কল—(কাঠের তৈরি)

৬) সানা—(শরের তৈরি)

৭) ফার্মা—(কাঠের ঠেকান, supporter)

৮) পাষাণ নুড়ি ; (৯) যুতেশ ; (১০) নাইলন 'ব' ; (১১) ডাঙ্গি (বাঁশের) ; (১২) জোত (শরের) ; (১৩) বাজু (কাঠের) ; (১৪) কোল খুঁটি ; (১৫) বার খুঁটি ; (১৬) খিল (কাঠের) ; (১৭) নাচন পাখী ; (১৮) দড়ি ; (১৯) মুঠি বা মুঠ (কাঠের) ; (২০) বাক্র ঘর (মাকু থাকার ঘর) ; (২১) ললি (যাতে সূতা গুটানো থাকে) ; (২২) হাড় গোঁজ (কাঠের) ; (২৩) চালান বাজু (কাঠের) ; (২৪) দোয়াল (পতরের) ; (২৫) আরাটি (কাঠের) ; (২৬) ফাঁদালি (কাঠের) ; (২৭) নাটা (বাঁশের) ; (২৮) চরকা (কাঠের) ; (২৯) উগুই (বাঁশের)।

তাঁত বোনার আগে কাজ করবার সরঞ্জাম

১) খারি, ২) ফিরেন, ৩) কুরুনি. ৪) সানা গাঁথা, ৫) শিশাবন ৬) তোষন, ৭) ঢাল, ৮) 'ব'। এরপর তাঁত চালু করতে হয়।

৫। **কাঁসার ঘটি নির্মাণের যন্ত্রাদি :**

(সংগ্রহ—শৈলেন দাস, বাঁকুড়া)

পেটা কাজ=কাঁসার কাজ। ঘটির পেটা কাজ=কাঁসার ঘটি নির্মাণের কাজ।

১) ছাঁচ=মাটি ও বালি দিয়ে তৈরি মডেল।

২) মুচি=যার মধ্যে ধাতব দ্রব্য দেওয়া হয় গলাবার জন্য।

৩) শাল=ধাতু গলাবার জন্য বড় উনুন।

৪) জোত=১২ হাত টানা দড়ি।

৫) তাতানে=গরম করবার পাত্র।

৬) ছেনি/ছিনি=লোহা/ধাতুকাটা যন্ত্র।

৭) টপনা = ছিদ্র করার যন্ত্র।

৮) ভাটি/শাল = উনুন।

৯) লালি = নালা

১০) উগা = পরিষ্কার করার যন্ত্র। বিভিন্ন ধরণের উগা, যেমন—
i) ছুরি বা হুরি উগা, ii) গোল উগা, iii) অর্ধ গোল উগা, iv) তিনসিরা উগা, v) মালাকাটা উগা, vi) কাঠঘষা উগা ইত্যাদি।

১১) শাবল—মাটি খোঁড়া বা গর্ত করার লৌহদণ্ড।

১২) চৌপল—চতুর্দিক সমান করার যন্ত্র।

১৩) খাবলা, ১৪) বাউলি, ১৫) জোড়া কাঠ, ১৬) কুন্দ/কুঁদ কাঠ (মোটা কাঠের গুঁড়ি), ১৭) খাপ কাঠ, ১৮) আল কাঠ, ১৯) লুয়ালি, ২০) ঝোড় কাটা, ২১) গলা কুন্দা, ২২) চাকী পালিশ, ২৩) কাটলা, ২৪) বিট কটালি, ২৫) কাটতেল, ২৬) চুল টানা, ২৭) কম্বল ছেঁড়া, ২৮) টেনা ছেঁড়া (ছেঁড়া কাপড়), ২৯) ঘুঁটের পাঁশ (ছাই), ৩০) জোত= টানা দড়ি, ৩১) হাতুড়ি, ৩২) ফাল, ৩৩) কোপ কাঁটা, ৩৪) ধূনা, রজন, রাং ইত্যাদি, ৩৫) ছাঁচের মাটি।

৬। ঢেঁকির বিভিন্ন অংশের নামঃ

১) আঁকশালাই—ঢেঁকির মূল কাষ্ঠখণ্ড।

২) গড়—যে গর্তে ধান ভানা হয়।

৩) চুঁয়লি—মূল দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মুষলাকৃতি দণ্ড।

৪) পওয়া—যূপকাষ্ঠের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠ, যেখানে ঢেঁকির মূল কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত হয়।

৫) সামা অথবা সামী—চুঁয়লির প্রান্তে সংযুক্ত লোহার বেড়ি।

৬) সিকেলরি বা আঁকুশি—লম্বা দণ্ডের সাহায্যে ধান গড়ের মধ্যে টেনে আনা হয়।

৭) গাঁতা—চালের পরিমাণ।

৮) খোওয়া—ধানভানা বৃত্তির পারিশ্রমিক।

৯) ভাচাভানা—ধান থেকে চাল তৈরি করার বৃত্তি।

৭। মৎস্যশিকার বা মাছধরার বিভিন্ন যন্ত্রের নাম :

১) জাল—নাইলন বা মজবুত সুতোর তৈরি ফাঁদ।

২) ছিপ—বাঁশের দণ্ড, অগ্রভাগে সুতোয় কাঁটা লাগানো।

৩) ঘুনি—বাক্সের আকৃতিবিশিষ্ট ফাঁদ।

৪) আড়া—বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি ফাঁদ, ঝুড়ির মতো দেখতে।

৫) ছাকুনি—কাঠের ফ্রেমে আটকানো জাল, যা দিয়ে মাছ ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়।

৬) খালুই—মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি ছোট পাত্র।

৭) ঘুঘি—ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য বাঁশকঞ্চির তৈরি ফাঁদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রবাদ-প্রবচন

'প্রবাদ' বা 'প্রবচনের' অর্থ হ'ল প্রকৃষ্ট বচন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সংস্কারগুলির সংহত রূপই প্রবাদ-প্রবচন রূপে পরিচিত। এসব প্রকৃষ্ট বচনের মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে দার্শনিকতার স্পর্শ মেশানো জীবন-বোধের বাস্তব অভিজ্ঞতা। সাহিত্যের ইতিহাসে এসব 'লোকসাহিত্যে'র তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই বললেই চলে, কারণ তথাকথিত শিক্ষিত বা ভদ্র-মানুষ 'এদের' দেখতেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। অথচ লিখিত সাহিত্যের ন্যায় লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যেরও যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে—এই সত্য দীর্ঘদিন ছিল অবহেলিত। কিন্তু আজ, বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত অঙ্গনে বহু শিক্ষিত ও রসিকজনের পদচারণা ঘটেছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথই এই লোকসাহিত্যের অঙ্গনকে করেছেন সুষমামণ্ডিত। এ প্রসঙ্গে আরো তিনজন ব্যক্তির কথা এসে পড়ে যাঁরা বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রটিকে দীর্ঘ প্রসারিত করতে সাহায্য করেছেন, এঁরা হলেন দৃষ্টান্তবাক্য সংকলক উইলিয়াম মর্টন, প্রবাদ সংকলক রেভারেণ্ড জেমস লঙ এবং বাংলা প্রবাদ সংগ্রাহক সুশীল-কুমার দে।

অধুনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, সংগীত, ধাঁধা ইত্যাদি সকল বিভাগই যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করেছে, তথাপি লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে বিশেষভাবে 'প্রবাদ-প্রবচন' চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এর কারণ, প্রাত্যহিক জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য অত্যধিক। তাছাড়া প্রবাদের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতার সাযুজ্য। দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রবাদগুলিতে প্রতিফলিত হয়। মানুষ যেহেতু তার নিজস্ব পরিচিত অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ প্রবাদের মাধ্যমে লাভ করে, তাই প্রবাদকে সে সহজেই গ্রহণ করে।

বাংলা প্রবাদ দীর্ঘকাল ধরে সংগৃহীত হয়ে আসছে। এযাবৎ সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা বেশ কয়েক সহস্র হয়ে গেছে। সন্ধান করলে আরও অসংখ্য প্রবাদ সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু অঞ্চলভেদে প্রবাদ সংগ্রহের তেমন কোন জোরালো কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যায়নি। আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত মল্লভূমী প্রবাদ-প্রবচনগুলি আঞ্চলিক প্রবাদ সংগ্রহ ও সংকলনের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। চারশতেরও অধিক সংগৃহীত প্রবাদের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম, ব্যবহারিক ও লৌকিক জীবনধারার বহু অজ্ঞাত, আকর্ষণীয় ও প্রচলিত তথ্যাদি জানতে সাহায্য করবে বলে আশা রাখি। কিছু কিছু প্রবাদ নিজস্ব আঞ্চলিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বহিরাঞ্চলেও প্রচারলাভ করেছে। প্রবাদগুলি যে কোথায় কাদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে তা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ভাব ও প্রয়োগ পরিবেশ বিচারে 'আঞ্চলিক' আখ্যা দেওয়া হয়ত ভুল হবে না। সে হিসাবে গ্রন্থে উল্লিখিত প্রবাদগুলিকে মল্লভূমে প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবচন আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। বহু কথা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের 'শিষ্টবাক্য' রূপে ব্যবহৃত হতে হতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রবাদ হয়ত অন্য অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদের অনুসরণে এ অঞ্চলের মানুষও তৈরি করে ফেলেছেন—সেসব ক্ষেত্রে প্রবাদগুলিকে অনুকরণ কর্ম বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের এই মল্লভূম অঞ্চল—বাঁকুড়াকে কেন্দ্রে রেখে যার সীমানা হল—উত্তরে দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের খড়্গপুর. পূর্বে কোতুলপুর ও বর্ধমানের কিছু অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমির কিয়দংশ—তার ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় এসব প্রবাদ ও প্রবচনের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা অনস্বীকার্য।

বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমে প্রচলিত কিছু প্রবাদ ও প্রবচন

অ

১। অন্ন দেখে দিবি ঘি, পাত্তর দেখে দিবি ঝি।

২। অন্ন চিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই দিশাহারা।

৩। অ-বলা বলে বিস্তর, অ-ফলা ফলে বিস্তর। (অবাস্তব)

৪। অশৌচ মানে দাড়ি আর হাঁড়ি।

৫। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি চোরের মায়ের বড় স্ফুর্ত্তি।

৬। অপযশ্যা লোকের খরখস্যা নাম, বেশী খালে হবেক হাঁড়ী খাওয়া নাম।

৭। অকাজের বউড়ি, লাউ কাটতে দৌড়াদৌড়ি।

৮। অভাগি্যার (অভাগার) ঘোড়া মরে ভাগ্যিমানের বৌ মরে।

৯। অসওয়ারী ঘঁড়া (ঘোড়া) কিনে, সওয়ারী চড়ে,
মুখ্‌খুতে বই কিনে, চালাক লোকে পড়ে।

১০। অত অহংকার ভাল লয়—ধম্মে সইবেক নাই।

আ

১১। আমি একে পরের বান্দা, গরে নাই গরু বাঁধা।

১২। আক (ইক্ষু) গাছটি দুব নাই, গুড়পায়াটি দুব।
(সামান্য না দেওয়ায় বেশী ক্ষতিস্বীকার)

১৩। আগুন কুথা অদা (ভিজা), পুলিশ কুথা দাদা।

১৪। আড়াইয়া বউ-এর কড়ি, দিন পাঁচ ছয় লবর-চবর তার পরেতেই মরি।

১৫। আষ্টে পৃষ্ঠে দড়হ, পরে ঘঁড়ায় চড়হ। (সাবধানতা অবলম্বন করে কাজে অগ্রসর হওয়া)

১৬। আমার ঘরে খাচ্ছ দাচ্ছ, পরের ঘরে মকমকাচ্ছ।

১৭। আপুনি মজালে কুল, বাঁশীর কি দুষ। (নিজেই নিজের সর্বনাশ করা)

১৮। আঁটকুড়ির আঠার মায়া। (ভোগের অধিকার নাই তবু কৃপণতা)

১৯। আখ পড়লে দোবড়, ধান বাড়লে গোবর। (আখ যদি পড়ে যায় তাতে রস দ্বিগুণ হয়, কিন্তু ধানগাছ যদি বেড়ে যায় ধান হয় না)

২০। আপনার শিরে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি।

২১। আষাঢ়ের ধান চাষায় খায়। (প্রাচুর্য থাকলে মূল্য কমে যায়)

২২। আগে আপন সামাল কর, পরে যায়েঁ্য দাদাকে ধর।
(নিজে সামলে অন্যের তোষামোদ করা)

২৩। আগে ছিলম গদা ঘোষ, এখু হঁইছি গোদ্র ঘোষ,
অর্থ ই বাড়াইছ্যে মান, আমার কি দোষ।

২৪। আন সতীনকে লাড়ে-চাড়ে, বুন সতীনকে পুড়াই মারে।

২৫। আঁতেও সয় না, বাতেও সয় না। (রৌদ্র এবং বাতাস কিছুই সহ্য হয়না)

২৬। আশ ধান (আউশ ধান) পাকল দাদা বৌ আনে দে
ডুমুর পাকলে দাদা বৌ খেদাই দে। (সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তি)

২৭। আহ্লাদী যায় মরতে, তিনজনা যায় ধরতে।

২৮। আহ্লাদে ঢলঢল, অভিরামকে বিয়া কর।

২৯। আজকে মাসের পয়লা, দুয়ারে দাঁড়ায় গয়লা।

৩০। আজ ফকির কাল বাদশা—রাজনীতির চাল ফর্সা।

৩১। আগুন খাবি আংরা হাগবি। (যেমন কর্ম তেমন ফল)

৩২। আদরা (আদুরে) বিবি চাদর গায়, ভাত চায় না ভাতার চায়।

৩৩। আহ্লাদী হইছি বছর দুই, উঠতে বললে অমনি শুই।

৩৪। আষাঢ় যায় নামকে, শ্রাবণ যায় ধানকে—
ভাদর যায় বিচকে, আশ্বিন যায় কিসকে?

৩৫। আছে গরু না বয় হাল, তার দুখ্খু চিরকাল। (জিনিসের ব্যবহার না করলে দুঃখ বাড়ে)

৩৬। আমে ধান, তেঁতুলে বান।

৩৭। আদুর্‌র‍্যা বৌ ল্যাংটা নাচে। (অন্ধসোহাগ উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে)

৩৮। আপুনি বাঁচলে বাপের নাম। (আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ পন্থা)

৩৯। আমঝোল—(দুরবস্থা)

ই

৪০। ইদিক উদিক দু'দিক গেল, ভাসুরে সব শুনতে পেল।

৪১। ইটা উয়ার ঘঁড়া রোগ, পাড়ার লোকের বৃথাই শোক।

৪২। ইদিকে লয় উদিকে, লাফ দিচ্ছে কুলিতে।

৪৩। ই-কুল উ-কুল দুকুল যাবেক। (দোটানায় পড়লে কাজ নষ্ট হয়)

উ

৪৪। উপরে চিকণ চাকন, ভিতরে খড়ের বোঝা হিন্দুদের দুগ্‌গা পূজা।

৪৫। উদমা মরদের ঘর করা, গলায় কলসী ডুবে মরা।

৪৬। উঁচ-কপালী ভাগ্যিমানি।

৪৭। উদোরি বড় লো রাধা, বরকে বলে যে দাদা।

৪৮। উঠ্ ছুড়ি তুর বিয়া, কাস্তে বাঁধা দিয়া।

৪৯। উই লেগেছে কুঁড়িতে, ঢাক বাজছে ঝুড়িতে।

৫০। উঠল বাই (বাতিক) ত কটক যাই। (বাতিকগ্রস্ত লোকের অস্থিরতা)

৫১। উল্টা কুলায় পাঁশ পাছুড়া। (অকর্মণ্য লোকদের নিয়ে কাজ করা)

৫২। উড়ে এলো বাঁশের পাতা, আপনি কয় গরবের কথা। (অন্তঃসারশূন্য অথচ আড়ম্বরপূর্ণ)

এ

৫৩। একে মা মনসা তাই আবার ধুনার গন্ধ।

৫৪। এমন জায়গায় বসবি যেন কেউ বলে না সর।
এমন কুথা বলবি যেন কেউ বলে না মর।

৫৫। এ্যাং লাফ দিই, ব্যাং লাফ দিই, খলসে বলে আমি এক লাফ দিই।

৫৬। একে মাগীর গোরা গা, তাই হঁইছ্যে বেটার মা।

৫৭। এগু আত্মাধম্ম, পরে নিত্যিকম্ম।

৫৮। এগুলেও বান্‌চোত, পেছুলেও বান্‌চোত।

৫৯। এয়েচি ল্যাংটো, যাও ল্যাংটো, তবে ক্যানে মিছা গণ্ডগোল।

৬০। এ্যামন আমার নাগর বাঁধতে লারে ঘর।

৬১। একটি আমার সাধের বিটি চুল নাইত দড়ির ঝুঁটি।

৬২। এক গুয়ালের গরু, তাগড় আর সরু।

৬৩। এক ঠুক্ দিস্‌না শিং বেরুবে।

৬৪। এক কড়া নাই ঝুলিতে, লাফ দিছে কুলিতে।

৬৫। এঁড়া গরু, নেড়া মুছলমান, ঘরজামাই আর পোষ্যপুত্তুর
—এরা চারজনা জানিবে শত্তুর।

৬৬। এঁঠেল চিমড়া। (এঁঠেল জোঁকের মতো একধরণের কীট। ধরলে আর ছাড়ে না)

৬৭। এদিগ লয় উদিগ বড় বাপ আমার সত্যপীর।

৬৮। এক পুতের কিবা আশ নদীর ধারে বাস। (একটিমাত্র সন্তান থাকলে সবসময় হারাবার ভয়)

৬৯। এক কোলকায় যেমন তেমন, দু কোলকায় তাজা,
তিন কোলকায় উজীর-নাজির, চার কোলকায় রাজা।

৭০। এক পিণ্ডিতে দেনা শোধ। (অকৃতজ্ঞতার পরিচয়)

৭১। এক ছিদামের মুরাদ নাই, তার আবার লহর কত? (অর্থ-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বে অহংকার দেখানো)

৭২। এক চড়েই সর্ষে ফুল দেখান।

ক

৭৩। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজি।

৭৪। কুথাও কিছু নাই নগরে, বাজনা বাজে কুল ডাঙরে।

৭৫। কত সাধ হয় লো চিতে (চিত্তে) মলের আগে চুট্‌কি দিতে।

৭৬। কপালে থাকলে গু কাগে এনে দেয়।

৭৭। কুকুর করে কাঁই বাউরির বিয়া নাই।

৭৮। কপালে না থাকলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

৭৯। কুকুরে খাইলে হাঁড়ি, দাহুর গজায় চাপদাড়ি। (ঠকে শেখা)

৮০। কর্ম যে করে সে কি ক্ষিদায় মরে?

৮১। ক্যা কুথাকার ক্যা গটা দুই আমড়া ভাতে গ্যা।

৮২। কানা বলদ, ভাঙ্গা হাল, তার দুখ্‌খু চিরকাল।

৮৩। কি আমার রান্না, তাই পাঁচফোড়ন।

৮৪। কিপ্পনের (কৃপণের) ধন দ্বিগুণ হয়।

৮৫। কুথা থেকে এলেন রাই—কথার কত হাঁই-ফাঁই। (অত্যধিক ফড়ফড় করা, over smart)

৮৬। কাজে লয় মুয়ে বাত, ই-বছর যেমন তেমন আসছে বছর হা-ভাত।

৮৭। কি আমার গাঁ, তাই মাঝের কুলি? (অখ্যাত ব্যক্তির আবার বৈশিষ্ট্য খোঁজা)

৮৮। কানা গরুর ভিন্ন গোঁজ।

৮৯। কখন নাই ষষ্ঠীপূজা, একবারেতে দশভুজা।

৯০। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুঁষে।

৯১। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি।

৯১ক। কটার মন চটা, কালোর মন ভালো।

৯১খ। করেলে দু'দিন বই ত লয়।

৯২। কম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, পাতা পাড়ে মেঝে জুড়ে।

৯৩। কুঁড়াই পাওয়া ট্যাকা, চৌদ্দআনা সিকা। (হঠাৎ পাওয়া জিনিসের সুদ বেশী হয়)

৯৪। কুলে দিলি কালি, হায়েন্নে বাপের শালি।

৯৫। কুঁড়া খায়েঁ্য মরল বাপ তার বেটার কত বিত্তাপ।

৯৬। কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

৯৭। কি সাপে দংশিল মাকে, ওঝার মন্তর খাটে না?

৯৮। কার খাব, কার মন যোগাব, কারে করব তুষি,
মাঝখানেতে গঁড়াল মারছে যার যতক্ষণ খুশি।

৯৯। কাল বামুন, কটা শুদ্দুর—যমেরও হয় শত্তুর।

১০০। করবি মজবুত বাড়ি, বিদ্যাধরী যোগেশের টালি।

১০১। কিষ্ট, বিষ্টুর দেশসেবা ঠুঁঠো হাতে জনসেবা।

১০২। কানার ঠার কানা-ই বুঝে। (সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি)

১০৩। কাজ কি আমার পরের কথাতে
কাটুক, ফাটুক যা খুশি হোক দেখব দাঁড়াই তফাতে।

১০৪। কুকর্মের ফল সময় বুঝে ফলে।

খ

১০৫। খাবার দেখলে ঝরে নাল (লালা) অমন নোলায় আগুন জ্বাল।

১০৬। খাবেক নাই চাটবেক।

১০৭। খেঁড় খেকো। (অপদার্থ)

১০৮। খাই যার, সই (সহ্য করা) তার।

১০৯। খাড়া-বড়ি-থোড়, থোড়-বড়ি-খাড়া। (একই নিয়ম)

১১০। খুঁটির জোরে এ্যাত দেমাক।

১১১। খাচ্ছে দাচ্ছে ধুমধুমাচ্ছে।

গ

১১২। গরুর পীরিত চাঁটে্য, মানুষের পীরিত গাঁটে (টাকার)।

১১৩। গাঁ ছোট্ট তাই উপর পাড়া।

১১৪। গরবে ঢলঢল, অভিরামকে বিহা কর।

১১৫। গরবিনী রাই, বসে আছেন ঠাই।

১১৬। গামলা ভাসিয়ে আসা, খলা ভাসিয়ে বাসা।

১১৭। গতর যতদিন, আদর ততদিন।

১১৮। গরুর হাল বিকে (বিক্রী করে) মাগের হার—এই ত কলিকাল।

১১৯। গিন্নি ভাঙ্গলে ভাঙ্গা খলা, বৌ ভাঙ্গলে লতুন কিনা।

১২০। গান, বাজনা, মতিচুর—তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

১২১। গাছকে কি ফল ভারি লাগে।

১২২। গুড় খাল্যে যিমন জলকে টান, বুনের তেমনি ভেই-কে টান।

১২৩। গায়ে নাই ছাল-চামড়া মদ গিলে গামলা গামলা।

১২৪। গোলেমালে যদিন চলে।

১২৫। গায়ে নেই চাম, রাধাকিষ্টের নাম। (নিজের ক্ষমতার বাইরে কোন কাজে হাত দেওয়া)

ঘ

১২৬। ঘর জামাই-এর গলায় দড়ি, বৌ হ'ল তার প্রাণেশ্বরী।

১২৭। ঘোলে ঢাকা দিচ্ছ সরা, ঘি রইল ঢাক্‌না ছাড়া।

১২৮। ঘরে নাই ভদরভাং—বেটার নাম দুর্গারাম। (বাইরে চাকচিক্য কিন্তু ভিতরে অন্তঃসারশূন্য)

১২৯। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নাই।

১৩০। ঘর-জামাই-এর গলায় দড়ি—সব পেয়েও চায় হাতঘড়ি।

১৩১। ঘরে আছে শুয়োর পাল—বাইরে বাবু ব্রজগোপাল।

১৩২। ঘরে ভাত নাইক তাই হিংচের তরকারী (অভাবের উপর অভাব)।

১৩৩। ঘরের কথা পরকে কয়, দুখ্‌ যায় না কলং (কলঙ্ক) রয়।

১৩৪। ঘরে নাই দানাপানি, বাইরে দেখ ফট্‌ফটানি।

১৩৫। ঘাস কাটা কঠিন কাম, ঠসকি ঠসকি পড়ে ঘাম।

১৩৫ক। ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ।

চ

১৩৬। চাষে আছে রস, যদি খাটে জনদশ।

১৩৭। চল্‌লেই চলে বুদ্ধি, না চল্‌লে হতবুদ্ধি।

১৩৮। চল্‌লেই চলা, বল্‌লেই বলা।

১৩৯। চিঁড়া বল, মুড়ি বল, ভাতের সমান নয়,
মাসী বল, পিসী বল, মায়ের সমান নয়।

১৪০। চোখ কান মুজে—পরের ছেঁদা খুঁজে।

১৪১। চট লগন পট বিয়া (অকস্মাৎ কার্যসিদ্ধি)।

১৪২। চুয়া-চন্দন, গুয়াপান—তবে যাব ঠাকুরথান।

১৪৩। চৌকাঠে বসলে খোস হয় পেছুনে।

১৪৪। চিড়ার বাইশ ফের (কাজের জটিলতা)।

১৪৫। চিল যখন বসে ভিটায়—কুটি না লিয়ে যায় না।

১৪৬। চাষে রূপ নাশে, কিন্তুক ঘর হাসে।

১৪৭। চল্‌ বলতেই কাঁধে ঝুলি (যে সবসময়েই প্রস্তুত)।

১৪৮। চোরা গরুকে বাউরি বাগাল (শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ)।

ছ

১৪৯। ছুঁং-গোবুরে ঘর—হলুদ-ত্যালে বর।

১৫০। ছাঁচার জল মড়কচায় যায় (তিলকে তাল করা)।

১৫১। ছেলার চায়েঁ্য ছেলার গু ভারি।

১৫২। ছাতুরে নাতুরে ভিজাওরে খাওরে, এ্যাত জ্বালা কে কয়ে
ডালভাত স্থপ্ সাপ (অযথা জটিলতা না বাড়িয়ে সহজভাবে কাজ করা)।

১৫৩। ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল কাটতে কাটতে নির্মূল (অবস্থার ফেরে ভাগ্যের বিড়ম্বনা)।

১৫৪। ছেলা লয় পিলা।

জ

১৫৫। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

১৫৬। জন, জামাই, ভাগ্না—তিন লয় আপ্‌না।

১৫৭। জীয়ন্তে পুষলি না ভাত কাপড়ে মরলে দিবি বেনা মুড়ে।

১৫৮। জোর, জুলুম, লুটপাট—উঠে যেন নাভিশ্বাস।

১৫৯। জাতের নামে জীবন দান—উয়ার হাতে কল্‌কে টান।

১৬০। জমিদারের খেয়াল ভাঙতে লারে দেওয়াল।

১৬১। জলের চিকন বা (বাতাস), ছেলার চিকন গা।

১৬২। জামাই-এর লেগে মেরে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খেলে মাস।

১৬৩। জলে জনম, জলে মরণ, তার আবার এত গরম।

১৬৪। জনম গেল ঘুঁটের জ্বালে কি করব বর্ষাকালে।

১৬৫। জী (জীবন) যায় নাই ধড়ফড়ানি সার (নিষ্ফল ব্যাকুলতা)।

ঝ

১৬৬। ঝুট বলো ত থোড়া কহ।

১৬৭। ঝক্‌মারী (জ্বালাতন)।

১৬৮। ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি।

ট

১৬৯। টাক, টিকি, দাড়ি—বদ্‌মায়েসের ধাড়ি।

১৭০। টুক্‌হু টুক্‌হু আনেকটু (বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু)।

১৭১। টেনা লিয়ে টানাটানি।
(অভাবের তাড়নায় অল্প জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি)

ঠ

১৭২। ঠাকুর দেখলেই গড় করি, ভয়ে ভক্তি মরি মরি।

১৭৩। ঠেঙ্গাই মারলে অমরও মরে।

১৭৪। ঠারে ঠুরে উনিশ-বিশ (ইসারা-ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া)।

ড

১৭৫। ডাক্তরের টাকা হলে জানবি রেতের ডাক্তরি।

১৭৬। ডাগর বগ্ দেখেছিস—আমানি খায়েঁ প্যাট ফুলাইছিস।

১৭৭। ডোম গ্যায় নাই কুলাটা—আটকে গেইছে বিয়াটা।

১৭৮। ডানের লজর পুঁই বাদাড়ে।

১৭৯। ডিগরের মরণ ডালে-খালে।

ঢ

১৮০। ঢের ঢের দেখেছি ছোঁড়া এ্যামন দেখি নাই গালতবড়া।

১৮১। ঢ্যামনা সাপের বিষ নাই।

১৮২। ঢঁড় গিলা (খুব বেশী খেয়ে নেওয়া)।

ত

১৮৩। ত্যালের নুচি, পালেই বাঁচি।

১৮৪। তিন হাত মাটির লেগে এ্যাত কাটাকাটি।

১৮৫। তুমায় বড় ভালবাসি, ভাত না খ্যালে ছ মাস পুষি।

১৮৬। তেঁতুলে না সিমে, পচা মাছে গিমে।

১৮৭। তিন তিনবার বৌ মলে, কলাগাছকে বিয়া করে।

১৮৮। তিন হাঁছি সত্যেঞ্চ (তিন হাঁচি সত্য)।

১৮৯। তিনের নাই তের, আমার লাগল গের।
(বার তিথি শুভ হওয়া সত্ত্বেও বিপদ)

১৯০। তুরুক (তুর্কী), তোতা, খরগোশ—তিন মানে না পোষ।

১৯১। তল-বাগ্‌ড়া ছাড়ে, উপর-বাগ্‌ডা হাসে।

১৯২। ত্যালের ভাঁড়ে ত্যাল নাইক দশন মারে ঘা
ফুলী কথা শুনবি যদি বাঁকুড়াতে যা।

১৯৩। তেলি, তামলি, খয়রা ময়রা—ফাবড়াই দিল খলা-খাপ্‌রা।

১৯৪। তুই ঠেলি না মুই ঠেলি (দীর্ঘসূত্রীর স্বভাব)।

থ

১৯৫। থাকরে কুকুর মাড়ের আশে, মাড় হুব তোকে আঘান-পৌষ মাসে।
১৯৬। থল নাই ত ডুবা ক্যানে ?

দ

১৯৭। দেখে শুনে করগো হুঁশ্—পয়সা থাকলেই বশ মানুষ।
১৯৮। দুধ, গুড় নাই শুক্না চিঁড়া, প্যাট পুরে খা আমার কিরা।
১৯৯। দু' দুয়ারে কুমড়া—সতীনের মুয়ে জুমড়া।
২০০। দুখের দিনে সুখের কথা—দেখ রে ছেলার বাক্‌পটুতা।
২০১। দিন থাকতে জুতে দে (সময়ের কাজ সময় থাকতে করা)।
২০২। দিন গেল আলে খালে রেতের বেলায় বাতি জ্বালে।
২০৩। দেখতে তো প্যাঁচা-খাঁদি, তারই রূপে ফাটছে চাঁদি।
২০৪। দিন গেল কাজের ঠেলায়, রাত কাটল সতীনের জ্বালায়।
২০৫। দিতে থুতে নাই শক্তি, পেসাদ খেতে বড় ভক্তি।
২০৬। দিলে থুলেই মাসী পিসী—না দিলেই সব্বনাশী।
২০৭। দিবি তো দে ছপ্পর খুলে দে।
২০৮। দাড়িতে-টিকিতে লাগল দ্বন্দ্ব—দু-ই বদমাইস নাইক সন্দ।
২০৯। দোকানির নাই পরব, নাড়ের নাই গরব।
২১০। দুধটি মেরে ক্ষিরটি হঁইছ্যে।
২১১। দুগুণ খাবেক ত দশগুণ বকবেক (কাজের চেয়ে কথা বেশী)।

ধ

২১২। ধর ধুমসী ধুমসার হাত, ধুমসা দিবেক চিরকালের ভাত।
২১৩। ধনন্তীর ধনে আঁটে না, পুতন্তীর পুতে আঁটে না।
(যার যত আছে সে তত চায়)
২১৪। ধন আছে কুথা, গতর খাটাবি যুথা।
২১৫। ধূমকেতু ভরান গেরাম জ্যাবতা।

ন

২১৬। নদী, নারী, শিংধারী—তিনে বিশ্বেস কভু না করি।
২১৭। নারীর হাসি সর্বনাশী।
২১৮। ননদ লিয়ে থাকতে লারি—ভাতারকেও ছাড়তে লারি। (উভয়সংকট)

২১৯। নদীতে এলো বান—শালাকে ধরে আন।

২২০। নাই লাজ, নাই ভয়—বিটি লিয়ে কুথা কয়?

২২১। নাইক মোটেই গাই গরু—সুখে নিদ্রা যান হরু। (সম্পত্তি না থাকলে সম্পত্তি হারাবার ভয় থাকে না)

২২২। না খায়েঁ্য করি ঘর, তবু মিনসা বাসে পর।

২২৩। নিজের কাজে বাড়ে চাঁড়, (আগ্রহ) পরের কাজে মুখ ভার।

২২৪। নিধন্যার (নির্ধনের) ধন হল্যে দিনে দেখে তারা,
নিভাতারির ভাতার হল্যে বাসে বাপের পারা।

২২৫। নিজের বিলায় থালা থালা পরের বিলায় চোপ্‌রে শালা।

২২৬। নিজের বিত্তি (বৃত্ত) পরকে দিয়েঁ্য গগক মাগে ভিখ্‌। (ভালমানুষী দেখাতে গিয়ে বিপদ)

২২৭। নরমকে ধরমও মারে।

২২৮। নামেই তালপখুর ঘটিটিও ডুবে না।

প

২২৯। পরের লিয়ে বরের বাপ, কাড়্যে লিলে মনস্তাপ।

২৩০। পিঠ করেছি শিলে যত কিলাবি কিলে।

২৩১। প্যাটে নাই শস্যদানা তার আবার কত বায়না।

২৩২। পঁদে নাই রিঙ্গি ভজরে গোবিন্দি।

২৩৩। পুড়ে যদি মরবি বুড়া বর করবি। (সতীদাহের প্রতি ইঙ্গিত)

২৩৪। পরের লিয়ে পোদ্দারগিরি।

২৩৫। পরের লিয়ে ফোপরদালালি।

২৩৬। পড়ার নাম অষ্টরম্ভা—বই বগলে জগদম্বা।

২৩৭। পাত পড়লেই বন, ঢেঁকি পাড়লেই ধন।

২৩৮। প্যাটে ক্ষিদে মুয়ে লাজ।

২৩৯। পরণের নেংটি নাই দারোগা হতে শখ।

২৪ । পুঁগায় পুঁগায় রস। (রসিক ব্যক্তি)

২৪১। পড়লে খুড়া যাঁতকলে—মর ইবার শ্যায কালে।

২৪২। পারি না পারি মুয়ে ক্যানে হারি।

২৪৩। পরব-পাব্বনে খাওন, ঈদে-চাঁদে যাওন।

২৪৪। প্যাটে নাই ভাত—দুয়ারে বাজায় ঢাক।

ফ

২৪৫। ফ্যাল কড়ি মাখ ত্যাল তুমি কি আমার পর।
২৪৬। ফঁটা (তিলক) কাটলেই বোষ্টম হয় না।
২৪৭। ফাগুনের বৌ আগুন, মাঘের বৌ বাঘ
শীতের বৌ জড়সড়, বর্ষাতে রাগ।
২৪৮। ফাটা হাঁড়ি শব্দতে মালুম।
২৪৯। ফাটে না ফুটে তাতে ধবার কি? (পরের জিনিসের প্রতি যত্নহীন)
২৫০। ফুল্‌লো আর মল্‌লো।
২৫১। ফকীরের জলপড়া লাগে লাগুক নাই ত নাই।

ব

২৫২। বর-কন্যায় রাজী—কী করবেন কাজী।
২৫৩। বউ নাই ছেলা কাঁদে, ঘর নাই আগুড় বাঁধে।
২৫৪। বুড়া মা ম'ল আপদ বিদেয় হল, বৌ যদি ম'ল সর্বস্বান্ত হল।
২৫৫। বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো—তাই আবার অকাল বিয়ানো।
২৫৬। বিয়া লয় ত বিড়ম্বনা—আইবুড়া নাম খণ্ডানা।
২৫৭। বাঁশ ফাটে ফাঁপে, মানুষ মরে হাঁপে। (বাঁশ খুব ফেঁপে গেলে ফেটে যায়। মানুষ হিংসায় মরে যায়)।
২৫৮। বিপদে পড়লে হরি, হরি—তা ভিন্ন নাম কি করি!
২৫৯। বাদে (হিংসায়) সব করতে পারে, বাদে পুত বিয়াতে লারে।
২৬০। বিলাত থেকে এলেন বিবি খুডশাস জানে না।
২৬১। বগলবাগে গল না ফোঁড়া হবেক বগলে।
২৬২। বাইরে আচার ঘরে নচ্ছার।
২৬৩। বিনা লাঙে (লাঙলে) কি লুহা ক্ষয়?
২৬৪। বাপের কালে নাইকো চায, ধানকে বলে দুর্বাঘাস।
২৬৫। বসে খাল্যে ক'দিন যায়—নদীর বালি তাও ফুরাই।
২৬৬। বন্দক দিও না বিকে খেও, অল্প কর্জে নিজে যেও।
২৬৭। বাঙালীর দুগ্‌গা পূজা, উপরটায় চিকন-চাকন ভিতরটায় পুয়াল গুঁজা।
২৬৮। বুদ্ধির ঢেঁকি কালিদাস—তা না হলে সর্বনাশ।
২৬৯। বুড়াল না বাওলাল (বৃদ্ধবয়সে মতিভ্রংশ হওয়া)

২৭০। বাঁচবি যদি ওরে হরা, কাঁখ-কোল বাগে সরে দাঁড়া। (আত্মরক্ষার জন্য সাবধানতা)

২৭১। বাজাতে বাজাতে বায়েন, গাইতে গাইতে গায়েন।

২৭২। বনের ফুল বনেই শুকাল। (গুণের কেউ মর্যাদা দিল না)

২৭৩। বেঁটের বুদ্ধি গাঁটে গাঁটে।

২৭৪। বেগুন গাছে আঁকশি। (ক্ষুদ্র কাজে আড়ম্বর)

২৭৫। বাপের বাইশ মণ কাঁথা, বেটার নাগপুরিয়া ছাতা।
(অভাবের তাড়নায় বাপের কাঁথায় ময়লা জমতে জমতে ২২ মণ হয়েছে, এদিকে পুত্রের বাবুয়ানির অন্ত নাই।)

২৭৬। বলতে লারি লাজে, আমার প্যাটটা বড় বাজে।

২৭৭। ব্যাটা ছেলার মুতে কড়ি।

২৭৮। বাপের হোটেলে খায়—জিনিসের দর কে শুদায় ?

২৭৯। বতর পাল্যেই ব্যাংও গঁড়াল তুলে। (সুবিধা পেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বলীয়ান হয়।)

২৮০। বিয়ার সময় কনে বলে হাগব। (গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় অসুবিধার সৃষ্টি।)

২৮১। বাঁদর বুড়ালেও মুরুব্বি হয় না।

২৮২। বুড়ালেও গয়লা সেয়ানা হয় না।

ভ

২৮৩। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো যৎখন থাকে তৎখন ভালো।

২৮৪। ভোগরাগের যুত, নাই শাঁখের চড়চড়ি।

২৮৫। ভর্তিগাজনে ঢাক ছেঁড়া বুড়া বয়সে বৌ মরা।

২৮৬। ভাতারের ধন থাকলে বৌ-এর নাম লক্ষ্মী।

২৮৭। ভাত দেয় কি ভাতারে, ভাত দেয় আমার গতরে।

২৮৮। ভাত জুটে নাই ঘরে তাই বিয়ার যোগাড় করে।

২৮৯। ভাই নাই, ভায়াদ নাই মুখে তবু দড়
ছেলা নাই পুলা নাই মধ্যিখানে শুয়ো।

২৯০। ভাবছ ক্যানে থাঁদি-পেঁচি—গায়ে বসেছ্যে পেরজাপতি। (প্রজাপতি)

২৯১। ভাসুরকে ভাত দিতে বৌ ঝুমুক দেখালি।

২৯২। ভাগাড়ে গরু পড়ল, মুচির ঘরে হাঁড়ি নড়ল।

২৯৩। ভূমিজ জাত, আঁধার রাত।

২৯৪। ভূমিজের হাড় শ্মশানেও ফঁফায়।

২৯৫। ভাগাড় থেকো।

২৯৬। ভিটায় ঘুঘু চরাব।

২৯৭। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

ম

২৯৮। মলাট-ই ললাট।

২৯৯। মূলা শাক সিজাব কত, কালা শাশুড়িকে বুঝাব কত।

৩০০। মুয়ে মিষ্টি খাতায় দেনা, ব্যবসাদারের নিশানা।

৩০১। মাছ খাবি মাগুর, নাং (প্রেমিক, lover) করবি ঠাকুর।

৩০২। মনের সুখে গড়ি, হাতের সুখে ভাঙ্গি।

৩০৩। মাপতে জানুন নাই, তাই পাইটা ডাগর।

৩০৪। মাথায় দু'টা মরাই, পায়েতে ধন গড়ায়।

৩০৫। মা খায় ভাজা ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে।

৩০৬। মারকে মার চৌদ্দসিকে গুণাকার।

৩০৭। মন্ত্রী চায়েঁ্য চামচা ভারি, কথা যে তার সইতে লারি।

৩০৮। মদনবাবু শিবের ষাঁড়, অফিস করেন তোলপাড়। (অকর্মণ্য ব্যক্তি)

৩০৯। মাগা ভাত, বাসি না পান্তা ?

৩১০। মাতাল, কাঁড়া (মহিষ), খেপা কুকুর—তিন থাকতে বহুদূর।

৩১১। মানুষ মরে শীতে আর পিতে (পিত্তরোগ)।

৩১২। মল্লের রা—শুনেই যা।

৩১৩। মারতে যাচ্ছু শরবনে, তবু ভালচ্ছু ঘর পানে। (মায়ার বন্ধন কাটানো কষ্টকর।)

৩১৪। মনে মনে গুঁড়ি কুটি, পিঠা হল্যে খাব দুটি।

৩১৫। মা রেঁধেছে খাড়া, যেন দড়ি-পারা
বৌ রেঁধেছে খাড়া, যেন তুলোর পারা।

৩১৬। মায়ের গলায় দড়ি দিয়ে বৌ-কে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

৩১৭। মনে ভাবলম খাব দই, বিধাতা লিখলেন শুকনা খই।

৩১৮। মূলে মাগ নাই (স্ত্রী নাই) তাই ফুলশয্যা।

৩১৯। মুরাদে নাই সিমে পচা মাছে গিমে।

৩২০। মারব বলে কি মারি, হালের ঠেঙ্গা ফেলে দিয়ে শোলার ঠেঙ্গার মারি।

৩২১। মাথার উপর ছাতা। (অভিভাবক)

৩২২। মুত ত লয় যেন বান গড়াচ্ছে।

৩২৩। মেঘে মেঘে বিলা যায় সিয়ান বৌ সাতবার খায়।

৩২৪। মাথায় টানতে গা উদম্।

৩২৫। মদ, মাস্, কুকড়া—তিন লিয়ে বাঁকুড়া।

৩২৬। মায়েতে মেরেছে, ঘরেতেও ভাত নাই। (বিপদের উপর বিপদ)

৩২৭। মনে ভাবি রাজা হব, ভাগ্য বলে সঙ্গে যাব।

য

৩২৮। যাকে আমি কাছে পাই সে লয় আমার সোদর ভাই।

৩২৯। যার সঙ্গে যার ভাব তার ব্যাঁত দেখলেই আনেক লাভ।

৩৩০। যার খাই যার পরি তার হয়েই ঝগড়া করি।

৩৩১। যে এলো চষে (চাষ করে) সে রইল বসে
লাড়াকাটাকে (সাধারণ মজুর) ভাত দে খেসেথুস্তে।

৩৩২। যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্মা।

৩৩৩। যার জিনিস তার রয়, ভালাভালি চোখের ক্ষয়।

৩৩৪। যেমন কন্যা রসবতী, তেমন পাত্র মাধব তাঁতী।

৩৩৫। যদি দেখিস চালের টুই (চাউলের ভাঙা টুকরো, ক্ষুদ) তবু রাখবি মুষ্টিটুই।

৩৩৬। যদি চলে মনিহারি, কি করবেক জমিদারী।

৩৩৭। যার কাপড় তার জাড়, লি-কাপড়্যার (বস্ত্রহীনের) পাথর আড়।

৩৩৮। যদ্দিন গতর, তদ্দিন মান, গতর পড়লেই বেইমান।

৩৩৯। যে জল বয় (বহন করে) সে তিষ্টায় রয়। (যার জিনিস সে ভোগ করতে পারে না।)

৩৪০। যে যত পায় সে তত লালায়।

৩৪১। যদি হও কমজোরি মুয়ে করবে ফোঁস।

৩৪২। যার যখন কপাল খুলে ছাই মুঠাতেও সনা ফলে।

৩৪৩। যদি হয় সু-জন তেঁতুল পাতে ন জন
যদি হয় কু-জন ন ঘরেতে ন জন।

৩৪৪। যা শিখেছি বাল্যকালে সব ভুলেছি ভাতা-কলে (স্বামীর ঘরে)।

৩৪৫। যা আছে কপালে ছেঁড়া কাঁথা বগলে।

৩৪৬। যার বিহা তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।

৩৪৭। যখন যার কপাল ফিরে তখন তার মুতেও বাতি জ্বলে।

৩৪৮। যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি।

৩৪৯। যে ঘি খায়, তার আঁচড়েই বুঝা যায়।

৩৫০। যার গয়না তাখেই সাজে, অন্য লোকে ঠরকা বাজে।

৩৫১। যদি পরবি শাঁখা তবে মু'টা ক্যানে বাঁকা। (ভাল ফল পেতে গেলে কষ্ট করতে হয়)

৩৫২। যেমন পঁকা বেগুন, তেমনি ভনভনিয়া খদ্দের। (যে যেমন স্বভাবের তার তেমন পছন্দ।)

৩৫৩। যতবড় খাট লয় ততবড় বিছানা।

৩৫৪। যার বেটার বিয়া, তার বাপ পায় না গুয়া (সুপারি, নিমন্ত্রণ)।

৩৫৫। যার আছে মাটি তাকেই দিবে বিটি।

৩৫৬। যে বলে বিস্তর কথা সে বলে বিস্তর মিছা।

৩৫৭। যা সয় তা রয়, তা না হলে উপোস দিতে হয়।

৩৫৮। যা সয় তাই রয়, তা না হলে বিনাশ হয়।

৩৫৯। যতই কর হাঁই-ফাঁই, বাঁজার প্যাটে ছেলা নাই। (যতই আশা কর যা হবার তা হবেই।)

৩৬০। যেখানে দেখিবে 'গোল' সেখানেই গণ্ডগোল।

৩৬১। যে করে পাপ সে সাত বিটির বাপ।

৩৬২। যে খায় আমার আঁতে যা তার সঙ্গে কিসের রা।

৩৬৩। যা ছিল বাসি পান্ত—বাপ-বেটায় হল শান্ত।

৩৬৪। যে মরবেক আপন দোষে কি করবেক তাখে হরিহর দাসে।

৩৬৫। যে গরু দুধ খায় তাকেই ধরে টান।

র

৩৬৬। রাজার মাকে বলে ডান, আঁটকুড়ার মল কান।

৩৬৭। রক্ত দিল স্বাধীনতা—তার আজকে এই হেনস্তা।

৩৬৮। রাঢ়ের বুদ্ধি ঘাড়ে, এক কিল দিলেই ছাড়ে। (মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি)

৩৬৯। রাঁঢ়ের (বিধবার) ধান আর জোড়ের বান—দুই সমান।

৩৭০। রয়ে সয়ে খা, লুকাই-চুপাই জমা। (মিতব্যয়িতা)

৩৭১। রূপ-যৌবন আড়াই দিন চামের চোখে মানুষ চিন।

৩৭২। রা-এর উপর রা পড়ল ঘরে ছ্যাখ কুটুম এলো।

৩৭৩। রুগীও জানে, ডাক্তারও জানে, কুকুর রোগ (জলাতঙ্ক) মরণ আনে।

৩৭৪। রাতচরা পাখ তার আবার বিত্তাপ।

৩৭৫। রাক্ষুসে মায়ের মরণও বিটকাল।

৩৭৬। রাম বাঁড়ুজ্যা ঘোর কলি—মানেন না পুজার বলি।

৩৭৭। রূপ যৌবন জোয়ারের জল—যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বল।

৩৭৮। রামে মারলেও মেরেছে, রাবণে মারলেও মেরেছে।

ল

৩৭৯। লাগে তুক্ না লাগে তাক।

৩৮০। লাজে বৌ ভাজে আলু, তার দেখা যায় ব্রহ্মতালু।

৩৮১। লুটে লাও যৌবনভরে—পরে কাঁদবে অঝোর ঝরে।

৩৮২। লটে খেটে আড়াইয়া সন্না (সজিনা) বারোমাস।

৩৮৩। লাপিত গেল ঘর ত খুরটা খুলে ধর।

৩৮৪। লিখতে লিখতে সরে, হাগতে হাগতে মরে।

৩৮৫। লাজ নাই মুইসার কোন কালে, মচ রেখেছে তবড়া গালে।

৩৮৬। লোক বিশেষে কইবি কথা ঠাকুর বিশেষে নোয়াবি মাথা।

৩৮৭। লাড়ে আর জাড়ে দশ জনাকে মারে।

৩৮৮। লিধন্যার ধন হলে দিনে ছ্যাখে তারা, লিভাতারির ভাতার হলে বাপে বাপের পারা।

৩৮৯। লিবার বেলায় হাত লাল, দিবার চোখ লাল।

৩৯০। লিব্বংশ লবার হল্যে এণ্ড মরে লাতি।

৩৯১। লাখ টাকা, লাখ টাকা মোটে ত দু'কুড়ি দশ টাকা। (নিরক্ষর ব্যক্তিদের অঙ্কের হিসাব)

শ

৩৯২। শোধ করতে বাপের ঋণ—গটা দুই ছাগল কিন।

৩৯৩। শিখলি কুথায়, না ঠকলম্ যুথায়।

৩৯৪। শুয়ারের পিছনে মূলা গুঁজলে কি শুয়ার হাতি হয়?

৩৯৫। শিবের মাথাতে ঢাল দুধ—তবু ব্যাটা লিবেক সুদ।

৩৯৬। শাশুড়ি ভাঙলে ভাঙা থলা—বৌ ভাঙলে নতুন থালা।

৩৯৭। শয়নে কিবা সুখ পতি নাই পাশে, মরণে কিবা সুখ বেটা নাই বংশে।

ষ

৩৯৮। ষাঁড়ে ধান খায় তাঁতী বাঁধা যায়। (একের দোষে অপরের সাজা)

স

৩৯৯। সাত ত্যাবতার দুয়ার ধরে তবে এই ব্যাটা।

৪০০। সনার আংটি সজা আর বেঁকা।

৪০১। সনার অঙ্গে পড়লে সনা—তবেই হয় অতুলনা।

৪০২। সাহস দিলে বুকে—ফুল, চন্দন পড়ুক তুমার মুখে।

৪০৩। সাতপাকের ফেরে পড়া। (দায়িত্বে জড়িয়ে পড়া)

৪০৪। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসীমা?

৪০৫। সাবলে সরষা পুরা। (মিথ্যা অজুহাত)

৪০৬। সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর।

৪০৭। সাজালে-গুজালে বর, নিকালে-পুঁছালে ঘর।

৪০৮। সুখ নাইকো কপালে ছেঁড়া কাঁথা বগলে।

৪০৯। সনার অঙ্গুরী বাঁকা আর সোজা।

৪১০। সুদখোর—পুকুরের জোঁক।

৪১১। সাত পুরুষ পেরাঁই গেল—এ্যাতদিনে চোখ ফুটল। (দীর্ঘদিন পর সেয়ানা হওয়া)

৪১২। সাত খায়েঁ্য খায়েঁ্য আটে পা। (বহু বিপর্যয়ের পর সফলতা)

৪১৩। সাত কাঁড়ে বক উড়ে না। (অলসতা)

৪১৪। সোম শুক্কুর পরে শাড়ি, ধন হয় তার গাড়ি গাড়ি।

৪১৫। সেই ত মল খসালি, তবে ক্যানে লোক হাসালি।

হ

৪১৬। হায়রে কপাল একপেশে—যার ঘরে যায় সেই বলে ফ্যান খেসে। (ভবিতব্য খণ্ডন করা যায় না)

৪১৭। হাতফুলা, গোদা পা দেখবি ত সোনামুখী যা।

৪১৮। হায়রে সাধের বেগুন পোড়া—এরই লেগে বিয়া করা।

৪১৯। হরে কিষ্ট, হরে রাম আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

৪২০। হাতী যখন দঁকে পড়ে চামচিকাতেও গঁড়াল মারে।

৪২১। হায় চটাপাখ্ (চড়ুই পাখী) কি করলি, মুয়ের গুণে সব হারালি।

৪২২। হুড়মুড় যাত্রা, যা করে বিধাতা।

৪২৩। হাঁড়িঘরের ঝাঁটা হাঁড়িঘরেই বয়। (পরিবেশই পরিজনের পরিচয়)

৪২৪। হাড়ে বাসাত লাগে। (নিশ্চিন্ত হওয়া যায়)

৪২৫। হাতের পাতের সব গেইচে। (সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া)

৪২৬। হাঁড়ি ভাঙ্গলে খলা, খাপরি ভাঙ্গলে তেলা (তেলানি)। (নষ্ট হয়ে গেলেও কোন বস্তুকে কাজে লাগানো)

৪২৭। হাগার কাছে বাঘার ভয় নাই।

৪২৮। হাতের বাণ আর মুয়ের বাক্য—ফসকালেই গেল।

৪২৯। হাটে ক্যানে গোল—না বুঝবার ভোল।

৪৩০। হাঁড়ির ভাতে নাড়ীর (বিধবার) শুয়াস্তি নাই।

৪৩১। হাতে হ্যারিক্যান। (সর্বনাশ করা)

৪৩২। হাতে মালা, পায়ে বালা। (সর্বনাশ করা)

৪৩৩। হেঁসে লাও দুদিন বই ত লয়।

৪৩৪। হিসেব করে চলবি—হেঁসে খেলে মরবি।

৪৩৫। হচ্ছে বুড়া যত চিমড়া, গুড়মুড়িতে মন ভরে না। (বয়সকালে পরকীয়া প্রেমে আসক্তি)

৪৩৬। হাতে কই ব্যাতে কই, তবু বলে কই, কই।

৪৩৭। হাতে আছে হাতে নাই হাত ঘুরালেই পায় নাই।

৪৩৮। হাড়ে দুব্বোঘাস গজাবেক। (মাত্রাতিরিক্ত সহ্যশক্তি)

৪৩৯। হিতা মানলে গীতা, নইলে ভাগবত তিতা।

কয়েকটি প্রচলিত ধাঁধা বা ফড়ই

মল্লভূমবাসী মানুষের মুখের ভাষার একটি অপূর্ব নিদর্শন 'ফড়ই'। যার সর্বজনপরিচিত নাম 'ধাঁধা'। এ অঞ্চলের নিতান্ত সাধারণ, নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে সৃষ্ট বই ফড়ইগুলিতে পাওয়া যায় এসব সাধারণ মানুষদের এক আশ্চর্য সুন্দর মননশীলতার পরিচয়। জীবন-অভিজ্ঞতার স্পর্শে, চিন্তা ও জ্ঞানের গভীর সংবেদনা ও রসবোধের ছন্দমধুর প্রকাশে এ অঞ্চলের ফড়ইগুলি সত্যই লোক-সাহিত্য এবং লোকভাষার এক উজ্জ্বলতম বিষয়। যেমন—

১। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথা, কবা কবা গা
ঠেঙ্গে দড়ি, গলাকাটি, জল উগুরে যা।—কামানো খেজুরগাছ।

২। গাই তো গাভিন দুধ তো মিঠা,
ষোলশ গাভিনের একটি পিঠা।—মৌচাক ও মৌমাছি।

৩। ডাঙ্গার সাদা হাঁস, তার গটাটায় মাস।—ছাতু বা ছত্রাক।

৪। জল গলে না, পাথর গলে।—মাকড়সার জাল।

৫। যাচ্ছ কুথা? দিয়ে যাও।—দরজা বন্ধ করা।

৬। খাই ত রুই নাই, হয় ত বীচ নাই।—ছাতু বা ছত্রাক।

৭। তল কলসী উপর ডাঁটা, পাতগুলি তার ঘাংরাকাটা,
যে জানে তার কলটি (রহস্য), সে তুলে তার ফলটি।—ওল্

৮। ঝুপঝুপ্যা গাছটি, তার তলে সাপটি।—মূলা, গাজর।

৯। ছোটুবেলায় পরে জামা, বড় হলেই নেংটা মামা।—বাঁশ

১০। এ্যামন মামা—তার গোটাটায় জামা।—পেঁয়াজ।

১১। গাছটির নাম হীরা, তাথে ধরে গুড়, বেগুন, জিরা।—মহুয়া।

১২। মা লতা, বাপ দাতা, দিদি হলদ্যা, দাদা হাকুড়কুঁদ্যা।—কুমড়ো।

১৩। আয় ঘুরঘুর্যা, তোকে লিয়ে খেতে বসি।—জলের ঘটি বা জলের জাগ।

১৪। সিজাই শুকাই, খাই নাই।—কাপড়।

১৫। ছানার মাথায় ঘা, ছানা পাতাল বাগে যা।—গোঁজ বা খুটি পোঁতা।

১৬। পড়িতে রুনুঝুনু উঠিতে পাহাড়
লাখ লাখ জীব মারে, করে না আহার।—মাছধরা জাল।

১৭। নালার পাখী নালায় চরে, ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে।—চরকা।

১৮। এ্যামন ছেলা দুষ্টু, মাকে ছুঁলেই মৃত্যু।—লবণ / নুন।

১৯। বুড়ি উপরবাগে চায়, এক খাবল করে খায়।—ঢেঁকি।

২০। চিবোই তো মাড়ি নাই, খাই বটে গিলি নাই।—দাঁতন।

২১। ইতুটুকুন পাতটি কালিই ভরা প্যাট,
উড়ে উড়ে পাতটি চলে দ্যাশ বিদ্যাশ।—চিঠি।

২২। চার কলসী দু'ধে ভরা আঢাকা উপুড় করা।—গাই-এর দুধের বাঁট।

২৩। প্রথমে হ'ল মুড়ি তারপরেতে খই
তারপরে লেজ বেরুলো—অবাক হয়ে রই।—সজিনা ফুলের কুঁড়ি, ফুল, ডাঁটা।

২৪। যু ায় যাবি যা আমার হাতে বাঁধা।—ছুঁচ ও সুতা।

২৫। ইতুটুকুন পাখিটি, কাটলে-কুটলে এ্যাতটি।—টাকা।

২৬। উঠুক, ফুটুক, চুটুক চাঁই—চোখ ডুমাডুম মাথা নাই।—কাঁকড়া।

২৭। জামার ভিতর জামা—তার ভিতরে ছানা।—কলার মোচা।

২৮। তুলেই কাছাড়।—নাকের সর্দি বা সিক্নি।

২৯। বনে চরে কালো গাই—দশজনাতে ধরতে যাই।—মাথায় উকুন বাছা।

৩০। আঁক নদীর বাঁক নাই, জল আছে তো মাছ নাই।—ডাব।

৩১। পিতলের হাঁড়ি মোমের ঢাকনি—যে না বলতে পারে সে মেথরের ভাগ্নি।
—কৈঁদফল।

৩২। গাছ দিল মুগুর, মুগুর দিল ডিম ;
ভাঙরে পণ্ডিতের বেটা গোটা দুই তিন।—কাঁঠাল।

৩৩। রক্ত ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা—যে ভাঙ্গতে পারে সে রাজার বেটা।
—কুঁচফল।

৩৪। বল্ দেখিরে বুদ্ধিমান—কোন্ জিনিসের তিনটে কান।—উনুন।

৩৫। পাতা চিরিচিরি ফলটি গোল—যে না বলতে পারে সে আস্ত ছাগল।
—তাল।

৩৬। সাপ লয়কো গাছে ঝুলে—বলতে না পারলে কানটি মলে।—চিচিঙ্গা।

৩৭। এক বাক্সে বত্রিশ খাপ—যে না ভাঙ্গে তার তিনটি বাপ।—দাঁত।

৩৮। ঢুকছে বেরুচ্ছে নয়কো সাপ, বলতে পারলে বেটার বাপ।
—জলসেচের ডুনি

৩৯। চার কোণায় চারটে দড়ি, বিশাল বড় পেট
রাজা আসুক, প্রজা আসুক মাথা করে হেঁট।—মশারি।

৪০। পানের মতো পাতলা চাঁদের মতো গোল
যে না বলতে পারে তার মাথায় ঢাল ঘোল।—রুটি।

৪১। জলেতে সর্বদা থাকে নহে জলচর,
ভূমিতে ভ্রমণ করে নহে সে খেচর।
খেচরের শক্তি ধরে খেচর তো নয়,
বল দেখি মহাশয় কোন্ পাখী হয় ?—হাঁস।

৪২। পিঠে কুঁজ, পেটটা ফাড়া
বলতে পারলে ভালো, নয়ত গলায় লাওগা দড়া।—কড়ি।

৪৩। আররে বিশা তামুক খায়েঁ যা,
তামুক খাব কি ?
একটা ছেলার তিনটা মাথা
ভাবতে বসেছি।—উনান।

৪৪। জলেতে দিতেছ জাল সারাদিন ধরে
তবু না তাতিল জল কপালের ফেরে
বল, বল ঠাকুরপো বল এই কথা
যদি না বলিতে পার খাও মোর মাথা।—পুকুরে / নদীতে জাল ফেলা

৪৫। কোন্ নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি
আলিঙ্গনে মোক্ষলাভ শাস্ত্রের ভারতী।
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন
হেন কোন্ নারী আছে বল গুণীজন।—গঙ্গা।

৪৬। বুধের জনক যাহার ভালে,
তাহার গলায় যে জন দোলে,
তাহারে ধরিয়া যে জন খায়,
তাহার পৃষ্ঠে চড়েন যিনি
তাহার গৃহিণী হন যিনি
আমাকে কৃপা করেন তিনি
ভাল করে বুঝে বল দেখি তুমি।—লক্ষ্মীদেবী।
(বুধের জনক=চন্দ্র, যাহার ভালে=শিবের কপালে, তাহার গলায় যে জন দোলে=সাপ, তাহারে ধরিয়া যে জন খায়=গরুড়, তাহার পৃষ্ঠে চড়েন যিনি = নারায়ণ, তাঁহার গৃহিণী হন যিনি=লক্ষ্মীদেবী।)

৪৭। কাঠ খায়—সিঁদুর হয়, বল দেখি কারে কয় ?—আগুন।

৪৮। জল বটে বৃষ্টি নয়—এ্যামন জিনিস কি হয় ?—শিশির।

৪৯। ঝাকুড়, ঝুকুড় গাছটি, ফল ধরেছে বারটি
পাকলে হয় একটি
বল দেখি কি ?—১২ মাস = ১ বছর।

৫০। ধরাধরি মলামলি পরপুরুষের কাছে,
অর্ধেক গেলে মুখটি ভার,
সবটি গেলে হাসে।—চুড়ি বা শাঁখা পরানো।

৫১। মাঠটি সাদা, বীজগুলি কালো
মু নাই, তবু বলে ভালো
পা নাই তবু চলে—
ঘরে ঘরে আপন কথা বলে।—চিঠি।

৫২। প্যাট আছে, পিঠ আছে, আছে দু'খান হাত—
মুখ নাই, মাথা নাই মানুষ গিলে খান।—জামা।

৫৩। বাইরে চরে, ভিতরে চরে, চরে সভার মাঝে,
চামের ভিতর চাম পুরে ফটর ফটর বাজে।—জুতো, চপ্পল।

৫৪। আনবি রতন, করবি যতন, দেখায় যেন নিজের মতন।—আয়না।

৫৫। যতই দিবি ততই খাবেক, ন্যাজ ধরে টানলে পিছাই যাবেক।—দড়ি।

৫৬। বালির সমুদ্রে কি ফুল ফুটে, বালি থেকে ফুল ভূঁইয়ে লুটে।—মুড়ি / খই।

৫৭। যেতে আসতে কিছুদূর, একটি ডালে পাঁচটি ফুল।
—হাত / পায়ের পাঁচটি আঙুল।

৫৮। একবার যায় আবার আসে, যে যায় সে আর না আসে।
—চোখের জল ও মুখের খাদ্য।

৫৯। কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে।—নাড়ি ও পুকুর।

৬০। গাছটা চলে গেল, পাত টা পড়ে রইল।—মানুষ ও পদচিহ্ন।

৬১। দশটি চরণ, পাঁচটি বদন, চারটি প্রাণ—একই দিকে যান।—মৃতদেহ ও বাহকবৃন্দ।

৬২। আমি খাই, তুমি খাও—খেতে বললে রেগে যাও।—কলা।

৬৩। এ্যাত বড় বিছানা কেউ শোয় না, এ্যাত ফুল ফুটে আছে কেউ তুলে না।
—আকাশ ও তারা / সাগর ও ঢেউ।

৬৪। এই দেখলম্ এই নাই—কি বলব রাজার ঠাঁই।—বিদ্যুৎ।

৬৫। নাম আছে, জিনিস নাই, কুথায় গেলে পাব ভাই?—ঘোড়ার ডিম।

৬৬। রাজার ঘরে পাতিহাঁস, খায় খোলা ফেলে শাঁস।—চালতা।

৬৭। ছাগলটা বাঁধা রইল, দড়িটা চরতে গেল।—লাউ বা কুমড়া।

৬৮। আছে কোন্ ফল, দু'খানা বাটি একগ্লাস জল।—নারকেল।

৬৯। একে মাগী বেঁটে, তাই খিল দেয় এঁটে।—শামুক।

৭০। ছ পায়ে আসি, চার পায়ে বসি, দু পা ঘসি, আমার নাম বল তো পিসি?
—মাছি।

৭১। বৌ নয়, বিটি নয়, থাকে কোণের ঘরে,
গাইয়ে নয়, নাচিয়ে নয়, তবু গুণগুণ করে।—মশা।

৭২। এ্যাতটুকুন কেলে ছা, ছুঁয়ে দিলেই বাবাগো-মা।—মৌমাছি, ভোমরা।

৭৩। ঠ্যাং মেলে বসিস্ নে, তুলে মারবে জানিস নে।—উকুন।

৭৪। ঘর আছে তো দুয়ার নাই, দুয়ার আছে তো কপাট নাই।—গুটিপোকা।

৭৫। লালশাকের ডাঁটাটি ছুঁয়ে দিলেই টাকাটি।—কেন্ন।

৭৬। মুয়ে হাসে গাছে ঠ্যাং রেতে উড়ে ড্যাডাং ড্যাং।—বাদুড়।

৭৭। পিছন জলে, মুয়ে রা, ঝোঁপে ঝোঁপে উড়ে যা।—জোনাকি।

৭৮। ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা লয়, গলায় পৈতা বামুন লয়।—চরকা।

৭৯। আটটি মাত্র হাড়, একঝুড়ি তার ভুঁড়ি।—দড়ি বা ফিতের খাট।

৮০। মানব নয়, দানব নয়, কার সঙ্গে কথা কয়?—বই পড়া।

৮১। পিঠে চেপে যায়, বিনা দোষে মার খায়।—ঢাক।

৮২। তলা আছে, গলা নাই, বল দেখি কি ভাই?—থালা।

৮৩। একটুখানি কালো, ঘসে দিলেই আলো।—দেশলাই।

৮৪। সকাল হলেই কুয়ায় ঝাঁপ।—বালতি।

৮৫। দু জাং চিরে, মধ্যে দিলম্ ভরে।—যাঁতি / কাঁচি / সাঁড়াসি।

৮৬। এ্যামন কি ছাগল? ছুঁলেই ম্যাম্যায়।—যে কোন বাদ্যযন্ত্র।

৮৭। প্যাটের ভিতর মাথা পুরে শুয়ে থাকে নিশ্চিন্ত হয়ে।—দরজার খিল, হুড়কা।

৮৮। উপর থেকে পড়ল দুম্—দৌড়ে যাবার লাগল ধুম।—তাল।

৮৯। ছাই ভিন্ন শোয় না, লাথি ভিন্ন উঠে না।—কুকুর।

৯০। ঝাঁ গুর গুর, বাপ থাকতে বেটার ক্যানে লেজুড়।—ব্যাঙাচি।

৯১। এল আর গেল, বসতে নাহি পেল।—শ্বাস-প্রশ্বাস।

৯২। কাছেই আছে কাছেই নাই হাত বাড়লেও পায় নাই।—কনুই।

৯৩। গাছটি ঝাপুর ঝুপুর,
তার তলায় তিলক ঠাকুর,
তার তলায় মিটি মিটি,
তার তলায় ফোঁস ফোঁস,
তার তলায় কচর কচ্।—মাথার চুল, কপাল, চোখ, নাক, মুখ।

৯৪। আমার মামা, তুমার মামা,
বাবার মামা, দাদুর মামা,
মামার মামা—সবার মামা।—চাঁদামামা

৯৫। ঝুলন ঝুলন ঝুলছি, ছোটুবেলায় খেলেছি,
বড় বেলায় ন্যাংটা হয়ে বাজারময় বুলেছি।—তেঁতুল।

৯৬। তেল চুক্‌চুকে পাতা, গা ভর্তি কাঁটা,
পাকলে মিষ্টি, তার বিচি গোটা।—কাঁঠাল, লিচু।

৯৭। কাঠের গাই, মাটির বাছুর, দুধ দিচ্ছে টুপুর টুপুর।—খেজুর বা তালগাছে হাঁড়ি টাঙিয়ে রস নেওয়া।

৯৮। মা মেয়েকে প্রণাম করে।—কলসী থেকে ঘটিতে জল গড়ানো।

৯৯। অহল্যা গৌতম নারী আপন মনে বিচার করি,
পতি শাপে হয়েছিল যাহা।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে—পাইবেন তাহা।—পান।

১০০। কায়স্ত-র অস্ত ছাড়া,
কাঠা-র ছাড়া কা,
লবঙ্গ-র বঙ্গ ছাড়া,
কিনে আনগে যা।—কাঁঠাল।

১০১। তিন অক্ষরে নাম তার, মাথা নিয়ে কারবার,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে ছেলেরা খায় বারবার।—চিনি।

বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি কর্মসঙ্গীত

১। ধান রুয়ার গান—

ভাদর মাসের খাটো বেলা
তুরাই (তোরা) ত টানালি তোলা
ও বেলা সবুর কর—
বাসি কাদা (অবশিষ্ট জমি) রুয়ে যাব ঘর।

অথবা,

কে রুয়েছে ধান গাছি, ভেলে ভেলে (দেখে দেখে) শ্বশুর ঘর যাছি
আষাঢ় মাসের কাদাতে নজ্জা লাগে কাছে দাঁড়াতে।

২। ধান ভানার গান—

বেলা যখন তাল গাছের আড়ে,
উদের বৌ শাগ বাছতে বসে,
মেয়েরা সব কি লহরী (কৌতুক) জানে গ
ছেলা কাঁদায় ধান ভানে।
ছেলা কাঁদায় ধান ভানে।

৩। মাটি কাটার গান—

ও দিদি বল্‌তো তুর দেওরকে
মাটি কাটতে যাবেক, না-কি করবেক ঘরেতে?
মাটি কাটতে গেলে, টাকাট, সিকিট
আমরা পাব দু'জনে।

৪। পাথর ভাঙ্গার গান—

মাটি কাটা যেমন তেমন
পাথর কাটা দায়,
ঐ ছোঁড়ারা ফাটাই দিল
পাথর ভাঙ্গা দায় হ'ল।

৫। নৌকা বাওয়ার গান—

আম পাতা চিরি চিরি লৌকা বানাইব,
দামুদরের কেসাই লদী হেলকা ফিরাব।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা,
এ্যাই সখীকে পার করিতে লিব কানের সনা।

৬। ছাত পিটার গান—

চল সই চল জলকে যাব লো পড়িল বেলা
হেই হেই পড়িল বেলা।
রাত হল্যে ভয়ে মরি আমরা অবলা,
মরি মরি আমরা অবলা॥

৭। মাছ ধরার গান—

হাতে লিল দু'মুখী, কাঁধে লিল জাল,
জেলে চলে জলে খালে মাছ ধরিতে যায়।
উপার গঙ্গা, ইপার গঙ্গা, মাঝখানেতে জেলে জাল দেঙ্গা
মাছ ধরিতে গেলি জেলে
মাছকে দিলি মন।
বেলা তো গেল, ইবার জেলে মাছ বিচবি কখন।
লাল গামছা কাঁধে লিয়ে
জেলে যায় কুলি কুলি—
তুরা কে মাছ লিবি বল গো সত্বর।

আমরা সব মেয়া ব্যাপারী
চাল লুব, ধান লুব, ধারে বিকব নাই
ঘরে আছে ছটু ছেলা—খাতে পাবেক নাই।

৮। গাই দোয়ার গান—

গাই দুইবার বিলা হ'ল
কাকে বলব বাছুর ধর ;
বৌ যাবেক লো বাপের ঘর,
শুনে আমার আইছে জর,
আড়াল থেকে দেখবো তুমার ছলনা,
আজ বৌ, তুমায় যাতে দুব না,
বাপের ঘরের গরব তুমার রাখা চলবেক না।

৯। মাথা বাঁধার গান—

ছটু ছটু লাচনি গুলান
খোপা পারা চুল,
প্যাঁচ ঘুরাঁইয়া বাঁধব মাথা
গুঁজব তারা ফুল।
ও সই, যাব তুদের পাড়া
আনতে ফুলের তড়া
ফুল বিনা মাথা আমার
রইবে উপবাস।

১০। কাঠি নাচের গান—

ক) অহড়ে বহড়ে বাগাল গেলি অনেক দূর রে,
খুরে না লাগিল কাদা জল খাওয়ালি কোথা,
হাঁকাতে হাঁকাতে বাগাল গেলি বহু দূর রে
গোধন চরাতে যাবি শীকিষ্টের সঙ্গে রে।

খ) পস্তু গাছে বুঁটি (গুটি) আইচে
ও বুঁটি খেদাই দিও না, বুঁটিতে মধু জমেছে॥

১১। খড়ের ঘর ছাইবার গান—

নাইকো ঘরের চেলা মুছনি
বুঝি তো ঘর টেকে না

বসত হলো না।
একি হলো গো ছুঁচোর জ্বালাতে
ঘরে বসত হলো না॥

১২। শ্মশান যাত্রাকালের গান—

'ওরে একা কে যায় শ্মশানপাটে পুত্র-কন্যা মাতা-পিতা ছেড়ে
ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধু, পত্নী সবায় ত্যাগ করে।
(স্ত্রীলোক হলে পত্নীর স্থলে 'পতি' হবে।)
এই ভবের হাটে রইলি কটা দিনের তরে
থাকবে সবি থাকবে সবাই (কেবল) থাকবি না তুই ঘরে॥
তুই চক্ষু মিলে এলি সংসারে তুই একা
(আবার) দুটি নয়ন মুজে গেলি ওপারে একা একা
কিন্তু একসঙ্গে খেলে গেলি ভবের খেলাঘরে॥
ওরে একা কে যায় শ্মশানপাটে দিনের লীলা সেরে
রাতের আঁধার প্রিয় হল নিজের কপাল ফেরে
এই ভবের হাটে কেনাবেচার কর্ম সাঙ্গ করে
চলে গেলি ওপারে তুই চৌদলাতে চড়ে॥'

—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

সংগ্রহ—বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, শারদ সংকলন ১৩৯২

ছড়া

মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে ছড়া শুনতে এবং ভাষা ফুটবার পর থেকে ছড়া বলতে শুরু করে, তবুও ছড়া চর্চার ইতিহাস খুব বেশী প্রাচীন নয়। বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষরে প্রবাদ চর্চা শুরু হবার অর্ধ শতাব্দীরও পরবর্তী-কালে ছড়া চর্চার সূত্রপাত ঘটে। প্রবাদ চর্চা শুরু হয়েছিল একাধিক বিদেশীদের দ্বারা প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু ছড়া চর্চার মধ্যে সেরকম কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তাছাড়া সীমিত পরিসরে রচিত প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ যত সহজ ও সুন্দরভাবে বোধগম্য হয়, ছড়ায় তা হয় না। ছড়ায় সুর আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থসঙ্গতি নেই।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে ছড়া চর্চার ইতিহাস শুরু, কিন্তু অবিমিশ্র ছড়ার সংকলন কিংবা আলোচনা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৩০২)

নামক ছড়ার গ্রন্থ রচনায়। অবশ্য তারও এগার বছর পূর্বে বাংলার ছড়া সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল ১২৯১ সনের 'নব্যভারত' নামক পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)। সেখানে লেখকের নাম না থাকায় প্রথম ছড়া চর্চার গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। তবে ছড়াটি যে সুন্দরবন এলাকার কৃষিজীবী মানুষের ফসল ফলানোর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ বিষয়ক তাতে সন্দেহ নেই। একটু উল্লেখ করতে পারি—

আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আ'সে
মা নক্ষী—গভ্‌ভে বসে,
সাধ খাও বর ত্থাও—হে……ইত্যাদি।

'ছড়া' লোকসাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশেষতঃ এর ধ্বনিমাধুর্য অপূর্ব। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদে এলো বান।' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য্য এবং উপযোগিতা কী।…' এহেন ছড়া আমাদের এই মল্লভূম অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে মা-ঠাকুমার মুখে মুখে আজও বহুভাবে প্রচারিত হয়ে চলেছে। বর্তমান শিক্ষিত মানুষদের কাছে সেসব ছড়া তেমন কোন সাহিত্যিক মূল্য পায়নি। ঐ রকমই অনাদৃত ও অবহেলিত কিছু ছড়ার পরিচয় প্রসঙ্গে বলতে পারি 'ছড়া-সাম্রাজ্যে'র একচ্ছত্র অধিপতি বুঝি শিশু। তাই দেখেছি অধিকাংশ ছড়া যে শুধুমাত্র শিশুর মনো-রঞ্জনের জন্য রচিত হয়েছে তাই নয়, বহু ছড়ার নায়কও শিশু। সমগ্র পরিবারের সকলের আদরের ধন শিশু। মা তার সন্তানকে ভালবাসেন সত্য, কিন্তু শিশুর প্রতি বাড়ির সকলেরই অসীম দুর্বলতা ও সীমাহীন ভালবাসা। তাই কেবল মা নন, বাড়ির যে কেউ শিশুকে কোলে নিয়ে বলতে থাকেন—

ধন, ধন ধন
এ ধন যার ঘরে নাই
তার বৃথা এ জীবন।

প্রকৃতপক্ষে শিশুমনে দোলা জাগাতেই 'ছড়া'র উৎপত্তি। শিশুদের সরলমনের অকপট অনুভূতি ও হৃদয়কল্পনার কথা ছড়ার মধ্যে বিধৃত। 'ক্ষীর নদীর তীর' থেকে শুরু করে 'রাক্ষস-খোক্কসের দেশ' পর্যন্ত শিশুকল্পনার জগৎ। দামাল

ছেলেকে খাওয়াতে, নাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে, শান্ত করতে, সব কাজেই 'ছড়া'র প্রয়োজন। ছন্দের তালে তালে বেসুরো সুরেও দুরন্ত শিশু শান্ত হয়। এসবই ছেলেভুলানো ছড়া। ছেলেভুলানো ছড়াগুলি মূলতঃ সৌভাগ্যবতী জননীদের মাতৃত্বের অভিব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে সন্তানের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ছড়াগুলি রচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি সন্তানগরবে গরবিনী জননীর আনন্দোচ্ছ্বাস। এগুলি রচনার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুদেবতার মনোরঞ্জন রূপ পূজা। সাধারণতঃ রূপকথার গল্পে আমরা অধিকাংশ মায়েদের বিষাদ-মলিন রূপের সাক্ষাৎ পাই, ছড়ায় সেই বিষণ্ণতা নেই, বরং এখানে জননীদের হাস্যোজ্জ্বল গরবিনী রূপের প্রকাশই বেশী। তাই 'ছড়া পরিতৃপ্ত মাতৃত্বের উল্লাস, যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত তটিনীর কলোচ্ছ্বাস।' বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, বাংলার ব্রতে বঙ্গজননীর শিল্পীসত্তার পরিচয়টি বিধৃত, অনুরূপভাবে ছড়ার মাধ্যমে বঙ্গ জননীর কল্পনাময়ী রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে তার সুরস্রষ্টার মহিমান্বিত পরিচয়টিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'ছড়ার মা ছন্দের রাণী, সুরের সাম্রাজ্ঞী। আনন্দ ও সোহাগ এখানে ছন্দে ও সুরে সুরেলা।'

মা যখন শিশুকে ঘুম পাড়ান, তখন নিজস্ব সুরে গুণ গুণ করে বলতে থাকেন—

ছেলা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী আল্য দেশে,
বুলবুলিতে ধান খায়েঁছ্যে খাজনা দুব কিসে।

অথবা,

আয় ঘুম, যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়েঁ্য
দত্তর বৌ পান সাজেছ্যে এলাচ লবং দিয়েঁ্য।

ছড়া দুটির মধ্যে আছে কিছু সত্যকথন। প্রথমটিতে 'বর্গী' অর্থাৎ দুর্ধর্ষ মারাঠা কর্তৃক মল্লভূমরাজ্য আক্রমণের ইংগিত। অন্যটি 'দত্ত' অর্থাৎ জাতিগত ব্যবসায়ের ইঙ্গিত। এ অঞ্চলের আর একটি বিখ্যাত ছড়া 'কারু কিছু হারাইছে মদনমহন পালাইছে।' অর্থাৎ মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ কর্তৃক মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক দেবার সত্যকাহিনী এই ছড়ার পংক্তিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শিশু যখন ঘুম থেকে উঠে বায়না ধরে, তখন তাকে ভোলাবার জন্য মা-দিদিমা বলতে থাকেন—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, থাকব বনের মাঝে,
নাচ দেখি খোকন সনা ঘুঙুর কেমন বাজে।
তুকে নাচলে কেমন সাজে
পায়ের ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর বনের মাঝে বাজে।

স্নানের সময় শিশু ধরে বিভিন্ন বায়না। তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে স্নান করাতে করাতে মা ছড়া কাটেন—

তেল মাখবার ছড়া—

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি খোকন নাইক ঘরে
ত্যাল-হলুদ মেখে খোকন ক্যামন চান করে।

স্নান করাবার ছড়া—

আমার খকনকে কেউ বল না কালো
হলুদ দিয়ে চান করিয়ে গা করব ধলো। (ফর্সা)

এবার আসে খাওয়ানোর পালা। ছেলেকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে যাতে একটু বেশী খাওয়ানো যায় সেই প্রচেষ্টায় মা-মাসীরা বলেন—

আয় তো রে একানড়ে, লম্বা লম্বা হাত নেড়ে
আমার সোনা খায় ভাত, তোদের কেটে দুব হাত।

কিংবা,

আয়রে আয় ট্যাক্‌সনা, (নীলকণ্ঠ পাখী) খেতে দুব ভাজা চনা।

খোকা-খুকুর কান্না যেন হীরে-পান্না। তাই—

খুকু আমার কেঁদেছে পান্না ঝরে পড়েছে
খোকা আমার কেঁদেছে হীরের ঝিলিক মেরেছে।

খোকার মতো খুকুকে ভুলাতে গিয়ে—

খুকুর আমার বিয়া দুব মস্ত রাজার ঘ্যাশে,
তারা গাই দিয়ে চাষ চষে, সনাতে দাঁত ঘষে।

কিংবা,

আঁকড় ফুলের বড় বাহার, বৈঁচি ফলের মালা
খুকু যাবেক শ্বশুরবাড়ী চাপ্যে চতুরদোলা।

শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে মেয়েকে গহনা দিয়ে সাজাতে হবে, তাই ছোট্ট খুকুকে সাজাতে সাজাতে মা বলেন—

রাঙা ঢোলের কড়িগুলি খোঁপায় বড় সাজে
মাদুলি গড়িয়ে দুব খুকুর গলার মাজে। (মাঝে)

খুকু শ্বশুরবাড়ি যাবে, এ কামনা শিশুবয়স থেকেই। লোক নিতে এসেছে, কিন্তু ভরা বর্ষা যে। তাই—

জল পড়ছ্যে, কাদা হইছ্যে, তাই আইচে লিতে গ,

উঠে যাবেক পায়ের আলতা, মন সরে না যাতে গ।

খোকা-খুকু একটু বড় হয়ে খেলতে যায়। সেখানে তারা ছড়া কেটে খেলে—

খোকা—এলটিং বেলটিং শৈল,
খুকু—কিসের খবর আইল,
খোকা—রাজা একটি বালিকা চাইল
খুকু—কোন্ বালিকা চাইল—
খোকা—(খুকুকে দেখিয়ে) এই বালিকা চাইল···

ইত্যাদি বলে খোকা-খুকু দলের খেলা শুরু করে।

কিংবা,

ইক্‌ড়ি, মিক্‌ড়ি চামচিকড়ি
চামে হ'ল পোকা
কোদাল দিয়ে চাঁছা
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খা শিয়ালের মাথা
এইটি আমার কিসের ফুল
এইটি আমার টগর ফুল।

কিংবা,

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
চাম কৈ কৈ মোকদ্দমা।
ভাত খাউসে জামাই শালা,
ভাতে পড়ল মাটি
কোদাল দিয়ে চাঁছি
কোদাল হোল ভোঁতা
খা শিয়ালের মাথা।

খুকু যখন বালি নিয়ে 'ধুকুধুকু' খেলে, তখন আপন মনেই বলে—

ধুকুধুকু দাঁড়ি
এক পাই চাল কাঁড়ি,
চাল কাড়তে হ'ল বেলা
ভাত খাব রে দুপুর বেলা।

ছড়াতে আছে বহু অবাস্তবতা। 'অবাস্তবতা' ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেমন—ক) রোদ দিচ্ছে, জল হচ্ছে, খেঁকশিয়ালের বিয়া হচ্ছে।
অথবা, জল পড়ছে, রোদ দিচ্ছে, শিবঠাকুরের বিয়া হচ্ছে।

খ) চাঁদ, চাঁদ, গগনচাঁদ কলমীবনের শশী
এই এক চাঁদ, ঐ এক চাঁদ, চাঁদে মেশামেশি।

গ) আয় ঘুম আয়, ভালুকে তেঁতুল খায়,
তারা নুন কুথা পায়—
নুন চুরি করতে যায়েঁ্য ব্যাদম মার খায়।

গভীর-গহন জঙ্গলে বেষ্টিত মল্লভূম অঞ্চল। এ অঞ্চলে আছে শাল-শিমূল-মহুয়া-পিয়াল গাছ। আছে বাঘ, হায়না, ভাল্লুকের উৎপাত। তাই—

ঘ) মহুল গাছের নুন, পিয়াল গাছের ত্যাল, (তেল)
তাই দিয়ে ভালুকছানা খায় পাকা ব্যাল। (বেল)

ঙ) হায়না আসবি, বাঘ আসবি পড়তে হবেক নাই,
খোকা আমার ঘুমাই যাবেক ধরতে পারবি নাই।

কিংবা,

কটাস্ আসে, শিয়াল আসে ধরতে পারে নাই
(খোকা) মুড়ি খায়েঁ্য শুয়ে পড়েছে লাড়ু লেই নাই।

ছড়ার সঙ্গে শিশুর যোগ গভীর। প্রায় প্রতিটি ছড়ার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল শিশু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছড়া রচয়িতারা কেউ শিশু বা শিশুমনস্তত্ত্ববিদ নন। বরং অধিকাংশই গ্রাম্য ও বয়স্কা মহিলা। তাই অনেক সময় ছড়ার বিষয়বস্তু অর্থসঙ্গতিহীন কিংবা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তবুও শিশু ছড়ার রস আস্বাদন করে মুগ্ধ হয়। শিশুমনের এ মুগ্ধতা আসলে যিনি ছড়া বলেন তাঁর মুখ-ভঙ্গিমা, অন্তরের উত্তাপ, চোখের স্নেহ, ও শারীরিক সুখানুভূতির অনুভাবনা। অর্থসঙ্গতিহীন কতকগুলি আদিবাসী ছড়া—

ক) লাড়ু পিঠা গটা গটা চাটু পিঠা ঝাঁঝরা
কামার ঘরে বাইজছ্যে দেখ জড়া-নাকাড়া।

খ) ই ডুংরি, উ ডুংরি পিয়াল পাকেছ্যে
পিয়াল খায়েঁ্য মাইরি প্যাট ফাটেছ্যে।

গ) শালুকফুলের মালা গাঁথ্যে বেলফুলের ডালা লো
কচুশাক, পস্তুপোড়া মুয়ে ধরে জ্বালা লো।

ঘ) আমি লুব মুড়ি মুড়কি তুকে দুব ফুটকলাই
চ সেজকি জল আনতে কাঁসাই লদীর জলকে যাই।

ঙ) ছিঁচ্কাঁদুনি পিঁয়াজ ডগ্, ভাত মারে গবাগব্।

কিংবা, ছিঁদ্কাঁদুনি নাকে ঘা—
পুঁজ পড়ছে চাটো্য যা।

চ) বিয়াই আস হে, খায়েঁ্য যাও লতুন তরকারী,
শিল ভাতে, নোড়া পোড়া, কোদাল চড়চড়ি।

ছ) ই শাঁখাটি কাখে সাজে, ঘরমুনিকে
ঘরমুনির বিয়া হুব ধামসা-মাদল বাজে।

এইসব ছড়া শিশু বুঝুক, বা না বুঝুক তার হৃদয় কিন্তু দুলে ওঠে। তার রুদ্ধ আবেগ যেন এসব ছড়াকে অবলম্বন করে বেরিয়ে আসতে চায়।

কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ছড়া

ক) ব্রত অনুষ্ঠানের ছড়া—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা ঘরদুয়ার শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে গোবর ও জল দিয়ে ঘরের সামনে, আঙিনায়, দেবমন্দির চত্বরে গোলাকার প্রলেপ দেয়, একে বলে 'মাড়ুলি দেওয়া'।

১। মাড়ুলি দিতে দিতে মেয়েরা যে ছড়াটি বলে—
মিত্তিকা (মৃত্তিকা) চরণ, মিত্তিকা বরণ, মিত্তিকায় দিলম সাজ।
তুমার দুয়ারে মাড়ুলি দিচ্ছি মা, ভক্তি দাও মা আজ।

২। সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জালিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা বলে—
সাঁঝ দিলম, সন্ধ্যে দিলম, সগ্গে দিলম বাতি,
সব ঠাকুরকে সাঁঝ দেখালম—লক্ষ্মী-সরস্বতী,
এবগণ, দেবগণ, তুলুসীতলায় নারায়ণ—
দু' পাতা তুলুসী লাগলো চরণে
কোটি কোটি দণ্ডবৎ দুগ্গার চরণে।

৩। ছোট্ট শিশুর সামনে সন্ধ্যাপ্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার মঙ্গল কামনা করে বলেন—
সাঁঝের প্রদীপ নড়ে চড়ে, যে আমাদের খোকাকে খুঁড়ে,
তার মুখটি যেন আগুনে পুড়ে।

৪। সই পাতানো অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ 'সয়লা উৎসব' ও 'ডুবে শশা' বা 'শিয়াল শুক্নি' ব্রত অনুষ্ঠানে যে ছড়া বলে মেয়েরা সই পাতায় তা হ'ল :

ক) সয়লা উৎসবের ছড়া—
ও দিদি, আমি ফুল পাতাব, ফুলকে আমি কি দুব,

মাচানতলায় দেখা হ'ল্যে ফুলকে ফুলম ত্যাল তুব।
চল্ সখী চল্ ফুল পাতাব মল্লরাজার বাগানে,
বেছে বেছে তুব সে ফুল, যে ফুলেতে মধু আনে।

৫। 'ডুবে শশা' বা 'শিয়াল-শকুনি' ব্রত-অনুষ্ঠানের ছড়া—

এই অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছোট মেয়েরা মাটির শিয়াল-শকুনি তৈরী করে হাতে নিয়ে, সেইসঙ্গে একটি করে শশা নিয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে (পুকুর কিংবা নদীতে) যায়। এক কোমর কিংবা এক হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দুই সখী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে গভীর জলের দিকে শিয়াল-শুকনি ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে—

শিয়াল গেল খালে, শুকনি গেল ডালে
ও শিয়াল তুই মরিস্ না
লোক হাসিটা করিস্ না।

ব্রতভঙ্গ করে ব্রতিনী দুজন নদীতে ডুব দিয়ে শশা কামড়ে পরস্পর পরস্পরকে বলে—

আজ অব্দি নামের কথা
কাল থেকে ডুবে শশা পাতা।

বৈশাখ মাস যেন বারব্রতের মাস। এসব বারব্রতে গ্রামীণ নারী-সমাজের মনোজগতের এক সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েরা যেসব বারব্রত করে তার মন্ত্র হ'ল লৌকিক ছড়া। পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি, তুষ-তুষুলি, গোকাল, হরির চরণ, দশপুতুল, কিংবা সুবচনী যাই হোক না কেন সব ব্রত অনুষ্ঠানেরই মূল বিষয় হ'ল নারীভাবনা। যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রতে বলে—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে সকাল বেলা
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী…ইত্যাদি।

কিংবা গো-কাল ব্রতে—

'গোকালে গোকালে বাস
গাভীর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় সগ্গে বাস।…ইত্যাদি।

ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ পূজার ছড়া—(ঘেঁটু খোস-পাঁচড়ার লৌকিক দেবতা)

আলুর মালুর চাল দাও গো,

না দিবে তো খোস নাও গো।

অথবা,

চাল চুয়ানি চাল দাও গো,
না দিবে তো গুচ্ছেক খোস লাও গো।

ইঁদ্ বা ইন্দ্রধ্বজ পূজার ছড়ামন্ত্র—

এক কলসী গঙ্গাজল এক কলসী ঘি
বছর শেষে ইঁদ্‌পূজা
নাচ্‌বো না তো কি!
ইঁদ্ ঠাকুর হে ইঁদ্ ঠাকুর
কিসের গুমর কর
আইবুড়া বিটিদের বিয়া দিতে নার।

পুকুর পূজার ছড়া—

হেলঞ্চ কল্‌মি লতা পুকুরে লক্‌লক্ করে।
তার উপরে মা লক্ষ্মী হেসে খেলা করে।

সাঁজ-পূজনী ব্রতের ছড়া—(ছড়ার শব্দে কিছু ওড়িয়া প্রভাব আছে।)

ঢেঁকি পড়ন্ত, চাল বাড়ন্ত
বাপঘর শ্বশুরঘর একই চলন্ত
বাসি গোবর থাসি-থুসি
উনানে দিই ফুঁ,
বউ রাঁধা ভাত খেয়ে
চাঁদ পারা মু।

বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের বহু ছড়া প্রচলিত আছে, তবে অধিকাংশ ছড়ার ভাষা ও বিষয়বস্তু একই, তাই সেসব ছড়া আর উল্লেখ না করে সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যেসব ছড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

খ) বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছড়া—

১। হস্ত-বন্ধনীর ছড়া—

শক্ত কইর‍্যা ধরগো কন্যা শক্ত কইর‍্যা ধর,
এত রেতে পালাই গেলে কুথায় পাবি বর।
আনেক কষ্টে খুঁজে আনছি তুর এ্যামন বর,
শক্ত কইর‍্যা ধরগো কন্যা শক্ত কইর‍্যা ধর।

২। সিঁদুর দানের ছড়া—

সিঁদুর ঘষিল, গোত্র হারাল,
কাপড় টানিল, বৌ কাঁদিল।

৩। ঘোমটা টানার ছড়া—

কন্যা করলম্ দান, মাথায় কাপড় টান।

৪। কন্যা সাজাবার ছড়া—

আলতা ছটা সিঁদুর ফোঁটা জরির ফিতা কেশে
কর্ণতে তায় কানঝুমকো সাজলো বধূর বেশে।
গলায় যে তার রত্নহার দুলছে সোনার পাটা
চন্দনের বাহার যেমন বিদ্যুতেরই ছটা।
হাতে সাজে সোনার কাঁকন শঙ্খ বাহুমূলে
পায়ের পাতায় রূপার নূপুর কন্যা সাজ বলে।

৫। স্ত্রী আচারের ছড়া—

হাতে দিলম মাকু, একবার ভ্যাঁ কর ত বাপু।

৬। বৌ সম্পর্কিত ছড়া—

ফাগুনের বৌ আগুন, মাঘের বৌ বাঘ
শ্রাবণের বৌ ঝরা, জ্যৈষ্ঠের বৌ খরা।

৭। বিবাহের পর পরিবেশ অনুযায়ী ছড়া—

পাত্র এলো, বিয়া হলো, ঢুকলো বাসরঘরে,
এই সুযোগে কর্তা-গিন্নি বসে আহার করে।

৮। বিবাহে বরপণ উল্লেখে নাপিতের ছড়া—

মেয়ের বিয়ে উলু দিয়ে গিন্নি বাজায় শাঁখ
কর্তা অমনি লাফিয়ে উঠে বলেন, থাক, থাক।
কিসের আমোদ গিন্নি তুমার সব্বনাশটি হল,
বরের পণের টাকা গুণতে ভিটেমাটি গেল।
বিকিয়ে গেল জমি-জমা, বাগান-পুকুর যত,
আজ উঁচু মাথা, ছেলের বাপের পায়ে অবনত।
কন্যার মাতা, কয় না কথা, ক্ষুধা লাগে যত,
আঁচল পেতে শুয়ে আছেন আধমরাটির মতো।

৯। জামাই শ্বশুরবাড়ি এলে সে প্রসঙ্গে ছড়া—(আদিবাসী)

পস্ত বাটী ঘবর ঘবর, ঝরা মুগের ডাল গ
লতুন জামাই খাত্যে লারে কুঁকড়া (মুরগী) মাসের ঝোল গ।

১০। কন্যার বিবাহ-পরবর্তী জীবনে যদি ব্যর্থতা নেমে আসে—সে প্রসঙ্গে আদিবাসী (সাঁওতাল) ভাষায় আছে যে ছড়া—

হপন্ হপন্ রেম্ ইতি লিদিঞ
হারা তরারেম্ ধাপ্ কিজিঞ।
বাহালেকা হউম সাগে মা জিঞ,
নং কান ডমের রেম্ বাগি কিদিঞ।

[অর্থাৎ—ছোট বেলায় বিয়ে করে নিয়ে গেছে। বড় হতে ত্যাগ করেছে। ফুলের মতন আমি যখন ফুটে উঠলাম, তখন সে আমাকে ত্যাগ করল।]

১১। বাউরি সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রসঙ্গে ছড়া-মন্ত্র—

কুকুর করে কাঁই, বাউরির বিয়া নাই।

১২। বাসরঘরের ছড়া—(সখীদের ও নববধূর কথোপকথন মূলক ছড়া)

সখীরা—মাথার উপর দুধের বাটি, তায় পড়েছে ইঁদুর মাটি,
হাকিম পুরুষ কাখে ডর?

নববধূ—

ডর করব যাখে—বশ করেছি তাখে।
হেঁসেল ঘরে পানের বাটা, জল কলসী সারি সারি।
লাঠি সোঁটা লিয়ে বঁধূর শুধুই রে পায়চারী।

১৩। সপ্তপদীর ছড়া—

প্রথম পদ অতিক্রম জন্মলাভ তরে।
দ্বিতীয় পদের কামনা মহশক্তি ধরে॥
সদাব্রত আশে ফেলে তৃতীয় চরণ।
সৌম্যপ্রার্থী পার্শ্বে করে চতুর্থ চরণ॥
পঞ্চমে কামনা রক্ষা গৃহপশু যত।
হৃদিরক্ষা ষষ্ঠ পদে, বাসনা সংযত॥
সপ্তম চরণ চাহে ঋত্বিকত্ব লাভ।
সপ্তপদী মিলাইল যুগল স্বভাব॥

১৪। কন্যা বিদায়ের ছড়া—

আজ খাওয়াও মা ভালমন্দ দুধ-ক্ষীর দিয়ে,

কাল যাব মা শ্বশুরঘর বুকে পাথর দিয়ে।
মা ক্যানে কাঁদ গ লাচদুয়ারে বসে,
কাল যাব মা নিজের ঘরে চোখের জলে ভেসে।
বুন ক্যানে কাঁদ গ খাটের খুরো ধরে,
কাল যে বুন গাল দিয়েছ হিস্‌কুটলী বলে।
বাপ ক্যানে কাঁদ গ গামছা চোখে বেঁধে,
কাল যে তুমি রেহাই পাবে কন্যাদায় থেকে।

১৫। বৃদ্ধ বরের সঙ্গে অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ হ'লে সে সম্পর্কে ছড়া—

একশ টাকা লিলি কাকা, দিলি বিয়া বুড়া বরে,
বুড়ার সঙ্গে চলতে লারি বিষ্টুপুরের শহরে।
বিষ্টুপুরের লোকে শুধায়, 'ইটি তুমার কে বটে?'
লাজ বাঁচাতে বলতে হ'ল, 'ঠাকুরদাদা হয় বটে।'

১৬। কন্যা সম্প্রদান সম্পর্কে (ভূমিজদের) ছড়া—

ঘাট অ কুড়ালে বাপু নিয়ারা গো নিয়ারা
ঘাট অ বাঁধালে অজগর।
এক কুনে দিহ বাপু আম মর জাম গ,
এক কুনে দিহ মহুয়া ডাল…।

অন্য একটি ছড়ায়—

বেইল কাঠের উঁচ-অ পিঁঢ়া ঘিয়ে চপ্‌চপ্‌ কর‍্যে
তাইথে বৈসে বাপু খুড়া কন্নাদান কর‍্যে।

বিবাহরীতির ছড়াগুলি মহিলাদের নিজস্ব ছড়া, সুতরাং এসব ছড়ায় ভাব, ভাষা ইত্যাদির এক বিশেষ স্বকীয়তা দেখা যায়, যা 'লোকভাষা' নামে কথিত হলেও 'লোকসাহিত্যে'র দরবারে মর্যাদালাভের অধিকারী হতে পারে।

গ) কৃষিভিত্তিক ছড়া—

কৃষক মেয়েরা আকাশে মেঘ দেখলে আনন্দিতচিত্তে যে ছড়া কাটে—

১) মেঘ করেছে আকাশে
বীচ পুঁতবো মাঠে,
বীচ তলায় লক্ষ্মী ঠাকরুণ
বসবেন এসে পাটে।

মুঠ আনা শস্যব্রতে প্রশ্নোত্তরের ছড়া—

২) প্রশ্ন—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?
উত্তর—খামার চাঁছতে বললেন
প্রশ্ন—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?
উত্তর—ধান ঝাড়ার পাটা তৈরী করতে বললেন।
প্রশ্ন—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?
উত্তর—মরাইয়ের পাটা তৈরী করতে বললেন।

ঘ) গাজন ও মেলা উপলক্ষে ছড়া—

১) শিবের গাজন—যাচ্ছে কারা ?
বাবার চেড়া।
ভাঁড়ে কি ?
—গঙ্গাজল।
ঢালবে কোথায় ?
—বাবার মাথায়।

রথের মেলার ছড়া—

১) গোবিন্দ সেজেছিল তামাক মতিচুরে,
রথের ভিড়ে কল্কে গেল তাথে ভেঙেচুরে।
কাঠের হুঁকো হাতে ধরে
গোবিন্দ বুড়ো কেশে মরে।

২) চল্ লো সই রাই,
আমরা রথ দেখতে যাই,
আমরা পয়সা কুথায় পাব—
আমরা উল্টো রথে যাব।

৩) কুমোর পাড়ার ছুতার বুড়ো
রথ করেছে নয়টি চূড়ো
তোরা রথ দেখতে যা—
তোদের হলুদ মাখা গা।
আমরা হলুদ কুথায় পাব,
আমরা আসছে বছর যাব।

৬) যাদুগুণসম্পন্ন কিছু লৌকিক ছড়া—

অনেকে মনে করেন আদিম মন্ত্রই কালক্রমে ছড়ায় পরিণতিলাভ করেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় মন্ত্র অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি। আদিম যুগে মানুষ যখন শিশুর মতো সরল ছিল, তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ছড়া। কিন্তু মন্ত্র অপেক্ষাকৃত জটিল মানসিকতা থেকে উদ্ভূত। মন্ত্রের তুলনায় ছড়ার প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে একজন বিদেশী সমালোচক M. Bloomfield-এর একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—

'The popular rhyme is a striking example of the poetic primitive, going back in its construction and psychological essence almost to the primitive archaic times....'

মন্ত্রযুক্ত ছড়া—

১) চন্দ বাণ সূয্য বরণ মুই বাণ মার রক্তের বরণ
যারে বাণ যা ওমকার বুকে উঠে কলিজা খা
নাই কলিজা পানি করে যা।
কার আজ্ঞায়—রাম-সীতা-লক্ষণের আজ্ঞায়।

২) দেবা-দেবীর পীঠে ঘা
বিশ তুই মাটি খা,
মর বিশ তুই মাটি পছনে মর
কার আজ্ঞায়—মা জগৎগৌরীর আজ্ঞায়।

৩) তদন্তরে লোনাপানি তীর্থবাসী ওড়দং মোড়দং রায়ের
নবদণ্ড ছাতা এখানে সেবা কর আসি।
তদন্তরে হাজার সামন্ত এখানে সেবা কর আসি
যে যাহার ফল-পুষ্প লয়ে দণ্ড দরশন কর আসি।

৪) ছং জাং বিজং জানিঃ হরির স্মরণে বিশ করিলাম পানি।
রিং ভিং ওং বিশ ভস্মী স্বাহা ॥
ওং ক্লিং শ্লিং কুরু বিশ হরে কালী।
কাঁক বুক শারেঙ্গ শার শারেঙ্গ জানে বিশ মরণ
ইরিং কিরিং বিরিঞ্চি কাঁই শারঙ্গ জানে বিশ নাই।
মিলা মল্লিকের ঝাঁই ঘা কাইতে বিশ নাই।

চ) কয়েকটি আদিবাসী ছড়া—

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মতো আদিবাসী সমাজেও বহু কবি ও ছড়াকারের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা নিজেদের ভাষাতে সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করে নিজেদের মধ্যেই তা পরিবেশন করেন। তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বাহা উৎসব উপলক্ষে একটি ছড়া—

পুষ্পপ্রীতির ছড়া—

বুরু চেতান র‍্যা,
জড়তে জবা বাহা বাহা বাহা আকান
ইঞ্ র‍্যান্ জুরি বাড়ের তাহেন্ খান,
জড়তে জবা বাহাঞ রাহা ক্যায়া।

অর্থাৎ, 'এ সময় পাহাড়ের উপরে একজোড়া জবাফুল ফুল ফুটেছে। এ সময় আমার প্রিয়তম যদি কাছে থাকত তাহলে আমি ঐ জবাফুল জোড়াটি তুলে এনে মনের আনন্দে মাথায় গুঁজে নিতাম।'

সাতটি বারকে নিয়ে সাঁওতালী ভাষায় একটি সুন্দর ছড়া বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা গেছে। ছড়াটি হ'ল—

সিংগে নাঙ্‌রে সিংগে রাকাপ্ লেনা,
অতে নাঙ্‌রে অতে সিরিজ লেনা,
বালে নাঙ্‌রে চাঁদয় মুলুঃ লেনা,
সাগুন নাঙ্‌রে জীউই কঃ জানাম লেনা,
সার্দি নাঙ্‌রে সার্দি লেনা—
জারুম নাঙ্‌রে দিশম্ জারুম্ লেনা,
ঞুতুম্ নাঙ্‌রে দিশম্ ঞুতুম্ লেনা।

অর্থ :—সিংগে=রবিবার অর্থাৎ জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। অতে=সোমবার অর্থাৎ পৃথিবী। বালে=মঙ্গলবার অর্থাৎ নূতন চাঁদ। সাগুন=বুধবার অর্থাৎ জীবের সৃষ্টি। সার্দি=বৃহস্পতিবার অর্থাৎ জীবের বিস্তার। জারুম=শুক্রবার অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তি। ঞুতুম=শনিবার অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার।

ছড়াটির বাংলা অর্থ—অকস্মাৎ একদিন একটা বিরাট জলন্ত অগ্নিপিণ্ড দেখা গেল। তারপর সৃষ্ট হ'ল পৃথিবীর। আকাশে দেখা গেল নূতন চাঁদ। পৃথিবীতে শুরু হ'ল জীবের সৃষ্টি। চলল তাদের বংশবিস্তার। পরে পৃথিবীকে অনেকবার

প্রলয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, তখন পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে এসেছে ঘোর অন্ধকার, ঘটেছে ধ্বংস।

ছ) গ্রামনাম সম্পর্কে কয়েকটি ছড়া—

১) **মল্লের** রা, **শিখরে** পা
সাক্ষাৎ যদি দেখবি, তবে
নদে-শান্তিপুর যা।

২) গান, বাজনা, মতিচুর—এই নিয়ে **বিষ্ণুপুর**।

৩) মদ্-মাস-কুঁকড়া—তিন নিয়ে **বাঁকুড়া**।

৪) হাতফুলা গোদা পা—দেখবি ত **সোনামুখী** যা।

৫) তাড়ি, মাতাল, ছ্যাচড়—বসতি কুথায়, না **শালতোড়**।

৬) দিতে হবেক খাজনা—চল বিয়াই **ছাতনা**।

৭) বারো নদী তেরো খাল—নাম তার **সিমলাপাল**।

৮) হাতি ঠেলা ধানচাল—তার নাম **পাঁচাল**।

৯) পুরুষ ভালো মেয়ে থ্যাদা—দেখবি যদি আয় **ওন্দা**।

১০) ঘরে-বাইরে রোগা-কুঠা (কুষ্ঠ) তবে জানবি **কাপিষ্ঠা**।

১১) বামুন, কায়েত, ম্যাচার (একরকম মিষ্টান্ন) জোর,
তিন নিয়ে গাঁ **বেলেতোড়**।

১২) খুন-ডাকাতি, ডুংরী-ডহর,—এসব নিয়ে **রানীবাঁধ** শহর।

১৩) গাঁ ঢুকতে পাথর চাং—গাঁয়ের নাম **কমলাডাং**।

১৪) গাঁ ঢুকলেই বাঁশ ঝোড়—গাঁটির নাম **সন্তোড়**।

১৫) দাড়ি, মোল্লা, নূর—তিন নিয়ে **তাজপুর**।

১৬) মদ, গাঁজা, তাড়ি—নিতে চাও যাও **ঝাঁটিপাহাড়ী**।

১৭) টিকি, পৈতা, পণ্ডিতা—তিন নিয়ে **ব্রাহ্মণডিহা**।

১৮) পোস্ত পোড়া, বিউলির ঝোল—তবে জানবি **বাঁকিশোল**।

১৯) গরমভাতে পাকা আম—খেতে চাইলে যা **রাজগ্রাম**।

২০) ঠাকুর, পুকুর, সারদা মা,
তিন নিয়ে **জয়রামবাটী** গাঁ।

২১) পাইটা ছোট, মুখটা বড়—তবে জানবি **নূতন গড়**।

২২) কাক, কাঁকর, কাঁটানটে—তিন নিয়ে **কাকাটিয়ে**।

২৩) **জগদোল্লা, গোড়াবাড়ি**—সকাল হলেই **পিঁয়াজমুড়ি**।

২৪) ফুলারু পোস্ত, গুগ্‌লি ঝোল—তবে জানবি **গোবরাশোল**।
২৫) ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর—নিবি যদি যা **শাসপুর**।
২৬) লাঠালাঠি, কাটাকাটি—গাঁয়ের নাম **হামিরহাটি**।
২৭) গাঁ ঢুকতে মদের ভাটি—তবে জানবি **কদমাঘাটি**।
২৮) তালগাছে সারি বাঁধা—গাঁয়ের নাম **তালান্দা**।
২৯) বামুন, কামার গায়ে গা—তবে জানবি **দধিমুখা**।
৩০) তাঁতের শাড়ি, চাদর, গামছা—আনতে যাব **কেঞ্জাকুড়া, রাজগাঁ**।
৩১) কালি, কলম কোথায় সরে ?
যাও না চলে **রামসাগরে**।
৩২) নাক লম্বা, গলা ঢ্যাঙ্গা—এ্যামন লোকের বাস **পলাশডাঙ্গা**।
৩৩) প্রাচীন লিপি, ধারায় জল—**শুশুনিয়ায়** আবাসস্থল।
৩৪) হাত-পা নিয়ে টানাটানি—গাঁয়ের নাম **মানুষমারি**।
৩৫) মুড়ির উপর ঝালবড়া (তেলেভাজা)
সব গাঁয়েরই এক ঠিকানা, **জেলা বাঁকুড়া**।

পরিবেশগত দিক দিয়ে এ অঞ্চলের ছড়া যে বর্গী আক্রমণের যুগ থেকে প্রচলিত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে 'ছেলা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী আল (এলো) ঘ্যাশে' প্রভৃতি ছড়া থেকে। বিভিন্ন ছড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ছড়াতে নামপদের প্রাচুর্য। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের ব্যবহার। তাছাড়া বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, 'ইতে' 'ইয়ে' 'ইলে' ইত্যাদি যোগে দ্বিত্ব শব্দ এবং স্বাধীন দ্বিত্ব শব্দের প্রয়োগপ্রবণতাও রয়েছে। উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে এসব ছড়ায় আঞ্চলিক ভাষা-শব্দের পূর্ণাঙ্গ রূপটিও ধরা পড়ে। ছড়াগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি মোটা চিত্র এভাবে দেওয়া যায়। যেমন—

নামপদ	প্রায়	—৫৫·০০%
ক্রিয়াপদ	,,	—৩০·০০%
বিশেষণ	,,	— ৪·০০%
সর্বনাম	,,	— ৭·০০%
শব্দদ্বিত্ব	,,	— ২·০০%
ধ্বন্যাত্মক শব্দ	,,	— ১·০৫%
ক্রিয়া-বিশেষণ	,,	— ·০৫%
অব্যয়	,,	— ·৯০%

একথা সত্য যে, শহরের তুলনায় গ্রামের জীবন অনেক বেশী সংহত। তবুও 'আঞ্চলিক' এবং 'ভৌগোলিক' পরিবর্তনভেদে আমাদের প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক জীবনের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে বহু অসমান্তর প্রতিবেশ। এই প্রতিবেশের প্রভাবে মানবমন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য সাধন করে চলেছে। সেইসঙ্গে আবহমানকাল থেকে ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ ও বাক্‌ধারা জীবনের ছন্দ ও গতিবেগ থেকে শুরু করে মানুষের স্থানান্তরে গমন এবং নূতন পরিবেশে খাপ-খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব-ভাবনা, ভাষা ও বিষয়বস্তুর অর্জন-বর্জনের ভিতর দিয়ে যে সংমিশ্রিত অথচ নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, অঞ্চলভেদে তার মধ্যে এসেছে স্বকীয়তা। এই স্বকীয়তাই হ'ল **আঞ্চলিক**। আর আঞ্চলিক ভাবধারাপুষ্ট লোকজীবনের সাহিত্য হ'ল **লোকসাহিত্য**॥

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

বহু ভাষাভাষী মানুষের বাসভূমি এই পৃথিবী। বিশেষ পরিসংখ্যানে জানা গেছে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা প্রায় দু'হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই (২,৭৯৬)। ডায়ালক্ট বা উপভাষার সংখ্যা সংযুক্ত হলে ভাষার সংখ্যা আরো বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে। ড. সুধীর করণ তাঁর 'লোকভাষা' প্রবন্ধে ঐ কয়েক হাজার ভাষাকেই 'ভাষা' বা 'ল্যাংগুয়েজ' অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের বাক্‌বাহন বলেছেন। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে প্রধান-অপ্রধান ভেদ থাকা উচিত নয়; তবু মাত্র ১৪টি ভাষা যেমন চীনা, ইংরাজী, হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু), রুশী, স্পেনীয়, জার্মান, জাপানী, ফরাসী, ইন্দোনেশীয়, পোর্তুগীজ, বাংলা, ইতালীয়, আরবী ও সিন্ধী ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে প্রধান ভাষারূপে পরিগণিত।

এই প্রধান ১৪টি ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, হিন্দুস্থানী, ইন্দোনেশীয়, বাংলা, আরবী প্রভৃতি ভাষা প্রধানতঃ দেশের সঙ্গে যুক্ত। এসব ভাষার ডায়ালেক্ট বা উপভাষার সংখ্যাও অনেক, তাই আমাদের মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর সব ভাষারই কম-বেশী হলেও উপভাষা আছে, এবং ঐতিহাসিক ধারার মধ্য দিয়ে ভাষার পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্ নোম চমস্কি (N. Chomsky) ১৯৫৫ সালে 'জেনারেটিভ গ্রামার' বা 'প্রজননশীল ব্যাকরণে'রে কিংবা 'ট্রানস্-ফরমেশনাল গ্রামার' বা 'সংবর্তনমূলক ব্যাকরণে'র বিশ্লেষণে'র ক্ষত্রে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার কাঠামোগত সাদৃশ্য দেখে বলেছেন যে, বিশ্বের সকল ভাষার ব্যাকরণই এক, সকল ভাষার কাঠামোতেই এক আশ্চর্য ঐক্য বর্তমান। চমস্কি সম্পর্কে ড. পবিত্র সরকার 'তাঁর 'সঞ্জননী ব্যাকরণে'র এক জায়গায় ঐ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীর অবদান যে বর্তমান বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে সে বিষয়ে বলেছেন—'ভাষার বিভিন্ন সংবর্তন ও প্রক্রিয়া

বিশ্লেষণে চমস্কি উদ্ভাবিত সংবর্তনের হাতিয়ারটি অসামান্য কাজে লেগেছে এবং তার ফলে ভাষার সংগঠনের ও সচলতার ভিতরকার রহস্যগুলি বেশ খানিকটা লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে যা আগের কোন ভাষাতত্ত্বে এমন করে সম্ভব হয়নি। ...চমস্কিতত্ত্ব ভাষাবিচারের নানাক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সব জায়গাতেই উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করা গেছে।' (সঞ্জননী ব্যাকরণ, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪, ১৩৮৫।)

ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যাকরণের উপর জোর দেওয়া হয় তাকে ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ বলা চলে। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের উৎপত্তি মূলতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাদ্বয়কে কেন্দ্র করে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এই রীতিকে অস্বীকার করে ব্যাকরণের বহু নতুন ও অভিনব মতবাদ ও চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে। আমেরিকার পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড (L. Bloomfield, Language, Holt Rinchart & Winston, New-York, 1933 / Allen & Unwin, 1935) ভাষার বিশ্লেষণে মানুষের ব্যবহারগত দিক এবং ধ্বনির ব্যবহার ও মৌলিক রীতিনীতি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করে ব্যাকরণের দার্শনিক ও মনোসমীক্ষণিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ সম্পর্কে বলেন—'...a device of some sort for producing the sentences of the language...The grammar of a language should generate all and only the sentences of the language.' ব্যাকরণ বক্তার আচরণকেই প্রতিফলিত করে; যা তার ভাষার সঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং আকস্মিক অভিজ্ঞতার ফল। তবে একথাও ঠিক যে বক্তা সেই সীমাবদ্ধ বাক্যের পটভূমিকায় আরো বহু নতুন নতুন বাক্য তৈরী করতে পারে কিংবা বুঝতেও পারে। কাজেই শব্দার্থতত্ত্বের অনস্বীকার্য ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ব্যাকরণতত্ত্ব বাক্যের ব্যবহারের ব্যাপারে প্রতিদিন, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ভাষায় লোক ব্যবহার করছে; শব্দার্থের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে তার সেরকম সংযোগ নেই। কারণ '...grammar is autonomous and independent in meaning and that probabilistic models give no particular insight into some of the basic problem of syntactic structure.' কাজেই ভাষার কাঠামোগত বিশ্লেষণে শব্দানুক্রমের (Sequence) যে গুরুত্ব রয়েছে শব্দার্থতত্ত্বের তা নেই। একটি বাক্যের মধ্যে যেমন অনুক্রম

থাকে এবং একটি বাক্য থেকে একাধিক বাক্য সৃষ্টি হতে পারে কিংবা সংযুক্ত হতে পারে তারই নাম 'Transformational Aspect' বা সংবর্তনতা। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কি তাঁর Generative Grammar বা প্রজননশীল ব্যাকরণে বলেছেন,—'When we apply only obligatory transformations in the generation of a given sentence, we call the resulting sentence a kernel sentence.' এইসব ভাষাবিজ্ঞানীদের পথ অনুসরণ করে আমরাও দেখেছি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার মধ্যেই কাঠামো নির্মাণে এক গভীরতম সাদৃশ্য রয়েছে। বৈসাদৃশ্য যে নেই তা নয়, তবে তা বাহ্যিকমাত্র। ভাষার ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলিত কারণ রয়েছে যেগুলি সমস্ত ভাষারই মূলসূত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই একটি ভাষার ব্যাকরণ শুধুমাত্র সেই ভাষা সম্পর্কিত মৌলিক মতবাদ মাত্র। মনের গভীরে যে ভাবের কাঠামোটি তৈরী হয় এবং বাক্যের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন থাকে চমস্কির ভাষায় তাই হ'ল deep structure বা 'মগ্ন কাঠামো'। ড. পবিত্র সরকার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে তাকেই বলেছেন 'মগ্ন-বচন'। ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন 'গভীরতল' (ভাষা সাহিত্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৮৩, পৃ. ১৩৬)। অন্যদিকে বাক্যে যা প্রকাশিত হ'ল তাকে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী বললেন 'surface structure' বা 'স্পষ্ট কাঠামো' বা 'বাহ্যিক কাঠামো। ড. পবিত্র সরকারের মতে 'স্পষ্টবচন' আর হুমায়ুন আজাদের মতে 'বহির্তল'।

প্রজননশীল ব্যাকরণ যা একটি ভাষার বাক্যসমূহের অনুরূপ বাক্যসৃষ্টিতে সমর্থ এবং এই সামর্থ্যের জন্যই সে ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে। এরূপ ভাষা অবাক্য বা অনিয়মিত বাক্যগঠন করতে পারে না, তাই এ ব্যাকরণ যে ব্যাকরণগত বাক্যের প্রতি প্রযোজ্য এ ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে কম-বেশী মতপার্থক্য রয়েছে। আসলে ভাষামাত্রই বাক্যের সমষ্টি, যে বাক্যগুলি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংগঠিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে সচেতন-ভাবেই কাজ করেন; কারণ বাক্য যেমন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে গঠিত হয় সেরকম একটি ভাষা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গত লোকদের মুখে মুখে অনেক পরি-বর্তিত হয়ে অনেক বাক্যে ব্যবহৃত হয় আর সব বাক্যগুলিই কিন্তু ব্যাকরণসম্মত হয় না। এখানেই একজন **ভাষাবিজ্ঞানীর** প্রয়োজন। বাক্যকে কেন্দ্র করে প্রজননশীল ব্যাকরণের জন্ম ও তার সঙ্গে মুখে মুখে ব্যবহৃত ভাষার মিল খুঁজে বের করাই হ'ল সেই ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ।

একটি ভাষার ব্যাকরণ প্রধানতঃ তিনধারার রীতি-নীতি নিয়ে গড়ে ওঠে। যেমন ১) বাক্যগঠন রীতি ২) শব্দার্থ পরিবর্তনের রীতি, ৩) ধ্বনি-বিজ্ঞানের রীতি।

বাক্যগঠনের রীতিগুলি বাক্যসমূহকে তাদের উদ্ভব ও বিকাশক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং এই রীতি অন্তর্নিহিত ভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে নিজ নিজ দায়িত্ব দান করে। আবার বাক্যের অর্থ মূলতঃ তার গভীর বা মগ্নকাঠামো থেকেই শব্দার্থের প্রসার-সংক্রান্ত রীতি-নীতির মাধ্যমে (semantic rules) গঠিত হয়। আর বাক্যের ধ্বনিগত উদ্দেশ্য তার বাহ্যিক কাঠামো থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলীর মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

ধ্বনিমূল ঃ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে মৌলিক শব্দগুলি (Morpheme) প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিমূলেরই পরিণতিসূচক শ্রেণীবিভাগ। আক্ষরিক অর্থে এইসব শব্দমূলের মধ্যে ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব অথবা সমষ্টি বর্তমান। ‘আমি বই পড়িয়াছি’, ‘আমি বই পড়ি’, ‘আমি বই পড়িয়াছিলাম’ প্রভৃতি বাক্যগুলিতে ‘পড়্’ ধাতুটি অতীতকালের নির্দেশক শব্দ / ধাতুমূল যার সঙ্গে —ইয়াছি, ই, ইয়াছিলাম প্রভৃতি যুক্ত অতীতকালিক শব্দমূলের পার্থক্য নির্ণয় করা মুশকিল। সেকারণে তাঁরা শব্দমূল বা ধ্বনিমূলকে পরস্পর নির্ভরশীল সুস্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বে বিচার করতে চান। এ সম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত ‘ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ গ্রন্থের ‘ভাষা/ব্যাকরণ’ অংশে এই সমস্যার কথা সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীর সূত্র উল্লেখ করেছেন—“We can avoid all such problems by regarding morphology and phonology as two distinct, interdependent levels of representation related in the grammar by morphonic rules.’

শব্দসম্ভার ঃ বাক্যের যখন প্রজনন হয় তখন তার শেষাংশে আভিধানিক নিয়ম বা lexical ru'es-এর সাহায্যে তার গভীর গঠনের নানাস্তরের মধ্যে ভিন্নতা নির্দেশক symbol বা প্রতীকগুলির জায়গায় কিছু কিছু সেই ভাষার শব্দ বসে। এরকম বাক্যের ধ্বনির ক্ষেত্রেও সংবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার ফল যে বাক্য, সেখানে থাকে কর্তা, কর্ম (মুখ্য ও গৌণ), ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়া, সময়বাচক ক্রিয়াবিশেষক, স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষক ইত্যাদি। কাজেই এরূপ বাক্যকে কোনমতেই গভীর কাঠামোযুক্ত বাক্য বলা চলে না, বলা যেতে পারে ‘বাহ্যিক কাঠামো’ যুক্ত বাক্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে গভীর বা মগ্ন কাঠামো

এবং বাহ্যিক বা স্পষ্ট কাঠামো উভয়েতেই বোধগম্য ধারণা বিদ্যমান, আর গভীর বা মগ্ন কাঠামো বাক্যে প্রদত্ত রূপ থেকে গভীরে বা দূরে অবস্থিত। বাহ্যিক কাঠামো তা নয়। একটি বাক্যের ব্যবহারের ভিন্নতা ক্ষেত্রে সে পার্থক্য বোঝা যাক—

সে কিছু বলেছে—মগ্ন কাঠামো

সে কিছু বলেছিল—মধ্যম অবস্থা

সে কিছু বলেনি—বাহ্যিক বা স্পষ্ট কাঠামো

সে কিছুই বলেনি—ধ্বনি সংবর্তনের ফলে সৃষ্ট রূপ।

কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য ঃ ব্যাকরণের নিয়মে কর্তৃবাচ্যে বাক্যকে সাজানো ইচ্ছাধীন নয়, এক্ষেত্রে অর্থের ও বাচনিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সাধারণ ও প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

অন্বয় ঃ আবার ব্যাকরণের ভিত্তি হিসাবে অন্বয় বিভাগের দুটি ভাগ আছে। ভিত্তিমূলক ও সংবর্তনতা এবং এখানেই গাঠনিক উপাদানের কাঠামো সম্পর্কিত প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেকারণে ভাব-প্রকাশক শব্দের গঠনে গভীর বা মগ্ন কাঠামোর হাত আছে। আমাদের চেতনায় ও বোধশক্তির মধ্যে আমরা একটি বাক্যরূপকে তৈরী করি—ব্যাকরণ সেই বাক্যাংশের শ্রেণীকরণ করে।

বাক্‌ধারা গঠন বৈশিষ্ট্য ঃ বাক্‌ধারার গঠনে একটি প্রতীকচিহ্ন কেবলমাত্র একটি উপাদানকেই বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত প্রত্যেকটি বাক্য যে অর্থ প্রদান করে তার অর্থাৎ সেই বাক্য এবং অর্থ সম্পর্কিত নিয়মাবলী যুক্তিপূর্ণভাবে প্রণয়ন করাই প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের কাজ। ধ্বনির মাধ্যমে যে বাক্য আমাদের কাছে রূপ পরিগ্রহ করে, সেই বাক্য যে অর্থ প্রকাশ ও প্রজনন করে তার উপর ভিত্তি করেই প্রতিটি ভাষার ব্যাকরণ গড়ে ওঠে। ব্যাকরণের বিচারও তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত। ব্যাকরণের ধ্যানধারণা বাক্যের গভীর গঠনের সঙ্গে যুক্ত। সংবর্তনতা এবং প্রজননশীলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। প্রজননতা আসলে সংবর্তনতারই ফসল। ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক সম্পর্ক এখানেই যে উভয়েতেই প্রজনন বা সঞ্জনন প্রক্রিয়া অব্যাহত।

পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী পল কিপারস্কির কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ঐতিহাসিক ধারার মধ্য দিয়ে ভাষার পরিবর্তন হয় আর এই পরিবর্তনের ধারাটি আজও অব্যাহতভাবে ঘটে চলেছে, তাঁর মতে—'By a long

series of historical processes the Proto-Indo-European parent language gradually split up into a number of separate languages such as Germanic, Celtic, Slavic and these in turn evolved into their numerous modern decendants. The same processes of charge are responsible for the diversity of dialects within English —and after some millennia they may well have resulted in a number of languages descended from English in just the same way that English, German etc, are descended from Proto-Germanic. The nature of these processes stand as the question basic to all further work in historical linguistics.'

কাজেই পৃথিবীর সব ভাষারই পরিবর্তন আছে আর এই পরিবর্তন-ধারা থেকেই গড়ে উঠেছে উপভাষা। তাই ভাষা ও উপভাষা একই বিষয় এবং বিষয়-ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয়। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি, বাক্‌রীতিকে অবলম্বন করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, এবং তারই নাম **'ভাষা'**। তাহলে ভাষা এবং উপভাষা পৃথক করে দেখার কোন অর্থ হয় না। সেকারণে ভাষাতাত্ত্বিকগণ চরিত্র বিচার করে ভাষা এবং উপভাষার লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন। আচার্য স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে' ভাষার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।' ব্যাকরণসম্মত এই সংজ্ঞাটির ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে কিছু পরিবর্তন ঘটে ; প্রকৃতপক্ষে ভাষার সূত্র নির্ধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

(১) ভাষা হচ্ছে সেই ধরণের বাক্‌বাহন যা সরকারীভাবে গৃহীত বা জাতীয় ভাষা বলে স্বীকৃত।

(২) " " " " ,, যা (শিষ্ট) সাহিত্য রচনার উপযোগী।

(৩) " " " " " যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উপ-ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং বিশেষ চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে সাহিত্যিক মর্যাদালাভে সক্ষম।

আর **উপভাষার** ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে : ১) এ ভাষার সরকারী স্বীকৃতি নেই, ২) এ ভাষার মাধ্যমে প্রাচীনকালে কোন স্বীকৃত সাহিত্য রচিত হত না,

৩) এ ভাষার তেমন কোন শিষ্ট আলোচনাও ছিল না। তাই বলা যেতে পারে উপভাষা হচ্ছে **এক বিশেষ কথ্য ভাষা** যার অধিষ্ঠান কোন এক বিশেষ ভাষাঅঞ্চলের কোন একটি ভৌগোলিক সীমানায়। সাহিত্যিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ভাষার সঙ্গে যার উচ্চারণগত, রূপগত, এবং বাক্‌রীতিগত লক্ষণীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'ভাষা' নামে পরিচিত একটি বিশিষ্ট উপভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তাকে অন্য একটি বিশেষ 'ভাষা' রূপে গণ্য করা যায় না।

তাছাড়া ভাষা-উপভাষার সূত্র ধরে আমরা 'ভাষা' বা 'ল্যাঙ্গুয়েজে'র (language) আর একটি বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করতে পারি, তা হল—যে উপভাষাটি তার স্বগোত্রের অন্য সব আঞ্চলিক মানুষের কাছে বোধগম্য এবং সহজগ্রাহ্য সেই উপভাষারই অন্য নাম ভাষা। পশ্চিম সীমান্তবর্তী গ্রামীণ মানুষের কাছে উত্তরবঙ্গ কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষা 'ভাষা' অথচ সমগ্র জনসমষ্টির কাছে তা রাঢ়ী উপভাষা যার থেকে পরবর্তীকালে উদ্ভব ঘটে বাংলা ভাষার।

বাংলা ভাষার কয়েকটি উপভাষার দিকেও পণ্ডিতেরা আমাদের আকৃষ্ট করেছেন। এই উপভাষাগুলি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক নামে অভিহিত। তবে উপযুক্ত চর্চা ঘটলে এই উপভাষাগুলিও 'ভাষা'তে পরিণত হতে পারে। উপভাষা-গুলিতে আঞ্চলিকতা থাকার ফলে অন্য অঞ্চলে সুবোধ্য হতে অসুবিধা ঘটায়। প্রচলিত লোকবাক্য অনুসারে জানা যায় 'প্রতি পাঁচক্রোশে ভাষার পরিবর্তন ঘটে।' ভাষার মূল কাঠামোয় না হোক শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বাক্যের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। জেলাভিত্তিক উপভাষা পর্যালোচনায় দেখতে পেয়েছি একই জেলাতে আঞ্চলিকতার জন্য ভাষারীতির তারতম্য ঘটেছে।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে শিষ্ট উপভাষা নগরকেন্দ্রিক এবং লোকভাষা গ্রামকেন্দ্রিক। এ ক্ষেত্রে বাক্‌ধারার পার্থক্য থাকবেই। নগরপুষ্ট মার্জিত, শিক্ষা-প্রাপ্ত মানুষদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের ফসল। গ্রামীণ মানুষদের কথ্য ভাষার ক্ষেত্রেও এ রীতি প্রযোজ্য ; তবে তার গতি মন্থর। সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত শ্রমজীবী বা তথাকথিত নীচুতলার মানুষদের প্রাত্যহিক ভাবপ্রকাশের বাহন যে কথ্যভাষা অর্থাৎ যাকে লোকভাষা বা উপভাষা বলা যায় তাই কিন্তু 'ভাষা'র মূল বুনিয়াদ। ড. সুধীর করণ তাঁর 'লোকভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন—'উপভাষারও স্তরভেদ আছে। রাঢ়ী উপভাষার সাধারণ চলতি রূপ আর আঞ্চলিক গ্রামীণ রূপ ঠিক এক নয়। অন্যান্য উপভাষিক অঞ্চলেও উপরতলার সঙ্গে নীচের তলার প্রাত্যহিক ভাষার

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ইংরাজীতে যাকে বলা হয় colloquial spoken তাকেই আমরা যথার্থ লোকভাষা নামে অভিহিত করতে পারি।' লোকভাষার বাচক সচেতনভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করে না, সেকারণে অঞ্চলভেদে শব্দের তারতম্য ঘটতেই থাকে। লোকসমাজের মুখে মুখে শব্দের প্রসারও ঘটতে থাকে। সর্বক্ষেত্রে ব্যাকরণের রীতিনীতি মেনে চলার জন্য এ ভাষা প্রস্তুত থাকে না। তাই কোন কোন লোকভাষার সাধারণ ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ, প্রভৃতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হলেই এ ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। এর সঙ্গে বাচকের নিজস্ব বাক্‌রীতি, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদির প্রশ্ন জড়িত। আবার উইলিয়ম কেরী রচিত Dialogues গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের Preface-এর মতানুসারে আমরাও বলতে পারি, গ্রামের মেয়ে এবং পুরুষদের ভাষাও এক নয়। মেয়েদের ভাষাকে তিনি quarrel language বা 'কন্দলের ভাষা' বলেছেন।—'Women speak a language considerably differing from that of the men, especially in their quarrels'.

পরিশেষে একথা বলতে পারি যে ভাষাবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আজ বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে। একটি বিষয়ের পর্যালোচনা থেকে অন্য একটি বিষয় সম্পর্কেও আমরা অবহিত হচ্ছি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে এই লেনদেনের সম্পর্ক আজ গোটা বিশ্বে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। আমরা জানি ভাষাবিজ্ঞান ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। ফোকলোর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যেসব চিন্তা-ভাবনা প্রেরণা দান করে চলেছে সে সবের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের যোগ বেশ ঘনিষ্ঠ। ভাষার ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও সমাজসংস্কৃতি মূলক মূল্যায়ন ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুলাংশে প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদরা ১৮১২ সাল থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক সত্যাবিষ্কারে ফোকলোরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, এবং লোকসংস্কৃতি চর্চা করতে গিয়ে সেই আঞ্চলিক উপভাষারই সাহায্য নিয়েছেন। আমরাও সেই একই ভাবে লোকভাষা এবং লোকসংস্কৃতিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং এইসূত্রে ফোকলোর বিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কাজেই যাঁরা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির গবেষক তাঁদের পক্ষে লোক-ভাষা বা আঞ্চলিক উপভাষা জানা বা বোঝা এবং চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। লোকজীবনের গভীরে প্রবেশ করার সঠিক পন্থা হ'ল **আঞ্চলিক উপভাষা** ॥

১. The Origin and Development of the Bengali Language—
Suniti Kr. Chatterjee.

২. ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—ডঃ মযহারুল ইসলাম।

৩. লোকায়ত সংস্কৃতি পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা
—সম্পাদনা : সঞ্জীব সরকার, অরুণ রায়।

৪. সঞ্জননী-ব্যাকরণ—ডঃ পবিত্র সরকার।

৫. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ও অন্যান্য পত্র পত্রিকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রন্থ সাহায্য

১। Linguistic Survey of India—G. A. Grierson
২। The English Dialects—G. L. Brook
৩। Indo Aryan Races—Ramaprasad Chanda
৪। West Bengal District Gazettees : Bankura—Amiya Kumar Banerjee
৫। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ; ষষ্ঠ সংস্করণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬। বাংলা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; পঞ্চম সংস্করণ—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
৮। বাংলা লোকসাহিত্য (ছড়া)—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
৯। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা—ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা
১০। লৌকিক শব্দকোষ—ড. কামিনীকুমার রায়
১১। ভাষার ইতিবৃত্ত—ড. সুকুমার সেন
১২। বাংলা স্থান-নাম—ড. সুকুমার সেন
১৩। বাংলা বানান—মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
১৪। ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—ড. মযহারুল ইসলাম
১৫। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস—ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
১৬। লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও তত্ত্বসন্ধান—ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়
১৭। মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ—ড. রেখা সিংহ
১৮। ভাষা দেশ কাল—ড. পবিত্র সরকার
১৯। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২ : বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
২০। লোকভাষা—সুধীর করণ
২১। পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মাণিকলাল সিংহ
২২। জেলার নাম বাঁকুড়া—লীলাময় মুখোপাধ্যায়
২৩। মল্লভূমের মন্ত্রযান—নমিতা মণ্ডল
২৪। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি সাহিত্যপত্র—বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি
এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।

ব্যক্তি সাহায্য

১। ড. ক্ষুদিরাম দাস—কলিকাতা
২। তপন কর—কলিকাতা

৩। দুলাল ভট্টশালী—কলিকাতা
৪। প্রকাশ চক্রবর্তী—কলিকাতা
৫। লীলামঞ্জরী দাস—কলিকাতা
৬। অশোক উপাধ্যায়—কলিকাতা
৭। অনুপকুমার মাহিন্দার—কলিকাতা
৮। অরুণকুমার হেঁস—কলিকাতা
৯। শৈলেন দাস—সম্পাদক, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি
১০। ধনপতি সামন্ত—সম্পাদক, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি
১১। সুখময় চট্টোপাধ্যায়—নূতনচটী, বাঁকুড়া
১২। মোহন সিংহ—বেলেতোড়, বাঁকুড়া
১৩। মিহির চৌধুরী কামিল্যা—বর্ধমান
১৪। অমিয়গোপাল কর্মকার—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া
১৫। অনন্তকুমার প্রধান—বাঁকুড়া
১৬। আদিত্য মল্লিক—বাঁকুড়া
১৭। করুণাময় সেন—তিলুড়ি, বাঁকুড়া
১৮। রবিলোচন বাউরি—করকটা, বাঁকুড়া
১৯। ভুজঙ্গভূষণ মাহাতো—রাইপুর, বাঁকুড়া
২০। রতি রায়—কেশাকোল, বাঁকুড়া
২১। যূথিকা দাস—বাঁকুড়া
২২। অন্নপূর্ণা প্রধান—বাঁকুড়া
২৩। ঝর্ণা মণ্ডল—সোনামুখী
২৪। শ্রাবণী দাস—বাঁকুড়া
২৫। দেবযানী মণ্ডল—সোনামুখী
২৬। বাণীশ্রী মণ্ডল—সোনামুখী
২৭। মিলন গুঁই—সোনামুখী
২৮। অশোক ভট্টাচার্য—সোনামুখী (ল্যাম্প)
২৯। রথীন চৌধুরী—সোনামুখী
৩০। শ্রীকান্ত কর্মকার—সোনামুখী
৩১। ড. দুলাল চৌধুরী—যাদবপুর
এবং বিভিন্ন গ্রামবাসীরা।

নির্দেশিকা

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২২	৬	বেসী	বেশী
২২	৭	ইনুমান	হনুমান
৩৭	৯	বর্ণবিচার	বর্ণবিকার
৪০	৩	ভাষার	ভাষা
৪৪	৩১	হিনকিন-হিনাকিন	হিনিকিন-হিনাকিন
৫১	২	তলাশয়	জলাশয়
৬৫	৭	১ বুড়ি সিকি	১ বুড়ি সিকি গণ্ডা
৭২	৩	উচ্চারণের রীতি পনুসারে	উচ্চারণের রীতি অনুসারে
৭২	২০	থুবড়া	থুবড়া (থ্+উ+ব্+ড়্+আ)
৭৪	৫	ভূয়ের	ভূঁয়ের
৭৯	৭	রোগা, বজি	রোগা, বাজি
৭৯	১৩	ফাদের	কাফের
৮০	২০	বিষ্	বিষ্
৮০	২৬	ডিংলার ঝলিট	ডিংলার ঝালট
৮০	২৯	এগিয়ে পড়া	এলিয়ে পড়া
৮১	১৮	প<ফ	প>ভ
৮৪	৬	'করাল'	'করালী'
৮৪	১৮	কর্তায় প্রথম বিভক্তি	…প্রথমা বিভক্তি
৮৫	৩	দংশিত	দংশিল
৮৫	১১	বুড় কাঁড়া	বুড়া কাঁড়া
৮৫	২৪	বাগলিকে	বাগালিকে
৮৬	৪	পথের কুকুর মাড়েই খুশী	…**মাড়েই** খুশী
৮৭	১৫	উয়রে ভাদ	হুয়ারে ভাই
৯৭	২৩	বন থেকে	…থাকি
৯৭	২৪	উখান থেকে	…থাকি

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১০২	৭	খাটাইয়া> থাটিয়া	খাটাইয়া> খাটিয়া
১০২	২২	অও গমড়া	অস্তু গমড়া
১০৩	১৯	বেহাল্য মরদ	বেহাল্যা মরদ
১১১	১৯	অংলগ্ন হওয়া	অঙ্গলগ্ন হওয়া
১১৩	৯	দেখত তুর ই গরব	দেখব তুর ই গরব
১১৪	৩	ঝকমারি	শব্দটি বর্জিত হবে
১১৪	১৪	অ অঞ্চলে	এ অঞ্চলে
১১৫	২৫	মাটি খুঁড়ি গাড় করি	…গাঢ় করি
১১৬	১৮	কেমন কর আমার যতন	…যতন আমার
১১৭	১৯	যাবার বেলায় রগল	…রগড়
১২১	১৭	ইন্দ্ পূজার জন্য মাঠ	…কাঠ
১২৬	২৭	আঁদাৎ—বি.	আঁদাত—বিণ.
১২৬	২৯	আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে—ক্রি.বিণ. আনাচে-কানাচে।	বি.আনাচে-কানাচে, অস্থানে-কুস্থানে।
১২৭	১৬	জ`াদা আমট	জঁদা আমট
১৩১	৮	কুথা চল্যেই	কুথা বল্যেই
১৩২	২০	দরদ ত লাগবেই	দরজ ত লাগবেই
১৩৫	১২	খখর—বি. গাছের গুঁড়িতে পাখীর বাসা	খখর—বি. গর্ত, কোটর। গাছের খখরে পাখীর বাসা
১৩৫	১৫	বদ্বেজাজী	বদ্মেজাজী
১৩৬	৩	খাপি—বিণ. মোটা, শুরু	…মোটা, মজবুত
১৩৬	২২	খরখস্যা—বিণ. কর্কশ	খরখর্যা—বিণ. কর্কশ, চটপটে
১৩৯	৮	গুমা/গমক—বি. গন্ধ	…বিণ. গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়া
১৪১	১৬	চটা…বিবর্ণ	চটা…বিবর্ণ। ৩) চটা—বিণ. রাগী।
১৪১	১৯	২) চিট—ঘনিষ্ঠ	২) চিটা—ঘনিষ্ঠ
২৪৬	২	ঝিন্ ঝিন্, ঝিন্ ধরা ইত্যাদি	ঝিন্ ঝিন্, ঝিম্ ধরা— ক্রি. অবশ হওয়া।
১৪৭	২২	টিপ্—বিণ. নিশানা, লক্ষ্য	টিপ্/টিক্—বি. নিশানা, লক্ষ্য, কপালে পরার গোল চিহ্ন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১৪৯	২৩	ডাব—বি. গর্ত	ডাব—বি. গর্ত, ফলবিশেষ green cocoanut
১৬০	৯	ফুঁখ দেওয়া	ফুঁক দেওয়া
১৭৭	১৮	ফেরকা…সৌখিনভাবে	ফেরকা…সৌখিন
১৭৮	২	বাইরে বুলা—ক্রি.	বাইরে বুলা—যৌ. ক্রি. বাইরে ঘোরা, পাড়া বেড়ানো
১৭৮	৩	বাইরে বসা—ক্রি.	বাইরে বসা—যৌ.ক্রি.
১৭৮	১৭	বাগান…করা।	বাগান…করা। ২) বাগান—বি. উদ্যান।
১৭৮	২৩	বিনা পারিশ্রমিকে	বিনা পারিশ্রমিকে
১৭৯	৪	বাঁজা—বি.	বাঁজা—বিণ.
১৭৯	৭	বাটা—বি. পান রাখার পাত্র	…২) সুদ
১৭৯	২০	বাত্তান	বাতান
১৭৯	২৬	বাজা—বি. শস্যক্ষেত্র	বাজা—বি. জলাজমি
১৮০	১৪	বেলগ—বিণ.	বেলগ—অব্য.
১৮৩	২৪	করা যায়	করানো যায়
১৮৪	২১	মিজিক মিজিক—ক্রি. বিণ. মিটমাট	…টিম্‌টিমে, অল্প-অল্প
১৮৫	৪	২) মোদ্দা—অব্যয়. মোট	২) মদ্দা—অব্য. মোট বা total, প্রকৃত
১৮৬	১	খড় মাড়া দেওয়া	খড় জুড়ে দেওয়া, যুক্ত করা
১৮৭	১০	রটা…ছড়িয়ে পড়া	রটা…ছড়িয়ে পড়া, প্রচারিত হওয়া
১৮৭	১১	রীত্—বি.রীতি	…রীতি, নিয়ম
১৮৯	৩	ল্যার-প্যাচা	ল্যাচ-প্যাচা
১৮৯	১৩	লট বহর—বিণ.	লট বহর—বি.
১৮৯	১০	লেঠেল—বি. লাটিয়াল	লেঠেল—বি. লাঠিয়াল
১৮৯	১৮	লাজা	লাদা
১৯১	১	উদ্বেগহীনভাবে	উদ্বেগহীন
১৯১	৭	৩) লড়া—বি. হাতে আখা	…হাতের আখা

পৃষ্ঠা	লাইন	হবে	আছে
২১০	৩	মুয়ে হাসে	মুয়ে হাগে
২১১	২	পাকলে মিষ্টি তার বিচি গোটা	…বিচি গোটা গোটা
২১৫	৪	বঞ্চত হয়েছেন	বঞ্চিত হয়েছেন
২২৪	২২	মহশক্তি ধরে	মহাশক্তি ধরে